স্বাস্থ্য-বিধি ও গার্হস্থ্য চিকিৎসা

"স্বাস্থ্য-বিধি না জানিলে কেহই জীবনের
দায়িত্বভার বহন করিবার
যোগ্য হয় না।"

স্বাস্থ্য-বিধি ও গার্হস্থ্য চিকিৎসা

সাধারণ ব্যাধিসমূহের কারণ, নিবারণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রাঞ্জল-ভাষায় লিখিত গ্রন্থ।

এ, সি, সেল্‌মন্‌, এম্‌, ডি, প্রণীত।

ওরিয়েণ্টাল ওয়াচ্‌ম্যান্‌ পাব্লিশিং হাউস্‌,
সল্‌স্‌বেরি পার্ক, পুনা।
(ব্রাঞ্চ, মোরাবাদী রোড, রাঁচি।)

মানব চিত্রের পরিচয়

১। শ্বাসনালী
২। ফুস্‌ফুস্‌
৩। উদর ও বক্ষের মধ্যবর্ত্তী পেশী (The Diaphragm)
৪। যকৃৎ
৫। বৃহদন্ত্রের পশ্চাতে পিত্তকোষ অবস্থিত
৬। ক্ষুদ্রান্ত্র
৭। বৃহদন্ত্র বা কোলন
৮। অন্ধান্ত্র (The Caecum)
৯। স্থূলান্ত্রের শেষ বক্রাংশ (The Sigmoid Colon)
১০। সরলান্ত্র
১১। পাকস্থলী
১২। ক্লোম যন্ত্র (The Pancreas)
১৩। প্লীহা
১৪। পঞ্জর
১৫। পঞ্জর মধ্যস্থিত স্থান
১৬। হৃৎপিণ্ড
১৭। ফুস্‌ফুস্‌ সংশ্লিষ্ট ধমনী। দূষিত রক্ত বহন করে বলিয়া নীল রঙে রঞ্জিত করা হইয়াছে
১৮। বৃহদ্ধমনী (Aorta)
১৯। উর্দ্ধতর "ভেনাকাভা" (Superior Vena Cava)
২০। নিম্নতর "ভেনাকাভা" (Inferior Vena Cava)
২১। উদরস্থ বৃহতী ধমনী
২২। বৃক্কদ্বয়। মৌত্রাশয়িক ধমনী লাল রঙে, ও মৌত্রাশয়িক শিরা নীল রঙে রঞ্জিত করিয়া, মূত্রাশয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখান হইয়াছে।
২৩। তলপেটের অধোগহ্বরস্থিত অস্থি।
২৪। অন্ত্রবেষ্টনী (Peritoneum)
২৫। মূত্রবহানালী
২৬। খণ্ডিত সরলান্ত্র
২৭। তলপেটের অধোগহ্বরস্থিত আবরক (Pelvic Peritoneum)
২৮। জরায়ুধর (The Uterus)
২৯। ডিম্বকোষ (The Ovaries)
৩০। রজোডিম্বনালী (The Fallopian Tube or Oviducts)
৩১। জরায়ুগ্রীবা (The Cervix Uteri)

18
15
14
14
16
15
3
11
6
23
21
23
27
26
27
29
29
30
30
28
31
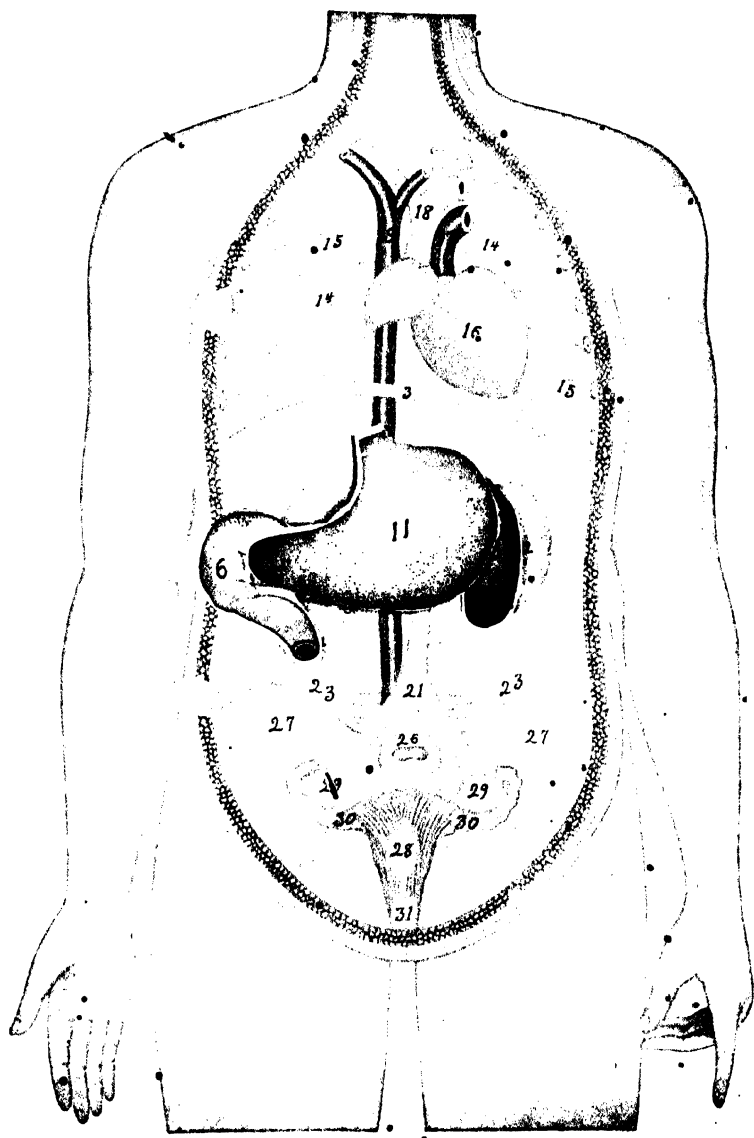
মানব জাতির মধ্যে সচরাচর যে সকল ব্যাধি দৃষ্ট হয় তাহার অধিকাংশেরই নিবারণ সম্ভবপর ; সুতরাং ঐ প্রকার ব্যাধিসমূহের কারণ, নিবারণ ও চিকিৎসা বিষয়ে সাধারণ পাঠকদিগের বোধোপযোগী একখানি গ্রন্থ সরল ভাষায় প্রণয়ণ করা একান্ত আবশ্যক।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন ও কার্য্য, এবং প্রত্যেক যন্ত্রের কার্য্যকারী ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কি করণীয় তৎসম্বন্ধে পুস্তকখানির প্রথম ১৩ অধ্যায়ে অত্যাবশ্যক বিষয়সমূহ লিখিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশভাগেই সাধারণ ব্যাধিসমূহের বিষয় বর্ণিত আছে। গ্রন্থখানিতে রোগনিবারণ প্রণালী বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে এরূপ চিকিৎসার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, যাহা প্রত্যেক গৃহেই ব্যবহৃত হইতে পারে।

গ্রন্থখানি চিকিৎসকের স্থান পূরণ করিবার অভিপ্রায় লিখিত হয় নাই, রোগীকে রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে অবগত করাইয়া আবশ্যকানুযায়ী সুনিপুণ চিকিৎসকের আশ্রয় লইতে এবং স্বাস্থ্যনিবাস ও হাসপাতালসমূহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাইবার জন্য প্রকাশিত হইল।

এই পুস্তকখানি দ্বারা প্রত্যেক গৃহস্থের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে, ইহার উপদেশানুসারে জীবনযাপন করিলে, রোগ ও দুঃখ হ্রাস পাইবে, এবং যথাসময়ে যথোপযুক্ত প্রতীকার করিলে প্রাণরক্ষা হইতেও পারে, ইহাই গ্রন্থকারের আশা।

গ্রন্থখানিতে যে সকল ঔষধের বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা যে কোন ঔষধের দোকানে পাওয়া যাইতে পারে। বিষাক্ত ঔষধ ক্রয় করিবার পূর্ব্বে আইনানুযায়ী চিকিৎসকের নিকট হইতে ব্যবস্থাপত্র লওয়া আবশ্যক।

পুস্তকের পশ্চাদ্ভাগে কতকগুলি ঔষধের তালিকা ও মাত্রা প্রদত্ত হইল।

কোন কোন স্থলে সংখ্যা দ্বারা ব্যবস্থাপত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ সকল ব্যবস্থাপত্রের তালিকা গ্রন্থখানির পশ্চাদ্ভাগে প্রদত্ত হইল।

সূচীপত্র

অধ্যায় পৃষ্ঠা

চিত্র পরিচয়

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

ছয়টী উৎকৃষ্ট ভিষক্

এ হেন শকতি কার করে অস্বীকার,
ছয়টী ভিষক্ যথা, নিখিল মাঝার—
সুর্য্যরশ্মি, পুতবারি, বিরাম, পবন,
ব্যায়াম, সুখাদ্য করে সুস্বাস্থ্য অর্পণ ;
কামনা-সুলভ সদা হেন ছ'টী বিত্ত,
ইচ্ছামাত্র দানে শান্তি, ফুল্ল হয় চিত্ত !
নিরাময় করে ব্যাধি, দানে কত শান্তি
দূরে যায় চিন্তাভার নাহি থাকে ভ্রান্তি,
প্রতিদানে নাহি চায় টাকা কিম্বা কড়ি ;
কিবা অপূর্ব্ব সুযোগ আহা মরি মরি !

১ম অধ্যায়

স্বাস্থ্যের মূল্য

জীবন মানবের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ, তারপরই স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য ব্যতীত মানব-জীবন শুধু যে অসার তাহা নহে, ইহার অভাবে জীবনের সমুদয় শান্তি, সমুদয় আনন্দ নষ্ট হইয়া যায়, কেননা দেহ সুস্থ না থাকিলে, কেহই স্বেচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে পারেন না; যে সকল কার্য্যে তাঁহার আনন্দ হয়, যে সকল আহারে তাঁহার তৃপ্তি হয়, সে সমুদয় কিছুই তিনি উপভোগ করিতে পারেন না।

রুগ্ন ব্যক্তি কেবল যে নিজেই যন্ত্রণা ও অসুবিধা ভোগ করেন, তাহা নহে; তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতে, অপর লোককেও তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য বন্ধ রাখিয়া সময় নষ্ট করিতে হয়। এইরূপে তিনি অপরের গলগ্রহ হয়েন; কেননা অপরকে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে ও অশন বসন যোগাইতে হয়।

এতদ্ব্যতীত পীড়িত ব্যক্তি অনেক সময়ে, তাঁহার নিকট-প্রতিবেশীদের পক্ষে ভীতির কারণ হইয়া থাকেন; কারণ অধিকাংশ ব্যাধিই এক দেহ হইতে অপর দেহে সহজে সংক্রামিত হয়। সচরাচর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরিবারের যে কোন একজন কোন রোগে আক্রান্ত হইলে, অপর সকলেও এক এক করিয়া সেই রোগে শয্যাশায়ী হইতে থাকেন। এইরূপে প্রায়ই সেই ব্যাধি প্রবল আকার ধারণ করিয়া এক পরিবার হইতে অন্য পরিবারে ছড়াইয়া পড়ে; এতদ্ভিন্ন পীড়িত ব্যক্তিরা পরিশ্রম করিতে না পারায় অত্যন্ত আর্থিক ক্ষতিও হইয়া থাকে। এমন কি জনসাধারণের জীবন নাশ,—যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিজনক তাহাও সংঘটিত হয়।

অধিকন্তু, স্বাস্থ্য একবার ভাঙ্গিয়া পড়িলে, শীঘ্র উহা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নহে। কেবল কয়েক মাত্রা ঔষধ খাইলেই আরাম হওয়া যাইবে ভাবিয়া রোগকে সামান্য মনে করা বড়ই অন্যায়। কেননা অধিকাংশ রোগ হইতেই মুক্তি পাইতে বহু সময়, এবং চেষ্টার প্রয়োজন হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, প্রত্যেক সমাজের ও সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই, স্বাস্থ্যকে অতি মূল্যবান বিষয় মনে করিয়া, তৎসম্বন্ধে খুবই সতর্ক হওয়া উচিত।

নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা করা, এবং দেহকে নীরোগ রাখা, প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রথম কর্ত্তব্য। শুধু নিজের জন্য নহে, তাহার পরিবার, প্রতিবেশী, স্বদেশ,

এবং সর্ব্বোপরি তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার প্রীতির নিমিত্ত, প্রত্যেকেই এই কর্ত্তব্য সাধন করিতে বাধ্য। কেহ কেহ এইরূপ ভুল ধারণা পোষণ করেন যে, দেবতা বা দুষ্ট আত্মার কোপে অথবা জলবায়ুর জন্য রোগ হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা অনিবার্য্য; কিন্তু তাহা নহে, জীবন বা মৃত্যু কোনটাই অদৃষ্ট-চালিত নহে।

স্বাস্থ্য-নীতি লঙ্ঘনই রোগের কারণ। স্বাস্থ্য-নীতি পালন করিলে, ও শরীরের যত্ন লইলে, সাধারণতঃ যে সকল ব্যাধি দ্বারা অধিকাংশ লোক আক্রান্ত হন, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ দশ ভাগের আট ভাগ ব্যাধির আক্রমণ রোধ করা সম্ভব। যে আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে সকল মানব ব্যাকুল, সেই আশীর্ব্বাদ অর্থাৎ দীর্ঘজীবন লাভ,—স্বাস্থ্য-নীতি পালন দ্বারাই সম্ভব হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য-নীতি অবহেলার ফলেই মানবজাতির পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ ও শোকের বিষয়, সেই ব্যাধি ও মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়।

প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অবগত আছেন যে স্বাস্থ্য-নীতি পালন এবং স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানের উপায় সমূহ অবলম্বন করিয়া, আমাদের পরমায়ু বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে, ইউরোপ-বাসিগণ স্বাস্থ্য-নীতি ও শরীর সুস্থ রাখিবার উপায় সমূহের প্রতি আদৌ দৃকপাত করিতেন না; ফলে তাঁহাদের পরমায়ু গড়ে মাত্র বিশ বৎসর ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ইউরোপের অধিকাংশ দেশে, আয়ুর গড় চল্লিশ বৎসরেরও কিছু অধিক হইয়াছে। ঐ সমস্ত দেশে ব্যক্তিগতভাবে ও রাজসরকারের সমবেত চেষ্টায় স্বাস্থ্য-নীতি ও শরীর সুস্থ রাখিবার বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহারই ফলে ঐ সকল স্থানের লোকদের আয়ুর গড় এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এশিয়ার অধিকাংশ দেশের অধিবাসিগণ এখনও স্বাস্থ্য-নীতি ও দেহ সুস্থ রাখিবার উপায় সমূহের প্রতি আদৌ মনোযোগী নহেন, তাই চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে মানুষের পরমায়ু গড়ে পঁচিশ বৎসরের অধিক নহে। বর্ত্তমানে ইউরোপের দেশ সমূহের সর্ব্বোচ্চ আয়ুর গড় এবং এশিয়ার কোন কোন দেশের সর্ব্বনিম্ন আয়ুর গড়ের তুলনা করিলে কি প্রতীয়মান হয় না যে, যিনি দীর্ঘায়ু লাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহারই স্বাস্থ্য নীতি ও শরীর সুস্থ রাখিবার উপায় সমূহের প্রতি, এবং যাহাতে যাহাতে রোগ নিবারিত হয়, সেই সকল বিষয়ের প্রত্যেকটীর প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন?

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যতদিন লোকে সুস্থ শরীরে থাকেন, ততদিন তাহারা তাহাদের দেহের প্রতি মোটেই যত্ন নেন না; কিন্তু তাহারা যখন ক্ষীণ-বল ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়েন, এবং মৃত্যুর কাল ছায়া নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, তখন তাহারা শরীর-পালনবিধি শিখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু

দুঃখের বিষয় তখন আর প্রায়ই সময় থাকে না। ইহা ঠিক যেন চোরে সমস্ত চুরি করিয়া লইলে পর ঘরে তালা বন্ধ করার মত। তরুণ বয়সেই শরীর পালনে যত্নবান হইতে আরম্ভ করিবার প্রকৃষ্ট সময়। বস্তুতঃ ভবিষ্যৎ শিশু যাহাতে সুস্থ ও সবল হইতে পারে, তজ্জন্য উহার জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক থাকিতে আরম্ভ করা প্রয়োজন। মাতাপিতা উভয়েই নিজ নিজ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবশ্যই যত্নবান হইবেন, কারণ যাহারা দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত তাহারা কখনই সুস্থ ও সবল সন্তানের মাতাপিতা হইতে পারেন না।

এই পুস্তকের অধিকাংশ পাঠকই বোধ হয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, হয়ত তাহাদের অনেকের শরীর দুর্ব্বল, এবং কেহ কেহ বা কোন প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত; এরূপ অবস্থায় পাঠকের স্বাস্থ্য-নীতি সমূহ আয়ত্ত করিয়া, সুস্থাবস্থায় শরীর পালন এবং রুগ্নাবস্থায় কি প্রকারে পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করা যায়, তাহা শিক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। পাঠকগণ যাহাতে রোগ প্রতিরোধ করিতে, এবং নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন, এই পুস্তকখানিতে তদনুরূপ তথ্যসমূহ উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাই গ্রন্থখানির লক্ষ্য। চিকিৎসক না হইলেও, পরিবারের যে কোন ব্যক্তি, এই পুস্তকের সাহায্যে সাধারণ রোগ সমূহের চিকিৎসা করিতে পারিবেন। অবশ্য কঠিন ব্যাধির আক্রমণে, সম্ভব হইলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ পুস্তক দ্বারা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভব নহে।

ব্যাধির কারণসমূহ

অনেকে ভ্রম বশতঃ ব্যাধিকে অপরিহার্য্য দুর্ব্বিপাক বলিয়া মনে করেন। চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকেরা বর্ত্তমানে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে বিশেষ বিশেষ কারণে রোগ হইয়া থাকে; কোন কোন রোগ উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে জন্মে, যেমন বেরি বেরি (Beri-beri)। দেহে কোন প্রকার বিষ প্রবেশ করিলে কোন কোন রোগের সৃষ্টি হয়, যেমন—যাহারা দিয়াশলাইয়ের কারখানায় কার্য্য করেন, তাহাদের সাধারণতঃ ফস্‌ফরাস্ বিষক্রিয়ার দ্বারা (Phosphorus poisoning) ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে। নানাপ্রকার কু-অভ্যাসের ফলেও নানা ব্যাধি জন্মিয়া থাকে, যেমন—আহারের সম্বন্ধে অনিয়ম ও অন্যান্য কু-অভ্যাসের ফলে অগ্নিমান্দ্য হয়। পৃথিবীতে যত ব্যাধি হয়, তন্মধ্যে দশ ভাগের এক ভাগ উল্লিখিত কারণ সমূহ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে; বাকী নয় ভাগ রোগের কারণ—রোগোৎপাদক জীবাণু।

রোগোৎপাদক জীবাণু

রোগোৎপাদক জীবাণু মানবজাতির সর্ব্বপ্রধান শত্রু; প্রতিদিন উহারা লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির প্রাণনাশ করিতেছে। জীবাণু হইতেই সর্দ্দি, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, উদরাময়, আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা, ধনুষ্টঙ্কার (বা দাঁত কপাটী), হুপিং কাশি, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, প্লেগ, এবং আরও অনেক প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, রোগোৎপাদক জীবাণুই পৃথিবীতে অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ।

রোগের জীবাণু দুই প্রকার—এক প্রকার উদ্ভিদ্, অপর প্রকার প্রাণী। ঐ সমস্ত জীবাণু এত ক্ষুদ্র যে চক্ষে দেখা সম্ভব নহে। অধিকাংশ জীবাণুই এইরূপ ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ দ্বারা সহস্রগুণ বাড়াইয়া দেখিলেও একটী সরিষা অপেক্ষা বৃহৎ দেখায় না।

রোগের জীবাণু অতি দ্রুত বাড়িয়া থাকে। অনুকূল অবস্থায় কলেরা বা টাইফয়েড রোগোৎপাদক একটী মাত্র জীবাণু, দশ ঘণ্টার মধ্যে আরও লক্ষ লক্ষ জীবাণু উৎপন্ন করিতে পারে। উহারা এত ক্ষুদ্র, এবং এরূপ দ্রুত বৃদ্ধি পায় বলিয়া বহু দূরে ছড়াইয়া পড়ে। নদী, নালা, পুকুর, ও পাতকুয়ার জলে, রাস্তার ধূলি এবং গৃহের মেঝের ও দেওয়ালের ধূলি কণায়, এমন কি আমাদের খাদ্যে ও পানীয়ে জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল স্থানের বসতি খুব ঘন, সেই সমুদয় স্থানের সর্ব্বত্রই রোগোৎপাদক জীবাণু ছড়াইয়া রহিয়াছে। উহারা যখন এরূপ বিপজ্জনক, তখন কিরূপে উহাদিগকে রোধ করিতে হয়, এবং দেহে প্রবেশ করিলে কিরূপে নষ্ট করিতে হয়, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই সকল বিষয় পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচিত হইবে।

২য় অধ্যায়

মানবদেহের প্রধান তিনটী বিভাগ এবং স্বাস্থ্যের ছয়টী সাধারণ বিধি

মানবদেহ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত; যথা—মস্তক, ধড় বা মধ্যকায়, এবং হস্তপদ। ধড়ের মধ্যে প্রকাণ্ড এক গহ্বর রহিয়াছে, এবং ঐ গহ্বরে মানবদেহের অধিকাংশ প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলি আছে। উক্ত গহ্বর আবার এক ব্যবধায়ক আবরণ দ্বারা (Diaphragm) দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে (গ্রন্থের সম্মুখস্থ চিত্রিত মানবমূর্ত্তি দেখুন)। উহার উপরের অংশকে বক্ষঃস্থল বলে। বক্ষঃস্থলের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস্‌, এবং উহার পশ্চাদ্ভাগে শ্বাসনালী (Trachea) ও অন্ননালী (Gullet) রহিয়াছে। ব্যবধায়ক আবরণের নীচের অংশের নাম উদর। উহার মধ্যে যকৃৎ, পাকস্থলী, প্লীহা অগ্ন্যাশয় (Pancreas), ক্ষুদ্রান্ত্র বা পক্বাশয়, এবং বৃহদন্ত্র বা মলাশয় প্রভৃতি রহিয়াছে। বৃক্কদ্বয় (Kidneys) ইহার বাহিরে পশ্চাৎ দিকে অবস্থিত।

শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য। বিভিন্ন যন্ত্র আবার সমভাবেও কার্য্য করিয়া থাকে। মুখ, দাঁত, অন্ননালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্র এবং অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি যন্ত্র খাদ্য পরিপাকের নিমিত্ত একত্রে কার্য্য করে বলিয়া এই কয়েকটী যন্ত্রকে "পরিপাক-যন্ত্র-প্রণালী" বলে। আবার দেহে বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ, ও দূষিত বায়ু পরিহারের নিমিত্ত নাসিকা, গলকোষ, (Pharynx), শ্বাসনালী এবং ফুস্‌ফুস্‌ একত্র কার্য্য করিতেছে, এই নিমিত্ত উহাদিগকে "শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার যন্ত্র শ্রেণী" বলা হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড এবং সমুদয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রক্ত-বহানাড়ী (Blood vessels) একত্র হইয়া মানবদেহে রক্ত সঞ্চালিত করিয়া থাকে, উহাদিগের নাম "রক্ত-সঞ্চালনী যন্ত্রচয়"। বৃক্কদয়, ত্বক, ফুস্‌ফুস্‌, যকৃৎ এবং বৃহদন্ত্র, দেহ হইতে পরিত্যাজ্য পদার্থ বাহির করিয়া দেয় বলিয়া, উহাদিগকে "নিঃসরিণী-যন্ত্র" কহে। মস্তিষ্ক, মেরুরজ্জু এবং সমুদয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্নায়ু একত্র হইয়া দেহের অন্যান্য অঙ্গ সমূহকে চালিত ও নিয়মিত করিয়া থাকে, তাই উহাদিগকে "স্নায়ুমণ্ডল" (Nervous system) বলে। উপরে লিখিত যন্ত্র সমূহ ব্যতীত মানবদেহকে আকৃতি দিবার জন্য এবং উহার অঙ্গ রচনার নিমিত্ত অস্থি, এবং দেহের সমস্ত অংশ চালনার নিমিত্ত পেশী রহিয়াছে।

স্বাস্থ্যরক্ষার ছয়টী সাধারণ বিধি

দেহের সমুদয় অংশ রক্ষিত, এবং উহাদের অভাব পূরণ করা হইলে মানুষ পূর্ণ স্বাস্থ্য উপভোগ করিবে।

দেহের সমুদয় অঙ্গের স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত কিরূপ যত্ন করা আবশ্যক, তাহা একটী ইঞ্জিন ও তৎ-সংলগ্ন যন্ত্রাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়। একখানি ইঞ্জিন যাহাতে অনেক গুলি বোঝাই গাড়ী এক সঙ্গে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে, উহাকে এরূপ ভাল অবস্থায় রাখিতে হইলে, উহা নিয়মিত জল ও কয়লা দ্বারা পূর্ণ রাখিতে হইবে; এবং যন্ত্রের সচল অংশগুলিতে মাঝে মাঝে তৈল লাগাইয়া দিতে হইবে, চুল্লী হইতে ছাই ও অঙ্গার ফেলিয়া দিতে হইবে; যন্ত্রের সূক্ষ্ম অংশগুলির যেন ক্ষতি না হয় তজ্জন্য মাঝে মাঝে ধূলি ও ময়লা ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। ইঞ্জিন চালকের এই সমুদয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা, এবং ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার সম্বন্ধে তাহার বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ উহার কোন অংশ খারাপ হইবামাত্র

1. কপাল 2. কপালের পাশের রগ 3. গাল 4. চুয়াল 5. গলা 6. চিবুক 7. শ্বাসনালী 9. হাত 10. বাহুর নিম্নাংশ 11. বাহুর উর্দ্ধাংশ 12. কনুই 14. বগল 15. বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব 16. ছাতি 17. স্কন্ধদেশ 18. বক্ষের বাম পার্শ্ব 19. সমগ্র বাহু 20. উদর 21. যকৃৎ 22. প্লীহা 23. কুচকি 24. কুক্ষি 25. ও 26. নিতম্ব পাছা 27. উরু 28. হাঁটু 29. পায়ের ডিম 30. পায়ের গাঁইট 31. পায়ের পাতা 32. সমগ্র পা।

উহার কারণ নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। একখানা ইঞ্জিন চালাইবার পূর্ব্বে, যদি চালকের এতগুলি বিষয় জানিতে, এবং উহা রক্ষা করিবার উপায় শিক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকের নিজ দেহের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে, এবং কিরূপে উহাদের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্ভব হয়, তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যে বিশেষ আবশ্যক এ বিষয় কোন সন্দেহ নাই।

ইঞ্জিন চালক যদিও ইঞ্জিনখানির কিরূপে যত্ন লইতে হয়, তাহা না জানেন, তবে তিনি শীঘ্রই উহা নষ্ট করিয়া ফেলিবেন; সেইরূপ যে ব্যক্তি নিজ দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তিনি শীঘ্রই রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন। শরীর রক্ষার বিধিসমূহ এবং কি প্রকারে শরীর পালন করিতে হয় তাহা জানেন না বলিয়াই প্রতি-বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন।

শরীর পালন ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ছয়টী সাধারণ নিয়ম নিম্নে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল:—

১। শরীরের উপযুক্ত খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন।

২। শরীরের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে সূর্য্যালোক ও নির্ম্মল বায়ুর আবশ্যক।

৩। মলমূত্রাদি নিয়মিত-রূপে ত্যাগ করিতে হইবে।

৪। অধিক ঠাণ্ডা ও উত্তাপ হইতে শরীরকে রক্ষা করিতে হইবে।

৫। শরীরের পক্ষে প্রতিদিন উপযুক্ত ব্যায়াম ও বিশ্রামের প্রয়োজন।

৬। শরীরে যাহাতে কোন মতে বিষ এবং রোগোৎপাদক জীবাণু প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে।

উল্লিখিত ছয়টী নিয়ম পালন করিলে, রোগ পরিহার করা সম্ভব, এবং দীর্ঘ-জীবন লাভ সুনিশ্চিত; কিন্তু উহাদের একটী মাত্রও অবহেলা করিলে শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, রোগের আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী।

৩য় অধ্যায়

অন্নবহা নাড়ী, ও খাদ্যের পরিপাক

পূর্ব্ব অধ্যায়ে, আমরা একখানি ইঞ্জিনের সহিত শরীরের তুলনা করিয়াছি। এই অধ্যায়ে, ঐ তুলনাটী আরও বিস্তৃতভাবে ব্যবহার করা যাইতেছে।

লৌহ ও তাম্র, এই দুইটী প্রধান উপাদানে একখানা ইঞ্জিন প্রস্তুত হইয়া থাকে। কয়লা ও জল হইতে, উহার সমুদয় শক্তি উৎপন্ন হয়। ইঞ্জিনের কোন অংশ ক্ষয় হইয়া গেলে, উহা মেরামত করিবার জন্য লৌহ অথবা তাম্রের প্রয়োজন হয়, সুতরাং লৌহ ও তাম্রকে ইঞ্জিন মেরামতের উপাদান বলা যাইতে পারে। উহাকে সচল করিবার উদ্দেশ্যে, শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য সর্ব্বদা কয়লা ও জলের প্রয়োজন; তাই কয়লা ও জলকে ইঞ্জিনের উত্তাপ ও গতি-শক্তি-প্রদানকারী উপাদান বলিতে পারা যায়।

আমাদের দেহ নানা প্রকার উপাদানে গঠিত। যথা,—অস্থি (হাড়) এক প্রকার উপাদানে, ত্বক্ (চামড়া) আর এক প্রকার উপাদানে এবং স্নায়ু অন্য প্রকার উপাদানে গঠিত। জাগ্রত বা নিদ্রিত সকল অবস্থাতেই দেহের কোন না কোন অংশ সর্ব্বদা সঞ্চলিত হইতেছে, এবং ইঞ্জিনের কোন কোন নিয়ত কার্য্যশীল অংশের ন্যায়, উহাও ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, এই প্রকার ক্ষয় ও অপচয় পূরণ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের উপাদান আবশ্যক; আমাদের আহার্য্যে সেই সমুদয় উপাদান রহিয়াছে। কয়লা ও জল ইঞ্জিনের গতি শক্তি উৎপন্ন করে; সেইরূপ আমাদের ভুক্ত দ্রব্য, আমাদিগকে শক্তি প্রদান করে এবং সেই শক্তির নিমিত্তই, হৃদয়ের স্পন্দন, বাহু ও পদদ্বয়ের সঞ্চলন, এবং প্রত্যেক যন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন সম্ভব হইয়া থাকে। বাহিরের বায়ু উষ্ণ, বা শীতল যেরূপই হউক না কেন, আমাদের শরীর সর্ব্বদা উষ্ণ রহিয়াছে। দেহের এই স্বাভাবিক উত্তাপও আমাদের খাদ্য হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে খাদ্য দুইটী প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করে; প্রথমতঃ, উহা ইঞ্জিনের কয়লা ও জলের ন্যায়, কারণ উহা দেহকে উত্তাপ ও শক্তি দান করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, উহা ইঞ্জিনের মেরামতের কার্য্যে ব্যবহৃত তাম্র লৌহের ন্যায়, কারণ ইহা দেহের জীর্ণ সংস্কার, এবং বৃদ্ধি সাধনের উপাদান যোগাইয়া দিতেছে।

খাদ্যের পরিপাক আবশ্যক

শরীরের এক টুক্‌রা চামড়া ছিড়িয়া গেলে, উহা মেরামত করিতে ঐ স্থানে এক টুক্‌রা খাদ্য রাখিয়া দিলে কখনও আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। বাহুর কোন স্থানে একটা গর্ত্ত করিয়া, তাহাতে খাদ্য পুরিয়া দিলে, উহা হইতে কখনও বাহুতে উত্তাপ ও শক্তি পাওয়া যায় না। খাদ্য হইতে শরীর গঠনের উপাদান, উত্তাপ, অথবা শক্তি লাভ করিতে হইলে, উহা উত্তমরূপে চর্ব্বণ ও পরিপাক করিতে হইবে। পরিপাক বলিতে দেহে উত্তাপ ও শক্তি দান করিতে, জীর্ণ সংস্কার ও বৃদ্ধিসাধন করিতে, খাদ্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পরিবর্ত্তন বুঝায়।

1. উপরের পাটীর দাঁত 2. নিম্নের পাটীর দাঁত 3. জিহ্বা 5. নিম্নের চোয়াল 4. 6. ও 7. লালাগ্রন্থি।
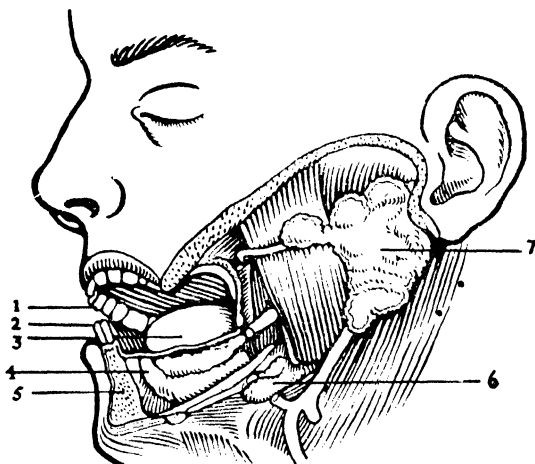
অন্নবহা নাড়ী

খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়ার নিমিত্ত, শরীরের যে অংশ কার্য্য করিতেছে, তাহাকে অন্নবহা নাড়ী বলা হইয়া থাকে। এই অন্নবহা নাড়ী একটী দীর্ঘ নলের ন্যায়, এবং উহা মুখ-গহ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া, বৃহদন্ত্রের প্রান্তভাগ (মলদ্বার) পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। উহার মধ্যভাগ কুণ্ডলীভূত হইয়া রহিয়াছে। বয়ঃপ্রাপ্তদিগের দেহে, এই নলটী প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা। অন্নবহা নাড়ীর বিভিন্ন অংশের পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে; যথা:—মুখগহ্বর, অন্ননালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্র-অন্ত্র ও বৃহদন্ত্র।

খাদ্য প্রথমে মুখগহ্বর দিয়া শরীরে প্রবেশ করে। মুখগহ্বরের মধ্যে রাখিয়া খাদ্য দন্তের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম অংশে উত্তমরূপে চিবাইতে হইবে।

চর্ব্বণ করিবার সময় উহা লালার সহিত মিশ্রিত হইতে থাকে; মুখ-বিবরে লালা-গ্রন্থি (Salivary glands) নামে তিন যোড়া মাংস-গ্রন্থি (Glands) রহিয়াছে; সেইগুলি হইতে লালা নিঃসৃত হইয়া মুখ-বিবরে আইসে। চিত্রে লালা-গ্রন্থি দেখান হইয়াছে। লালা পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে, এই জন্য খাদ্যদ্রব্য কখনও দ্রুত গিলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য নহে; উহা মুখ-বিবর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে হজমী লালার সহিত মিশ্রিত করিবার জন্য বেশ ভাল করিয়া চবাইতে হইবে। খাদ্য গিলিয়া ফেলিবার পরে উহা অন্ননালীর মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে পৌঁছিয়া থাকে।

পাকস্থলী

অন্ননালীর নিম্ন প্রান্তে, ভিস্তির মষকের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট যন্ত্রটী পাকস্থলী। প্রথমে, মানব-দেহের যে চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, উহা দেখিলেই
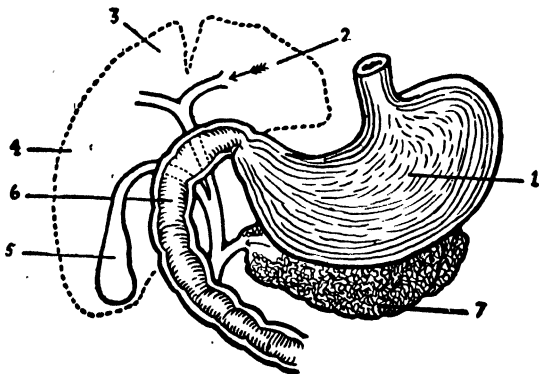
1. পাকস্থলী 2. যকৃৎ সংলগ্ন নাড়ী 3. ও 4. যকৃৎ 5. পিত্তকোষ 6. ক্ষুদ্র অন্ত্র 7. অগ্ন্যাশয়।

ইহার আকৃতি ও অবস্থান বুঝা যাইবে। বয়ঃপ্রাপ্তদিগের পাকস্থলীতে প্রায় দেড় সের হইতে দুই সের পরিমাণ জলীয় পদার্থ ধরে। পাকস্থলীর অভ্যন্তরের আবরণী দেখিতে ঠিক মুখ-বিবরের আবরণীর ন্যায়। এই আবরণী হইতে এক প্রকার তরল পদার্থ বাহির হয়; তাহাকে পাচক-রস (Gastric juice) কহে। পাচক-রস অতিশয় অম্ল, এবং মুখ-বিবরের হজমী লালার ন্যায় উহা দেহ রক্ষার নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্য পরিপাক কার্য্যে সাহায্য করে।

পাকস্থলীর অভ্যন্তরস্থ আবরণী হইতে, যখন পাচক-রস নিঃসৃত হয়, তখন উহা চর্ম্ম হইতে ঘাম নিঃসৃত হইবার মত দেখাইয়া থাকে; কারণ ঘাম যেরূপ

ভাবে চর্ম্ম হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইতে থাকে, পাচক-রসও পাকস্থলীর আবরণী হইতে ঠিক সেইভাবে, ধীরে ধীরে বাহির হয়।

পাকস্থলীর কার্য্য যাহাতে উত্তমরূপে সাধিত হয়, তজ্জন্য আমাদের আহার্য্য উপযুক্তভাবে পরিপাক হওয়া ও উহা ভালরূপে চর্ব্বণ করা আবশ্যক। খাদ্য আংশিক ভাবে পরিপক্ক হইলে পরিপাক ক্রিয়াও আংশিক ভাবে সম্পন্ন হইবে, এবং অনেক সময়ে খাদ্য গ্রহণের পরে, পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ হইবে ও অম্ল ঢেঁকুর উঠিতে আরম্ভ হইবে।

মদ, বা সুরা জাতীয় অন্য কোন দ্রব্য পান করিলে, পাকস্থলীর অভ্যন্তর-ভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চা ও ধূম্রপানেও পাকস্থলীর ক্ষতি হয়। মস্‌লা, লঙ্কা, আদা এবং পানও পাকস্থলীর অভ্যন্তর-ভাগের ক্ষতি সাধন করে। লঙ্কা, আদা এবং মস্‌লা মুখের মধ্যে পুরিয়া রাখিলে মুখে ঝাল লাগে, কিন্তু মুখে খুব ঝাল জিনিষ সহিতে অভ্যাস করা যায় বলিয়া আমরা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করি না। যেমন একজন কর্ম্মকার অভ্যাসের গুণে, তাহার হাত দিয়া অনায়াসে উত্তপ্ত এক খণ্ড ধাতু পদার্থ অনায়াসে তুলিয়া লইতে পারে, তাহাতে তাহার কোনই বেদনা বোধ হয় না, ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহারে, আমাদেরও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। অধিকন্তু উপরি লিখিত উগ্রদ্রব্যগুলি, অধিক্ষণ মুখের মধ্যে না রাখিয়া অতি দ্রুত গিলিয়া ফেলা হয়। এই সমুদয় ঝাল জিনিষ মুখ-বিবরের আবরণী অপেক্ষা পাকস্থলীর আবরণীর অধিকতর ক্ষতি করে, কারণ মুখ-বিবর যেমন সহজে উহাকে স্থানান্তরিত করিতে পারে, পাকস্থলী তেমন পারে না; যে পর্য্যন্ত খাদ্য পাকস্থলীতে থাকে, —এক ঘণ্টায়ই হউক বা তাহা অপেক্ষা
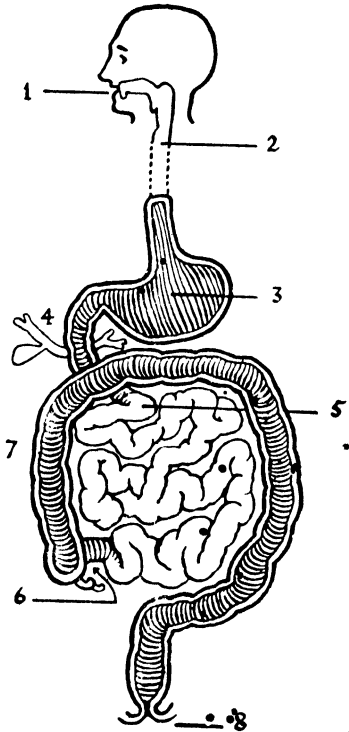
1. মুখ গহ্বর 2. কণ্ঠনালী 3. পাকস্থলী 4. পিত্তকোষ ও পিত্তবাহীনল 5. ক্ষুদ্র অন্ত্র 6. ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোজক 7. বৃহদন্ত্র ও কোলন ৪. মলদ্বার।

অধিকই হউক,—উহা পাকস্থলী দগ্ধ করিতে থাকে, এই সকল মস্লা শরীরের কোনই উপকার করে না, বরং অপকার করে, সুতরাং উহা ব্যবহার করা মোটেই উচিত নহে।

ক্ষুদ্র অন্ত্র

খাদ্য আধ ঘণ্টা হইতে কয়েক ঘণ্টাকাল পাকস্থলীতে থাকিবার পর, উহার অধিকাংশ ক্ষুদ্র অন্ত্রে চলিয়া যায়; খাদ্য যেরূপ গুরু এবং উহা যেরূপে চর্ব্বিত ও পরিপক্ক হয়, তাহার উপর উহার পাকস্থলীতে থাকিবার কাল নির্ভর করে। ক্ষুদ্র অন্ত্র বিশ ফুট লম্বা একটী নলের মত, উহা উদর গহ্বরে কুণ্ডলী হইয়া রহিয়াছে।

যকৃৎ ও পিত্তাশয় হইতে একটী ক্ষুদ্র নল বাহির হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রের উর্দ্ধাংশে উন্মুক্ত রহিয়াছে। যকৃতে পিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উহা উক্ত প্রণালী বহিয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করে। শরীর রক্ষার জন্য পিত্ত খাদ্যকে শরীরের উপযোগী করিতে সাহায্য করে। আর একটী ক্ষুদ্র প্রণালীও অগ্ন্যাশয় হইতে বাহির হইয়া, ক্ষুদ্র অন্ত্রের উর্দ্ধ প্রান্তে উন্মুক্ত রহিয়াছে, অগ্ন্যাশয়ে উৎপন্ন এক প্রকার রস উহা হইতে ক্ষুদ্র অন্ত্রে নিঃসৃত হইয়া পরিপাক ক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য করে।

বৃহদন্ত্র

ভুক্ত দ্রব্য ক্ষুদ্র অন্ত্রের নিম্নভাগে পৌছিয়া, বৃহদন্ত্রের দিকে চালিত হইবার পূর্ব্বেই দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্যের সারাংশ, রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট খাদ্য বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে, উহার অধিকাংশই পরিপাক করা সম্ভব নহে। বৃহদন্ত্র দিয়া যাইবার সময়ে, ঐ খাদ্যাংশের নানারূপ পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, এবং অল্প বা অধিক মাত্রায় দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত হয়। প্রতিদিন মলত্যাগ করা অতিশয় প্রয়োজনীয়, নতুবা ঐ সকল বিষাক্ত পদার্থ রক্তে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দেহে সঞ্চালিত হয় ও মুখে দুর্গন্ধ, মাথাধরা ও আরও অনেক ব্যাধির সৃষ্টি করে। যাহাদের কোষ্ঠ কাঠিন্য আছে, তাহাদের মুখের দুর্গন্ধ ঠিক বিষ্ঠার ন্যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তির কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত হইলে, বৃহদন্ত্রের মলভাগের বিষাক্ত অংশ সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ঐ বিষাক্ত পদার্থ যে বিশেষ ক্ষতিজনক তাহা বলাই বাহুল্য।

পরিপাক প্রাপ্ত খাদ্যের পরিগ্রহণ

খাদ্য সম্পূর্ণরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হইলে পর, উহা জলের ন্যায় তরল হয়। পাকস্থলী ও ক্ষুদ্র অন্ত্রের গাত্রে যে সকল রক্ত-বহানাড়ী (Blood vessels)

রহিয়াছে, ঐ জলীয় পদার্থ,—চিনি মিশ্রিত জল কয়েক ভাঁজ পুরু কাপড়ের থলিয়া ভেদ করিয়া যেরূপ ধীরে ধীরে বাহির হইতে পারে,—কতকটা সেইরূপে রক্ত-বহানাড়ীতে প্রবেশ করে।

পরিপাক প্রাপ্ত খাদ্য রক্তে সঞ্চারিত হইবার পর, পুনরায় রক্ত দ্বারা উহা দেহের প্রতি অঙ্গে চালিত হইয়া, ইঞ্জিনের কয়লার ন্যায় উত্তাপ ও তেজঃ উৎপন্ন করে। যে যে অঙ্গের জীর্ণ সংস্কার করিতে হইবে, সেই সেই অঙ্গে রক্ত চালনার সময়, পরিপাক-প্রাপ্ত খাদ্য হইতে পুনর্গঠনের যে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে, রক্ত তাহাই বিতরণ করিয়া থাকে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, খাদ্যদ্রব্য হইতেই আমাদের শরীর গঠিত হয়; সুতরাং সুস্থ এবং নির্দোষ দেহ লাভ করিতে হইলে শুধু বিশুদ্ধ খাদ্যই ভোজন করা কর্ত্তব্য। চাউল, আটা, ময়দা প্রভৃতি খাদ্য বস্তু পেশী, অস্থি ও স্নায়ুতে পরিবর্ত্তিত হয়। বাস্তবিক, ইহা কি অতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে? সমুদয় জ্ঞান ও শক্তির মূলাধার পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যে এই মানবদেহ পরিকল্পিত ও সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ; কারণ দেহে উত্তাপ ও তেজঃ দান করিতে, জীর্ণ দেহের সংস্কার করিতে, উপাদান সংগ্রহ করিবার এরূপ আশ্চর্য্য, নিখুঁত প্রণালী, কখনও আকস্মিক ঘটনা প্রসূত নহে, অথবা মানব বুদ্ধিতে সম্ভব নহে।

জলপানের আবশ্যকতা

খাদ্য যখন বৃহদন্ত্রের নিম্নভাগে যায়, তখন উহা অর্দ্ধ তরল অবস্থায় থাকে; ক্ষুদ্র অন্ত্র ইতঃপূর্ব্বেই ঐ খাদ্য বস্তু হইতে উহার যাহা শোষণ করিয়া লইবার তাহা শোষণ করিয়া লয়। এই অবস্থায়, বৃহদন্ত্রের নিম্নাংশ, অর্থাৎ কোলন যন্ত্র তন্মধ্যস্থ অসার বস্তুর জলীয়াংশ শোষণ করিয়া লয়; এই শোষিত তরল পদার্থ দেহ হইতে বহির্গত করিবার জন্য বৃক্কদ্বয়ে নীত হয়। এই শোষণ ক্রিয়ার ফলে কোলন যন্ত্রস্থ খাদ্য কতকটা কঠিন পদার্থে পরিণত হয়; উহার সম্মুখে ও পশ্চাতে আকুঞ্চন ও প্রসারণের ফলে, ক্রমে উহা অবতরণ করিয়া বৃহদন্ত্রের শেষ প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা এই স্থানে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ না ইহাকে শরীর হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, ততক্ষণ ইহা এই স্থানেই অবস্থান করে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শরীর যে পর্য্যন্ত না ঐ অসার মলকে বাহির করিয়া দেয়, সে পর্য্যন্ত উহা উক্ত স্থানেই অবস্থান করে। যদি কেহ অল্প জল

পান করেন, তাঁহার ভুক্ত খাদ্য বৃহদন্ত্রে আসিলে, উহাতে আদৌ জল থাকে না, কাজেই কোলনের কাজ করিবার প্রায় কিছুই থাকে না। এইরূপ ব্যক্তি কোষ্ঠকাঠিন্যে কষ্ট পাইয়া থাকেন।

এক্ষণে বিশেষ বক্তব্য বিষয় এই যে, ক্ষুদ্র অন্ত্রস্থ খাদ্য উপযুক্তরূপে তরল রাখিতেও যথেষ্ট জল পান প্রয়োজন। প্রয়োজনাতিরিক্ত জল পান করিলে, অতিরিক্ত জল নিঃসরণী-যন্ত্রে নীত হইয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। অপর পক্ষে যদি ক্ষুদ্র অন্ত্রস্থ খাদ্য অধিক জল না পায়, তাহা হইলে উহার অসার অংশ বৃহদন্ত্রে গেলে দেখা যায় যে, উহার কতক জল ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে; কোলনের কার্য্যের জন্যও যথেষ্ট জলের প্রয়োজন। অতএব প্রচুর জল পান করা আবশ্যক।

৪র্থ অধ্যায়
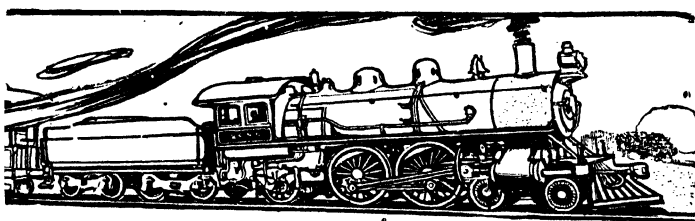
দাঁত ও দাঁতের যত্ন

শিশুর ছয় সাত মাস বয়ঃক্রমকালে দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে। এক বৎসর বয়সে ছয়টী, দেড় বৎসর বয়সে বারটী, দুই বৎসরে ষোলটী, এবং আড়াই বৎসরে বাল্যাবস্থার অস্থায়ী কুড়িটী দন্তনির্গম সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। ছয় বৎসর বয়ঃক্রম-কালে, স্থায়ী দন্তগুলি নির্গত হইতে আরম্ভ করে। শৈশবের অস্থায়ী দন্তের পশ্চাতে, প্রথম চারিটী স্থায়ী দন্ত দেখা দেয়। পরে সম্মুখ ভাগের অস্থায়ী দাঁতগুলি শিথিল হইয়া পড়িয়া গেলে, স্থায়ী দাঁত উহাদের স্থান অধিকার করে। অবশেষে বাল্যাবস্থার সমুদয় অস্থায়ী দাঁত পড়িয়া যায় এবং উহাদের স্থানে স্থায়ী দাঁত বাহির হয়।

ছোট ছোট বালক বালিকার দাঁতের যত্ন করা ও সেগুলিকে পরিষ্কার রাখা উচিত। যতদিনে স্থায়ী দাঁত নির্গত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ঐগুলি অক্ষুণ্ণ থাকা প্রয়োজন। বাল্যাবস্থার অস্থায়ী দাঁতের যত্ন করিতে অবহেলার ফলে, অনেকের স্থায়ী দাঁত বিকৃত ও কদাকার ভাবে বাহির হয়, ইহার কারণ এই যে স্থায়ী দাঁতগুলি বাহির হইয়া, উহাদের স্থান অধিকার করিবার পূর্ব্বেই অস্থায়ী দাঁতগুলি পড়িয়া যায়; সেই জন্য স্থায়ী দাঁত কখনও বা সম্মুখে, কখনও বা পশ্চাতে বক্র হইয়া নির্গত হয়।

স্থায়ী দাঁত মোট বত্রিশটী; তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় চারিটী দাঁত সতের বা আঠার বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কখনও বাহির হয় না। এই স্থায়ী দাঁতগুলি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত থাকা উচিত। নাক, কান ও আঙ্গুলের মত দাঁতও দেহের একটী প্রয়োজনীয় অংশ এবং ঐ সকল অঙ্গের একটী নষ্ট হইলে যেমন দেহ পঙ্গু হয়, একটী দাঁত নষ্ট হইলেও দেহ তদ্রূপ পঙ্গু হইয়া থাকে।

দাঁতের ব্যবহার

দাঁতের কার্য্য খাদ্য বস্তু চর্ব্বণ, অর্থাৎ খাদ্য বস্তুকে অতি ক্ষুদ্র কণায় চূর্ণ ও লালার সহিত মিশ্রিত করিয়া, পরিপাক ক্রিয়ার সূচনা করিয়া দেওয়া। কথা বলিতেও আমাদের দাঁতের সাহায্য প্রয়োজন; কারণ দাঁত পড়িয়া গেলে কোন বর্ণ পরিষ্কার ভাবে উচ্চারণ করা যায় না। দাঁতের ব্যবহার এত প্রয়োজনীয়, এবং উহাদের অবস্থার উপরে স্বাস্থ্য এত অধিক নির্ভর করে যে, ইউরোপের একটী প্রধান জাতি, এই নিয়ম প্রচলন করিয়াছেন যে সৈন্যদিগের বন্দুক যেমন নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়, সেইরূপ তাহাদের প্রত্যেকের দাঁত ও

দাঁত মাজিবার ব্রুস্‌ও প্রতিদিন পরীক্ষা করিতে হইবে। কোন কোন জীবন বীমা কোম্পানী, বীমা-কারীদের দন্ত চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত, কোম্পানীর ব্যয়ে দন্ত-চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া থাকেন; কারণ খারাপ দাঁতের ফলে ব্যাধি ও মৃত্যুতে যত অধিক ব্যয় করিতে হয়, চিকিৎসক নিযুক্ত করায় তাহা অপেক্ষা কোম্পানীর কম খরচ হইয়া থাকে।

অপরিচ্ছন্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁত স্বাস্থ্যহানিকর

যিনি নিয়মিত দাঁত মাজেন না, তিনি একটী দাঁত খুঁটনি দিয়া দাঁত খুঁটিয়া শুঁকিলেই বুঝিবেন যে দাঁতে পচা জিনিষ আছে। দাঁতের মধ্যস্থিত ঐ পচা জিনিষে রোগের লক্ষ লক্ষ জীবাণু জন্মিয়া থাকে। চর্ব্বণ করিবার সময় এই সকল জীবাণু খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়; পরে খাদ্য গিলিবার সময় ঐ সকল জীবাণু খাদ্যের সহিত পাকস্থলী ও অন্ত্রে চলিয়া যায়। উহারা তথন ভুক্ত বস্তুকে মাতাইয়া ও অম্ল করিয়া তুলে; ফলে অজীর্ণ ও অম্বল সৃষ্টি করে। দন্ত মধ্যস্থ রোগ-জীবাণু, নাসিকায়, কর্ণে, ফুস্‌ফুসে তালুপার্শ্ব গ্রন্থিতে (Tonsils) পৌঁছিয়া ঐ সমুদয় অঙ্গে বিভিন্ন রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁত থাকিলে, ঐ অপরিচ্ছন্ন দাঁত হইতে দূষিত ও বিষাক্ত গ্যাস প্রতি নিশ্বাসে মিশিয়া যায়। উক্ত বিষাক্ত গ্যাস ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া শুধু যে ফুস্‌ফুসের ক্ষতি করে এরূপ নহে, রক্তে মিশ্রিত হইয়া সমস্ত দেহেরও বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে।

ক্ষয়রোগ প্রভৃতি ব্যাধির চিকিৎসায়, চিকিৎসকগণ প্রথমে রোগীর দাঁত ভাল করিবেন। ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁতগুলির গর্ত্ত বুজাইবার এবং ব্রুস্ দ্বারা দৈনিক দাঁত পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপে চিকিৎসার প্রথমেই দাঁতের যত্ন না করিলে, শক্তি লাভের ও রোগজনিত ক্ষতি পূরণের উপযোগী পুষ্টিলাভ করা দেহের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

দাঁত ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার কারণ

ভুক্ত দ্রব্যের অতি ক্ষুদ্র কণাগুলি দাঁতের সংস্পর্শে কিছুকাল থাকিয়া পচিয়া যায়; ইহাতে দাঁতও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন ঝুড়ির একটী আম পচিতে আরম্ভ করিলে, যেমন শীঘ্রই অপর আমগুলিও পচিতে আরম্ভ করে; সেইরূপ একটী দাঁত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইলে, তাহার পার্শ্বের অপরগুলিও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইবে।

দাঁতের মাঢ়ীর ধারে, দাঁতের ফাঁকে, এবং চর্ব্বণ দন্তের উপরের গর্ত্তে ভুক্তদ্রব্যের কণা জমা হয়। মাঢ়ীর ধারে জীবাণু বৃদ্ধি পাইলে মাঢ়ী শিথিল হওয়ায় দাঁতের মূলের কতকটা বাহির হইয়া পড়ে। মাঢ়ী ও দাঁতের ফাঁক

যখন বাড়িতে থাকে, তখন ঐ সকল ফাঁক জীবাণুর উপযুক্ত বাসস্থান হয়; এবং জীবাণু ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি পায়, যে উহা দুর্গন্ধ পূঁজে পূর্ণ হইয়া থাকে; তখন উষ্ণ বা শীতল কিছু পান বা ভোজন করিলেই দাতে যন্ত্রণা হয়। শেষে দাঁত এরূপ শিথিল হইয়া পড়ে, যে উহা কোন কাজে লাগে না; সুতরাং তুলিয়া ফেলিতে হয়। পান চর্ব্বণের কু-অভ্যাস অতিশয় দূষণীয়। প্রথমতঃ উহাতে থুথু ফেলিবার কদর্য্য অভ্যাস জন্মিয়া থাকে। পান চিবাইবার কালে প্রচুর পরিমাণ লালা অপব্যয়িত হয়। পানের সহিত যে চূণ ব্যবহৃত হয়, তাহাতে মাঢ়ীদ্বয় সঙ্কুচিত হয়, এবং দাঁতের পাটী শিথিল ও ক্ষয় হইয়া থাকে। অনেক আফিংখোর ব্যক্তি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিলেও, যেরূপ প্রমাণিত হয় না যে আফিং অপকারী
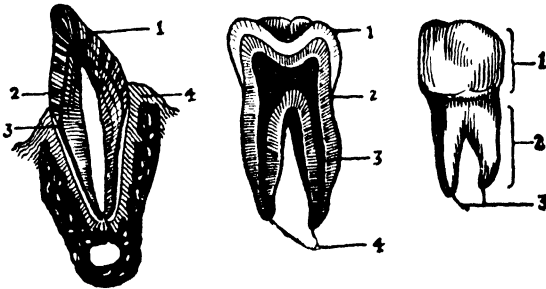
1. এনামেল (মিনা)
2. দাঁতের প্রধান উপাদান
3. সীমেণ্ট
4. ডেণ্টাল পেরিওষ্টিয়ান্ (মাঢ়ী মধ্যস্থ দন্তের আবরণী)

1. এনামেল
2. দাঁতের গলা
3. দাঁতের প্রধান উপাদান
4. দাঁতের শিরা

1. উপরিভাগ
2. মূল
3. দাঁতের শিরা

নহে; সেইরূপ বহুবৎসর পান ব্যবহার করিয়া, কাহারও কাহারও দাঁত অটুট থাকিলে প্রমাণিত হয় না যে পান অপকারী নহে।

কিরূপে দাঁতের যত্ন করিতে হয়

দাঁত যতবার ব্যবহৃত হয়, ততবারই উহাদের মাজা উচিত; অন্ততঃ সকালে একবার এবং রাত্রিতে শয্যাগ্রহণের পূর্ব্বে একবার অবশ্য দাঁত মাজিতে হইবে। কাঠের দাঁত-খুঁটনি দিয়া দাঁতের ফাঁকের খাদ্যাংশ তুলিয়া ফেলিতে হইবে, (ধাতুনির্ম্মিত দাঁত-খুঁটনি ব্যবহার করা কখনও উচিত নহে) তৎপরে একটু সম্ভব মত শক্ত ব্রুস্ ও জল দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করিতে হয়। আড়া-আড়িভাবে উপরে নীচে দুই দিকেই ব্রুস্ দিয়া দাঁত ঘষিতে হয়। দাঁতের সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিকেই ঘষা উচিত। ব্রুসের কুঁচিগুলি দাঁতের ফাঁকে ঢুকাইয়া তথাকার খাদ্যাংশ সমূহ বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। দুই দাঁতের

মধ্যস্থ খাদ্যাংশ যদি দাঁত-খুঁটনি দিয়া বাহির করা না যায়, একগাছা রেশম বা শণের সূতা লইয়া, যেরূপে করাত চালায়, সেইরূপে দুই দাঁতের মধ্য দিয়া চালাইবেন, এইরূপেই উহা বাহির হইয়া যাইবে। মাঢ়ীর পাশও ব্রুস্ দিয়া ঘষা উচিত; প্রথমে একটু রক্ত পড়িলে কিছু ক্ষতি হইবে না। কয়েক বার ব্রুস্ দিয়া ঘষিলেই মাঢ়ী শক্ত হইয়া যাইবে। দিনে অন্ততঃ একবার দাঁত মাজিবার গুড়া ব্যবহার করিতে হইবে। খড়িমাটী খুব সুন্দররূপে চূর্ণ করিয়া, তাহার সহিত কতকটা বন হরিদ্রার শিকড়ের গুড়া (Orris root) মিশাইয়া, স্বাদ ও সুগন্ধের জন্য কতকটা দারুচিনির তৈল মিশাইলে, এক প্রকার বাজারচলন দন্ত-মঞ্জন প্রস্তুত হইবে (৫০ অধ্যায়ে ১৪নং ব্যবস্থা পত্র দেখুন)।

দাঁত মাজিবার পক্ষে লবণ বেশ উপকারী। কতকটা লবণ ব্রুসের উপর দিয়া দন্ত-মঞ্জন দিয়া দাঁত মাজিবার ন্যায় মাজিতে হয়।

ব্রুস্ দিয়া দাঁত মাজিবার পর, উহাতে একটু লবণ ঘষিয়া, যতক্ষণ না পুনরায় ব্যবহার করা হয়, ততক্ষণ ঐরূপ রাখিয়া দিতে হইবে। এইরূপ না করিলে ব্রুস্ বড়ই ময়লা হয়; এবং ময়লা ব্রুস্ দিয়া দাঁত মাজিলে, মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল অধিক হইতে পারে। দাঁত পরিষ্কার করিতে কখনও অসিদ্ধ জল ব্যবহার করিবেন না। অসিদ্ধ জলে উদরাময়, ও কলেরার জীবাণু থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, কেহ কেহ হাত মুখ ধুইবার সময়, কোন পুষ্করিণী বা পাত্র হইতে মুখে জল লইয়া কুলকুচি করেন। ইহা বড়ই কদর্য্য অভ্যাস; কেবল যে কদর্য্য তাহা নহে, বিপজ্জনকও বটে। অসিদ্ধ জলে মুখ ধোয়া যে যে কারণে বিপজ্জনক, ইহারও সেই একই কারণ। মুখের জল ফেলিয়া দেওয়া হইলেও, সমস্ত জল কখনই ফেলা যায় না, মুখে যথেষ্ট জল থাকে, তাহাতে উদরাময়, কলেরা, আন্ত্রিক জ্বর হইতে পারে।

দাঁত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইলেই, দন্ত-চিকিৎসক দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ বুজাইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। উহা যত শীঘ্র সম্পন্ন হয় ততই ভাল, কারণ ক্ষয়প্রাপ্ত ক্ষুদ্র অংশ পূরণ করা, বৃহৎ অংশ পূরণ করা অপেক্ষা, অল্প-ব্যয়সাধ্য; বেদনাও অল্প পাইতে হয়। ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁতের শূন্য স্থানটী ছোট থাকিতে থাকিতে পূর্ণ করিয়া না দিলে, উহার উভয় পার্শ্বের দাঁতগুলিও শীঘ্র ক্ষয় হইয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। দাঁতের বেদনা সহ্য করা, এবং অবশেষে বাধ্য হইয়া দাঁত তুলিয়া ফেলিয়া, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দাঁত বাঁধাইয়া লওয়া অপেক্ষা, দিনে অন্ততঃ দুইবার দাঁত ব্রুস্ করা, এবং যেই দাঁত ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়, অমনি দন্ত-চিকিৎসক দেখাইয়া দাঁত ঠিক করিয়া লওয়া ভাল। বাঁধান দাঁত যত ভালই হউক না কেন, তাহাতে কখনও প্রকৃতিদত্ত দাঁতের মত কাজ হয় না।

৫ম অধ্যায়

সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য

দেহের পুষ্টি সাধনের নিমিত্ত, যে সকল খাদ্য-বস্তুর প্রয়োজন, সেই সমুদয়কে তিনটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যথা,—শ্বেতসার ও শর্করা (Carbohydrates), প্রোটীড্ বা যবক্ষারজান বিশিষ্ট উপাদান (যেমন ডিম্বের শ্বেতাংশ), তৈল ও চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ (Fats)। এতদ্ব্যতীত দেহের পুষ্টিসাধন-কল্পে খনিজ পদার্থ (যেমন—লবন), এবং ভিটামিন্‌ও (খাদ্যবিশেষ) প্রয়োজন। শাকসব্‌জি, এবং বিভিন্ন ফলে ভিটামিন্ পাওয়া যায়। শরীরের পুষ্টির জন্য, উল্লিখিত প্রত্যেক শ্রেণীর কিছু কিছু পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন। এই নিমিত্ত কেবল একটী মাত্র খাদ্য দ্বারা,—যেমন শুধু ভাত বা শুধু আলু দ্বারা,—কখনও শরীরের যথেষ্ট পুষ্টিসাধন সম্ভব নহে। অনেক লোক শুধু ভাতের উপরে নির্ভর করিয়া, নিজেদের অনিষ্ট-সাধন করেন। ভাতের সহিত মটরশুটি, গম, ডাল, ডিম, ও শাকসব্‌জি প্রভৃতি খাওয়া উচিত; নতুবা স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী দেহের পুষ্টিসাধন সম্ভব নহে।

বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে, কেবল শস্য ও ফলমূল-জাতীয় দ্রব্য, মানবের খাদ্য। সর্ব্বজ্ঞ সৃষ্টি-কর্ত্তা মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং মানব-দেহের পক্ষে কোন্ কোন্ খাদ্য প্রয়োজনীয়, তাহা সৃষ্টিকর্ত্তাই উত্তমরূপে জানেন। শরীরকে সম্পূর্ণ সুস্থ, ও শক্তি সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে শাকসব্‌জি, ফলমূল ও শস্যই যথেষ্ট; ঐ সকল পাইলে আমিষ খাদ্যের কোনই প্রয়োজন নাই;—এই বিষয় যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

গম, ডাল, কলাই, চাউল, ভুট্টা এবং চীনা বা জোয়ারই, শস্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

বাদাম জাতীয় খাদ্যের মধ্যে, আখ্‌রোট্, চীনা বাদাম, কেশুয়াদানা, বাদাম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই সকল খাদ্য, সাধারণ খাদ্যের সহিত কেবল খাইবার সময় ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইতে হইবে।

কমলালেবু, কলা, আম, আপেল, আঙ্গুর, খুবানিফল, পিচফল, ডুমুর এই সকল ফল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ফল অতিশয় উপকারী খাদ্য। উহা রক্ত নির্দ্দোষ ও নির্ম্মল রাখিতে, এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার করিতে, সাহায্য করে। বাজারের যে সকল ফল রন্ধন না করিয়াই আহার করিতে হয়, প্রথমে সে গুলিকে ফুটন্ত জলে

ধৌত করিয়া, পরে খোসা ছাড়াইয়া লইতে হয়। কতকগুলি ফলকে জলে সিদ্ধ করিয়া লইলে অথবা সেঁকিয়া লইলে অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্য হয়। যে সকল ফল ও শাক-সব্জি আমরা রন্ধন না করিয়াই ব্যবহার করি, তাহাতে ভিটামিন্ আছে; অতএব আমাদের খাদ্যের মধ্যে ঐরূপ খাদ্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। বালক-বালিকাদিগের পক্ষে টাট্কা ফল ও শাকসব্জি ভোজন করা বিশেষ প্রয়োজনীয়; কারণ উহাতে যেরূপ খাদ্য আছে, তাহাদের শরীর বৃদ্ধির পক্ষে সেইরূপ খাদ্য আবশ্যক।

ডিম্ব এবং দুগ্ধও উৎকৃষ্ট খাদ্য। ছোট শিশুদের পক্ষে দুগ্ধই সর্ব্বপ্রকার খাদ্যের কাজ করিতে পারে। পান করিবার পূর্ব্বে দুগ্ধ ফুটাইয়া লইতে হইবে। গরম করিবার পর পাঁচ ছয় ঘণ্টার অধিককাল দুগ্ধ ফেলিয়া রাখা উচিত নহে, কেননা উহাতে রোগের জীবাণু অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

আমিষ খাদ্য

অনেকে এইরূপ ভুল ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন যে আমিষ মানুষের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্য। নাতিশীতোষ্ণ অথবা উষ্ণ-প্রধান দেশে, প্রচুর পরিমাণ অন্যান্য খাদ্য পাওয়া যায়; আমিষ খাদ্য অপেক্ষা সেই সকল নিরামিষ খাদ্য পুষ্টিকর, বিশুদ্ধ ও সুলভ।

এতদ্ব্যতীত, বর্ত্তমান কালে যে সকল প্রাণীর মাংস ভোজন করা হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই রোগ-দুষ্ট। মানুষের যে সকল রোগ হয়; গরু, শূকর, প্রভৃতি পশুও সেই সকল রোগের অনেকগুলি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। যাহারা এই সকল রোগ-দুষ্ট প্রাণীর মাংস ভোজন করেন, তাহাদের ঐ সমস্ত ব্যাধি হইতে পারে। জগতে যত প্রাণী আছে, শূকর তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অপরিষ্কার; তবুও কোন কোন দেশে ইহার মাংস বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যত প্রকার পচা, ও অপরিষ্কার জিনিষ আছে, শূকরে সবই খাইয়া থাকে; এবং অপরিষ্কার জায়গায় গড়াগড়ি দিতে উহারা বড়ই ভালবাসে। একখানি বহু পুরাতন গ্রন্থে, মানুষের খাদ্যাখাদ্য বিচার করা হইয়াছে; এই পুস্তকে বিশেষরূপে লিখিত আছে যে শূকর অপরিষ্কার প্রাণী ও ইহার মাংস ভোজন করা উচিত নহে।

অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, মাংসে অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য অপেক্ষা, অধিক সারবস্তু আছে। কিন্তু আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা, বহু গবেষণার ফলে ঐরূপ ধারণার অসারতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, যে পাঁচসের মাংসে যে পরিমাণ সারবস্তু আছে, এক সের চীনা-বাদামে তদপেক্ষা অধিক সারবস্তু রহিয়াছে, ইহাতে দেখা যায় যে মাংস খাইলে বহু ব্যয়; বিবিধ ফলমূল, শাকসব্জি, ও তরিতরকারী, পাওয়া গেলে, উহা ব্যবহারে তদপেক্ষা

ব্যয় সংক্ষেপও হইয়া থাকে এবং আমিষ খাদ্যজনিত নানাপ্রকার ব্যাধির আক্রমণ হইতেও দূরে থাকা যাইতে পারে।

রন্ধন প্রণালী

পাকা ফল ও বাদাম প্রভৃতি ব্যতীত অধিকাংশ খাদ্য খাইবার পূর্ব্বে রন্ধন করা আবশ্যক। রন্ধন দ্বারা তিনটী কার্য্য সাধিত হয়; প্রথমতঃ খাদ্যে যে প্রচুর রোগোৎপাদক জীবাণু রহিয়াছে, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, সহজে পরিপাক হয়। গম, ডাল, মটরশুঁটী, প্রভৃতি অনেক প্রকার খাদ্য আছে, যে সমস্ত রন্ধন না করিলে, আমাদের পরিপাক যন্ত্র উহাদের হজম করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, রন্ধনে খাদ্য রুচিকর হয়। চাউল, গম, শুঁটী চীনা প্রভৃতি খাদ্য রন্ধন করিয়া খাইতে যেরূপ সুস্বাদু, কাঁচা খাইতে সেরূপ নহে।

খাদ্য তিন প্রকারে রন্ধন করা যাইতে পারে, যথা—সিদ্ধ করিয়া, সেঁকিয়া এবং ভাজিয়া।

উল্লিখিত তিনটী উপায়ের মধ্যে, ভাজাই নিকৃষ্ট; এই প্রণালীর দ্বারা খাদ্য অল্প সময়ে প্রস্তুত করা যায় বটে, কিন্তু ভাজা খাদ্য গ্রহণ করিয়া, পরিপাক যন্ত্রাদির ক্ষতি করা অপেক্ষা, অধিক্ষণ ধরিয়া উত্তমরূপে রন্ধন করাই শ্রেয়ঃ। ভাজিতে যে তৈল ব্যবহার করা হয়, খাদ্যের প্রত্যেক টুকরার উপরে, উহার এরূপ আবরণ পড়ে যে, মনে হয় যেন তৈল দিয়া, খাদ্য টুকরাকে রং করা হইয়াছে। এই প্রকারে তৈলাবৃত খাদ্য, যখন পাকস্থলীতে পৌঁছে, তখন উহা সহজে হজম করা যায় না; কারণ পাকস্থলীর রস তৈল পরিপাকে অসমর্থ। ফলে, ভাজা খাদ্য পাকস্থলীতে এক ঘণ্টা বা আধ ঘণ্টার অতিরিক্ত সময় থাকিয়া যায় এবং মাতিয়া উঠিতে আরম্ভ করে; অবশেষে পেটে জ্বালা ও বেদনা হয়। ক্রমাগত ভাজা খাদ্য গ্রহণের ফলেও অজীর্ণ হইয়া থাকে।

উপযুক্ত ভাবে খাদ্য প্রস্তুত করিবার উপরে পরিবারের স্বাস্থ্য বিশেষরূপে নির্ভর করে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, লোকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখিয়া রান্নাঘর তৈরী করিতে এবং যে ভালরূপে রন্ধন করিতে জানে, তাঁহাকেই পাচক নিয়োগ করিতে বিশেষ মনোযোগী হন না। অধিকাংশ লোকই গৃহনির্ম্মাণ করিবার সময়, বাড়ীর অপরাপর অংশের জন্য বহু অর্থব্যয় করেন কিন্তু একটী ছোট, পতনোম্মুখ, অস্বাস্থ্যকর, নিয়মিত দরজা জানালা বিহীন চালাকে রান্নাঘর করেন। এইরূপ রান্নাঘরে উত্তম পরিষ্কার খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে না। রান্নাঘরটী যেন বাড়ীর একটী উত্তম ঘর হয়। রান্নাঘরে যাহাতে যথেষ্ট সূর্য্য-কিরণ প্রবেশ করিতে পারে, তজ্জন্য জানালার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। ঘরের

মেজে, বেড়া ও দেয়াল, ও চালা বা ছাদ; পরিষ্কার রাখিতে হইবে। পাকাঘর হইলে, মাঝে মাঝে চূণকাম করা আবশ্যক। রান্নাঘরের ময়লা জল ও আবর্জ্জনা রাখিবার জন্য, ঢাকনিযুক্ত বাল্তি, অথবা অপর কোন পাত্রে রাখিয়া দিবেন, কখনও ঘরের সম্মুখে, পার্শ্বে, মেজের নীচে, অথবা দরজার নিকটে আবর্জ্জনা বা ময়লা জল নিক্ষেপ করা উচিত নহে; কারণ তাহা হইলে ঐ সমুদয় স্থান অপরিষ্কার হয়, এবং তাহাতে মাছি ও রোগের জীবাণু শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

মাছি ও অন্যান্য পোকা হইতে খাদ্য দ্রব্য রক্ষা করিবার জন্য তারের জাল দেওয়া বাক্সের বা আল্মারীর বন্দোবস্ত করা ভাল (নিম্নস্থিত চিত্র দেখুন)। ইন্দুর, মাছি, পিপীলিকা, আরসুলা (তেলাপোকা), ও অন্যান্য কীট পতঙ্গ, অতিশয় অপরিষ্কার। উহাদের পায়ে ও দেহে সকল প্রকার দূষিত ও বিষাক্ত পদার্থ জড়িত থাকে, আর খাদ্যে উড়িয়া পড়িলে, ঐ সমুদয় লাগিয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায়, ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি বিষ্ঠা হইতে উড়িয়া আসিয়া, রান্নাঘরের খাদ্যদ্রব্যের উপরে বসে। এই জন্য, খাদ্য দ্রব্য এরূপ স্থানে রাখিতে হইবে, যে স্থানে মাছি বা ইন্দুর উহা স্পর্শ করিতে না পারে। রাঁধুনীর সকল সময়ে পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরিতে হইবে।
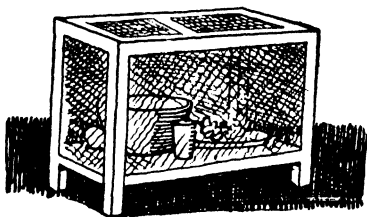
এইরূপ জাল দেওয়া বাক্সে খাদ্য রক্ষা করুন

চাউল এবং শাকসব্জি, নির্ম্মল জলে খুব ভাল করিয়া ধুইতে হইবে। ঐ সমস্ত কখনও পুষ্করিণীর, বা নদীর দূষিত জলে, ধৌত করা উচিত নহে।

থালাবাসন ধুইবার, ও মুছিবার জন্য ব্যবহৃত কাপড়, প্রতিদিন ধৌত ও পরিবর্ত্তিত করা, ও কয়েক মিনিটের জন্য ঐগুলি সিদ্ধ করিয়া লওয়া, এবং মাছি বসিতে না পারে এরূপ স্থানে, ঝুলাইয়া দেওয়া উচিত। থালা, ও অন্যান্য পান ভোজনের পাত্রাদি ধুইয়া, তাহার উপরে ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিতে হইবে। তারপর একখানি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মুছিয়া, শুষ্ক করিতে হইবে।

খাদ্য রন্ধন করা হইলে পর, সেই দিনই উহা খাওয়া উচিত; কারণ গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ পক্ক খাদ্যই অল্পকাল মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়। বাসী, বা নষ্ট খাদ্য, কখনও খাওয়া উচিত নহে। খাদ্যের মধ্যে জীবাণু জন্মিয়াই খাদ্যের বিকৃতি ঘটাইয়া থাকে। ঐ সকল জীবাণু বিষ উৎপন্ন করে; উক্ত বিষাক্ত খাদ্য ভোজন করিবার ফলে, উদরাময় ও অন্যান্য আন্ত্রিক ব্যাধি জন্মে। আর

একটা কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে খাদ্য বিকৃত-স্বাদ ও দুর্গন্ধ না হইলেও নষ্ট হইতে পারে।

আহার

আমাদের খাইবার ঘরটী বেশ পরিষ্কার রাখিতে হইবে। খাইবার স্থান, এবং থালা বাসন, অতিশয় পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। মাতাপিতা, সন্তানগণের সহিত একস্থানে বসিয়া, প্রফুল্ল মনে আহার করিবেন; কারণ, মনে আনন্দ, ও স্ফূর্ত্তি থাকিলে, খাদ্য সুস্বাদু বোধ হয়, এবং সহজে হজম হয়। ধীরে ধীরে আহার করা ও খাদ্যদ্রব্য ভালরূপে চর্ব্বণ করা কর্ত্তব্য। দৈনিক দুইবার হউক, কি তিনবার হউক, খাইবার সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। রাত্রিতে, লঘুপাক খাদ্য অল্প পরিমাণে ভোজন করা কর্ত্তব্য; এবং সাধারণতঃ রাত্র সাতটার পূর্ব্বে সান্ধ্য-ভোজন শেষ করা উচিত। অধিক রাত্রিতে খাইলে অন্নবহা নাড়ীতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, কারণ রাত্রিকালে দেহের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় পরিপাক যন্ত্রাদিরও বিশ্রামের প্রয়োজন। এদেশে সাধারণতঃ, অধিক রাত্রিতে প্রচুর ভোজনের নিমিত্ত, এবং উহার অব্যবহিত কাল পরেই শয্যাগ্রহণ করিবার ফলে, অজীর্ণ ও পরিপাক যন্ত্রাদির নানাপ্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে।

একবার নিয়মিত আহারের পর, অন্যবার আহারের মধ্যে, অন্য কিছু ভোজন করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। পরিপাক যন্ত্রের কিছুকাল বিশ্রামের প্রয়োজন। নির্দ্দিষ্ট ভোজনকাল ব্যতীত, শিশুগণকে মিষ্ট খাদ্য খাইতে দিবার ফলে, তলপেটে বেদনা, উদরাময়, ও কৃমি হইয়া থাকে। সাত বৎসরের অধিক বয়স, যে কোন বালকবালিকার পক্ষে, দৈনিক তিনবার আহার করাই যথেষ্ট।

একবার আহারের কালে, বহু প্রকার খাদ্য আহার করিলে, পরিপাক যন্ত্রাদির বিশেষ অনিষ্ট হয়। কোন কোন খাদ্যদ্রব্য, উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করা হইলে, বেশ রুচিকর, ও সহজে পরিপাক হয়; এবং ঐ সমুদয় খাদ্যই, অনুপযুক্ত-রূপে রন্ধন এবং অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিলে, পরিপাক ক্রিয়া সহজে সম্পাদিত হয় না।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

নিরামিষ-ভোজন

জগৎ সৃষ্টির পরে ঈশ্বর তদীয় সৃষ্ট মানবের আহারার্থে শুধু ওষধি ও যাবতীয় সজীব ফল নিরুপণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। "ঈশ্বর আরও কহিলেন, দেখ, আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় বীজোৎপাদক ওষধি ও যাবতীয় সজীব ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে।" বহুবৎসর যাবৎ জগৎ অভিশপ্ত হইলেও শরীর রক্ষার্থ সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার্য্য তথায় দুর্লভ নহে। কিন্তু তথাপি যে সমুদয় খাদ্যে যথেষ্ট পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ পাওয়া যায় তাহা নির্ব্বাচনের নিমিত্ত বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন এবং মনোযোগ প্রদান করা আবশ্যক।

বিজ্ঞ লোকেরা খাদ্যহিসাবে দুগ্ধ ও নিরামিষ আহার্য্য (দুগ্ধ, দুগ্ধজাত ও যাবতীয় ওষধি) মনুষ্যের পক্ষে বর্ত্তমানকালোপযোগী আদর্শ খাদ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু উদ্ভিজ্জ খাদ্য গ্রহণে যে পরিমাণ অসুবিধা আমাদের ভোগ করিতে হয়, দুগ্ধজাত খাদ্য গ্রহণে তত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। দুগ্ধ একটী শরীর রক্ষণোপযোগী খাদ্য; ইহাতে লবণ ও ভাইটামিন্ জাতীয় পদার্থ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রোটিন (Protein), তৈলময় এবং শ্বেতসার ও শর্করা (Carbohydrate) জাতীয় উপাদান ও ইহাতে আছে। নিরামিষ-ভোজীদের মধ্যে অনেকেই দুগ্ধ পান এবং ওষধি ভক্ষণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে বহুস্থানে দুগ্ধের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, যেমন সেই প্রতিশ্রুত দেশের বর্ণনা উপলক্ষ্যে উহাকে "দুগ্ধমধু প্রবাহী 'দেশ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, মাংস আদর্শ খাদ্য নহে। কিন্তু উদ্ভিজ্জ খাদ্য গ্রহণই যে অধিকতর বাঞ্ছনীয় ইহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ওষধি-জাত খাদ্যকে প্রথম শ্রেণীর এবং মাংস জাতীয় খাদ্যকে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্য বলা যাইতে পারে, কারণ ইহা জীবজন্তুর মাংস-তন্তুর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে।

প্রোটিন জাতীয় পদার্থ (Protein Standards)

কেহ কেহ মনে করেন প্রোটিন গ্রহণের উপরেই নিরামিষ আহারের সমস্যা নির্ভর করে; কিন্তু একথা স্বীকার্য্য যে, দুগ্ধ এবং অন্যান্য খাদ্য গ্রহণেই সেই সমস্যার সমাধান হয়। কারণ মিশ্রখাদ্য—অর্থাৎ যে খাদ্যে আমিষ ও নিরামিষ উভয়বিধ খাদ্যের উপাদান রহিয়াছে,—তাহা একটী অধিক মাত্রা

প্রোটিন সংযুক্ত খাদ্য। মাংসের ভিতরে প্রোটিন সর্ব্বোচ্চ মাত্রায় বিদ্যমান থাকিলেও খাদ্যের অন্যান্য উপাদান ইহাতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ ক্যালরিক পদার্থ (Calories) ভক্ষণ করিলে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ গ্রহণ করা হইত, কাজেই তৎকালে এইরূপ আহার্য্য অধিকতর উপযোগী ছিল; কিন্তু ডাঃ চিটেনডেন্ (Chittenden) পরে এই বিষয়টী অতি যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নিম্নমাত্রা প্রোটিন শরীর পোষণার্থে অধিকতর উপকারী। তিনি বলেন, যে, শতকরা ১০ ভাগ ক্যালরিক (Calories) পদার্থে প্রোটিন উৎপন্ন হয়, এবং শুধু শাকসব্জি ভক্ষণ করিলেই উক্ত মাত্রায় প্রোটিন গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমিষ ভক্ষণ করিলে ঐ মাত্রা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। কারণ পরিমিত মাংস ভোজন করিলেও অধিক মাত্রায় প্রোটিন আমাদের শরীরে প্রবিষ্ট হয়।

সহিষ্ণুতা পরীক্ষা

"নিম্নমাত্রা প্রোটিন ভক্ষণ করিয়া কি মানুষ কঠিন কার্য্য করিবার নিমিত্ত শক্তি ও সহিষ্ণুতা লাভ করিতে পারে?" অনেকের মনে হয়তো এই প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে, আবার এই চিন্তাও হইতে পারে যে, উদ্ভিজ্জ পদার্থের খাদ্য উপাদান কি শরীর কার্য্যক্ষম রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে? বিগত কতিপয় বৎসর বহু পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, অল্প পরিমাণ প্রোটিনের শক্তিতে প্রকৃত পক্ষে কোন ব্যক্তি তাহার কার্য্য করিতে সমর্থ কিনা, এবং তাহাতে এই দেখা গিয়াছে যে, নিরামিষ ভোজনেই মানুষ শক্তি ও সহিষ্ণুতা লাভ করিতে পারে। ইহার মধ্যে আয়ারভিং ফিসার (Irving Fisher) ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক, যে পরীক্ষাগুলি করিয়াছেন, তাহাই অখণ্ডনীয় বলা যাইতে পারে। অধ্যাপক ফিসার এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির পরীক্ষা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। সহিষ্ণুতা সম্পর্কে পরীক্ষা করিতে গিয়া আমরা পরিশেষে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, মাংসাশী লোকেরা যে কার্য্য করিতে পারেন, নিরামিষাশী লোকেরা তদপেক্ষাও অনেক বেশী কাজ করিতে সমর্থ। অধ্যাপক ফিসার বলেন, মাংস এবং অধিক পরিমাণ প্রোটিন পদার্থ সহ্য শক্তির বৃদ্ধি না করিয়া বরং এল্‌কোহলের (Alcohol) ন্যায় সহ্য শক্তির হ্রাস করিয়া থাকে। এই সমস্ত পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা অল্প পরিমাণ আমিষ খাদ্য খান তাহাদের মাংস-তন্তুর মধ্যে যবক্ষার-বাষ্পাত্মক পরিত্যক্ত পদার্থ অল্প পরিমাণে সঞ্চিত হয়, কারণ দেহে অল্প পরিমাণ প্রোটিন সঞ্চিত থাকে, কিন্তু যাহারা অধিক আমিষ-খাদ্য ভোজন করেন, তাহাদের শরীরে পরিত্যক্ত

পদার্থ অধিক পরিমাণে পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে, যেহেতু যে মাংস তাহারা ভক্ষণ করেন সেই মাংসের মধ্যে দূষিত পদার্থ পূর্ব্বেই সঞ্চিত থাকে।

মাংস উত্তেজক খাদ্য

আমিষ জাতীয় খাদ্যে কতিপয় রাসায়নিক পদার্থ সংমিশ্রিত আছে বলিয়া উহা ভক্ষণে শরীর উত্তেজিত হয়। সুতরাং ইহা মনুষ্যের কদাপি সাধারণ ব্যবহার্য্য খাদ্য হওয়া উচিত নয়। কাফির মধ্যে যেমন কাফিন্ (Caffein) নামক এক প্রকার পদার্থ আছে তদ্রূপ আমিষ জাতীয় খাদ্যের মধ্যেও এক প্রকার উত্তেজক পদার্থ আছে। কিন্তু উহা কাফিনের (Caffein) ন্যায় তত বিষাক্ত নহে, সুতরাং উহার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার তুলনা হইতে পারে না। উদ্ভিজ্জ খাদ্যে এইরূপ বিশেষ কোন উত্তেজক মূল পদার্থ নাই, এতদ্ব্যতীত উহার মূল উপাদানসমূহ মাংস-তন্তুর ক্রিয়াতেই বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমিষ জাতীয় খাদ্যে এই সমস্ত উত্তেজক পদার্থ আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, এই আহার্য্য মনুষ্যকে অধিক কার্য্য করিতে প্রণোদিত করে। নিম্নমাত্রা প্রোটিনে যত শক্তি সঞ্চয় হয়, অধিকমাত্রা প্রোটিনে সম্ভবতঃ তত শক্তি সঞ্চয় হয় না। কারণ প্রোটিন জাতীয় পদার্থ যত সহজে হজম হয়, তৈলময় পদার্থ (Fats) এবং শ্বেতসার ও শর্করা (Carbohydrates) জাতীয় পদার্থ তত সহজে হজম হয় না।

মাংস অম্ল-উৎপাদক খাদ্য

খাদ্য দ্রব্য দাহ করিবার পর তাহার ভস্মের প্রকৃতি দেখিয়া খাদ্যের শ্রেণী বিভাগ করা যায়। এই পরীক্ষায় আরও প্রমাণিত হয় যে, মাংসে ক্ষার জাতীয় পদার্থ অপেক্ষা অম্ল-উৎপাদক উপাদান বেশী পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে সুতরাং আমরা যখন মাংস ভক্ষণ করি তখন শরীরে অম্ল-উৎপাদক পদার্থ অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয়। তন্নিমিত্ত ইহা উপাদেয় খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ লোকই যখন প্রচুর পরিমাণে আমিষ খাদ্য ভক্ষণ করেন, তখন অধিক পরিমাণে অম্ল-উৎপাদক উপাদান গ্রহণের হস্ত হইতে তাহারা অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না। এই অম্ল-উৎপাদক উপাদান সমূহ অতিরিক্ত পরিমাণে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে। যব, গম শস্যাদিও কিছু পরিমাণ অম্ল উৎপন্ন করে, কিন্তু মাংসের ন্যায় তত অধিক পরিমাণে নহে। নিরামিষ আহার্য্যে ক্ষার জাতীয় পদার্থ থাকাতে অম্ল উৎপন্ন হইতে পারে না।

মাংস পচনশীল খাদ্য

পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মাংস ভক্ষণ করিলে আন্ত্রিক-দ্বারে ব্যাক্টেরিয়া (Bacteria) নামক এক প্রকার জীবাণু উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই প্রকার জীবাণু অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইলে শরীরের পক্ষে বিশেষ হানিকর হইয়া দাঁড়ায়। অপর পক্ষে শাকসব্জি জাতীয় খাদ্যে এইরূপ জীবাণু উৎপন্ন করিতে বেশী সহায়তা করে না। ফল কথা, ইহা দেখা গিয়াছে যে, সাধারণতঃ শাকসব্জি জাত খাদ্যে এই হানিকর জীবাণু বৃদ্ধি করে না, কিন্তু মাংসে সাধারণতঃ অসংখ্য জীবাণু বিদ্যমান থাকে বলিয়া পাকস্থলীতে অতি ক্ষিপ্রগতিতে পচন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সুতরাং ইহাতে অতি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আমিষ খাদ্যে যে অধিক মাত্রা প্রোটিন (Protein) পদার্থ থাকে তাহা অনিষ্টকর ব্যাক্টেরিয়া (Bacteria) নামক জীবাণু বৃদ্ধির সহায়তা করে। এই জীবাণুগুলি আবার কোমল মাংস-তন্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরীরে বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে। আবার একথা স্বীকার্য্য যে, উদ্ভিজ্জ খাদ্য অপেক্ষা প্রাণীজাত প্রোটিনে ব্যাক্টেরিয়ার ক্রিয়া (Bacterial activity) কেবল শরীরের ভিতর নয়, কিন্তু বাহিরেও যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে উদ্ভিজ্জ খাদ্য অপেক্ষা আমিষ খাদ্যে অনেক ক্ষেত্রে টমেইন্ বিষ ক্রিয়ার দ্বারা (Ptomaine poisoning) রোগোৎপন্ন হইয়া থাকে।

জীবজন্তুর মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব

উদ্ভিজ্জ পদার্থ অপেক্ষা মাংস যে মনুষ্যের পক্ষে অধিকতর অভিপ্রেত খাদ্য নহে তাহার অপর একটী কারণ এই যে, জীবমাত্রই নানা রোগে আক্রান্ত হয়। সুতরাং মাংস ভোজন করিলে ঐ সমস্ত রোগ মানব শরীরে অতি সহজেই প্রবিষ্ট হইতে পারে। এই দেশে অন্ততঃ, গোমাংস সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য, কারণ যে ভারবাহী জন্তুর সাহায্যে লোকেরা নানাবিধ কার্য্য সম্পন্ন করেন তাহাই আবার খাদ্যের নিমিত্ত হত্যা করেন। অনেকে বলেন, রন্ধন করিলে মাংসের অন্তর্গত ব্যাক্টেরিয়া (Bacteria) মরিয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কথা যথার্থ নহে, কারণ অনেক পাচক মাংস উত্তমরূপে রন্ধন করে না, এবং যদি বা করে, তথাপি মাংসের বহির্ভাগটী যত উত্তপ্ত হয়, আভ্যন্তরীণ অংশটী তত উত্তপ্ত হয় না বলিয়া ব্যাক্টেরিয়া (Bacteria) মরে না, তজ্জন্য রোগাক্রান্ত জীবের মাংস কোন মতেই আহার করা উচিত নহে। কারণ উহার মাংসতন্তুর মধ্যে এমন বিষাক্ত পদার্থ রহিয়াছে যাহা উত্তাপেও নষ্ট হয় না। যে সকল ফিতা-

ক্রিমি (Tapeworm) এবং সূক্ষ্মক্রিমি (Trichina) নামক পরাঙ্গপুষ্ট কীটের দ্বারা প্রাণীসমূহ আক্রান্ত হয়, মাংস উত্তমরূপে রন্ধন না করিয়া ভক্ষণ করিলে সেগুলি অতি সত্বর মানব দেহে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

অধিকমাত্রা প্রোটিন হানিকর রোগের কারণ

বিগত কতিপয় বৎসর যাবৎ অতি ক্ষিপ্রগতিতে যাপ্যরোগ বা হানিকর রোগ (Chronic disease) বৃদ্ধি পাইতেছে। মূত্রাশয়, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড এবং মস্তিষ্ক প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্রে যে সকল ক্ষুদ্র গহ্বর রহিয়াছে, সেই সমুদয়ের হানিকর পরিবর্ত্তনই ঐ সকল রোগের লক্ষণ। প্রৌঢ়দিগের পক্ষে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন ভোজন অধিকতর অনিষ্টকর।

অধিক মাত্রায় প্রোটিনে, বিশেষতঃ মাংস ভোজন করিলে, হৃৎপিণ্ড, মূত্রাশয়, মৃগীরোগ এবং এতাদৃশ অন্যান্য রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মাংস ভোজনের আর একটী কুফল এই যে, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইলেও মল তত বেশী হয় না, কিন্তু শাকসব্জি ভোজনে অধিক মল উৎপন্ন হয়, এবং অন্ত্রে বাহ্যের বেগ সৃষ্টি করে। অন্য কথায়, উদ্ভিজ্জ পদার্থে আন্ত্রিক দ্বারে প্রচুর মল সরবরাহ করে এবং মলত্যাগের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে।

মাংস কি একটী প্রয়োজনীয় খাদ্য ?

এই অধ্যায়ের প্রথমেই যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদনুযায়ী বিবেচনা পূর্ব্বক নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করিলে, শরীর রক্ষণোপযোগী যাবতীয় পুষ্টিকর পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ খাদ্যে ও দুগ্ধে শরীর রক্ষণোপযোগী উপাদান সমূহ পরিমিত মাত্রায় রহিয়াছে। এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরিশ্রমে শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেও ক্ষয় পূরণের আবশ্যক উপকরণ সমূহ ইহাতে যোগাইয়া থাকে। এইরূপ সমস্ত প্রমাণ গ্রহণ করিলে ইহাই প্রতীয়মাণ হয় যে, নিরামিষ-ভোজীর পক্ষে দুগ্ধপান এবং দুগ্ধজাত পদার্থ ভোজন একান্ত আবশ্যক।

বিগত ১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই, লণ্ডনে দি ইণ্টার এলিড্ ফুড্ কমিশন রিপোর্টে (The Inter Allied Food Commission Report, London) প্রকাশ :—

"শরীর-রক্ষণের নিমিত্ত মাংস ভোজনের কোনই আবশ্যকতা নাই। কেননা মাংসে যেরূপ শাকসব্জিতে এবং প্রাণীজ খাদ্যে, যেমন দুগ্ধ, প্রাণীর ডিম প্রভৃতিতেও তেমনি শরীর রক্ষণোপযোগী অন্য আর এক প্রকার প্রোটিন আছে, সুতরাং অতি অল্প মাত্রায় ও মাংস ভোজন বিধেয় নহে।"

৭ম অধ্যায়

শ্বাসক্রিয়া এবং শ্বাস-যন্ত্রাদি

মানুষ আহার ব্যতীত কয়েক সপ্তাহ, এবং পানীয় ব্যতীত কয়েক দিন, বাঁচিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু বায়ুর ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলে,—যেমন জলে ডুবিলে, বা দম আট্‌কাইলে,—কয়েক মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, অনবরত বায়ু গ্রহণ শরীরের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয়। বায়ু ব্যতীত আগুন জলে না। টেবিলের উপরে একটী মোমবাতি জ্বালাইয়া, যদি উহা একটী বৃহৎ-মুখ শূন্য বোতল দ্বারা ঢাকিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে উহা শীঘ্রই নিভিয়া যাইবে। আগুন জ্বালিয়া রাখিবার পক্ষে বায়ু যেরূপ আবশ্যক, জীবন ধারণের পক্ষেও বায়ু সেইরূপ।
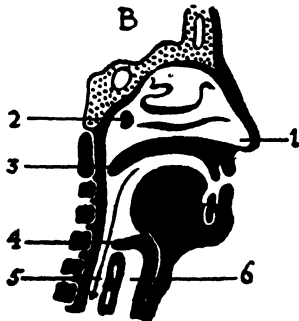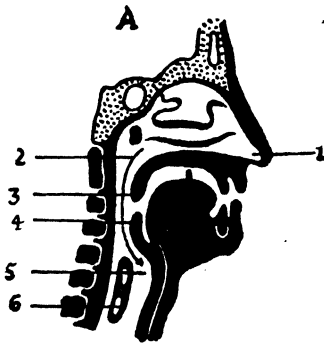
বায়ুমণ্ডল হইতে অম্লজান (Oxygen) বাষ্পগ্রহণ করিবার জন্য, আমরা ফুস্‌ফুসের মধ্যে শ্বাস-গ্রহণ করিয়া থাকি। অম্লজান অদৃশ্য একটী বাষ্প বিশেষ। শ্বাস-গ্রহণ করিবার সময়, আমাদের রক্তে অম্লজান প্রবেশ করে, এবং পরে উহা সমুদয় অঙ্গে চালিত হইয়া থাকে। জীবন ধারণের নিমিত্ত, এবং দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদনের জন্য বায়ুর এই অম্লজান অংশের বিশেষ প্রয়োজন। ফুস্‌ফুসে আমরা যে বায়ু গ্রহণ করি, তাহাতে প্রচুর পরিমাণ অম্লজান থাকে, কিন্তু প্রশ্বাসের সহিত আমরা

A. এই চিত্রে নিশ্বাস লইবার সময় বায়ু যাতায়াতের পথ দেখান হইয়াছে।
1. নাসারন্ধ্র 2. তীর চিহ্ন দ্বারা বায়ুর পথ দেখান হইয়াছে 3. আল্‌জিব 4. শ্বাসনালীতে বায়ু প্রবেশের জন্য উত্থিত উপজিহ্বা 5. শ্বাসনালী, যাহার মধ্য দিয়া ফুস্‌ফুসে বায়ু যায় 6. ডুপাখি।

B. এই চিত্রে আহারের সময় উল্লিখিত যন্ত্রচয়ের অবস্থান দেখান হইয়াছে।
1. নাসারন্ধ্র 2. নাসিকা ও কর্ণ সংলগ্ন নল 3. আল্‌জিব খাদ্য নিম্নদিকে দিতেছে 4. উপজিহ্বা শ্বাসনালীর পথ রোধ করিয়া আছে 5. তীর দ্বারা অন্ননালী দেখান হইতেছে 6. শ্বাসনালী।

যে বায়ু ত্যাগ করি, তাহাতে অম্লজানের মাত্রা অতিশয় কম, এবং উহা পুনরায় গ্রহণ করিবার পক্ষে, অনুপযুক্ত।

প্রশ্বাসের সহিত যে বায়ু ফুস্‌ফুস্‌ হইতে নির্গত হয়, তাহাতে শুধু যে অম্লজানের পরিমাণ অল্প, এরূপ নহে; রক্ত হইতে যে বিষাক্ত পদার্থ বাহির হয়, তাহাও উহাতে বিদ্যমান থাকে। এই বিষাক্ত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়; একটী রুদ্ধ কক্ষে কিছুকালের জন্য বহু লোক
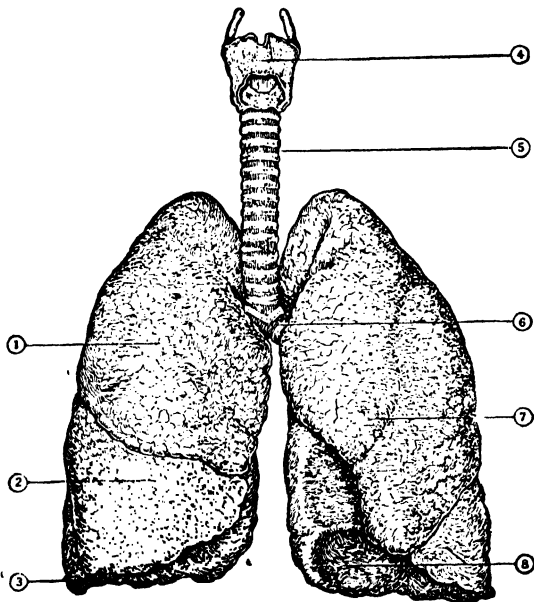
1. দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্, ফুস্‌ফুসের উর্দ্ধাংশ 2. ফুসফুসের মধ্যাংশ 3. ফুস্‌ফুসের নিম্নাংশ 4. শ্বাসনালীর উপাস্থিসমূহ 5. শ্বাসনালী 6. ফুসফুসে প্রবিষ্ট শ্বাসনালীর বামাংশ 7. বাম ফুস্‌ফুস, ফুস্‌ফুসের উর্দ্ধাংশ 8. ফুস্‌ফুসের নিম্নাংশ

একত্র থাকিলে পর, বাহির হইতে কোন লোক উক্ত কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্রই, বায়ুতে একটা দুর্গন্ধ অনুভব করিবেন। ঐ কক্ষ মধ্যস্থ অনেকেরই মাথাধরা, ও মাথাঘুরা, আরম্ভ হইবে। ফুস্‌ফুস্‌ হইতে নির্গত বিষাক্ত বায়ুর নিমিত্তই দুর্গন্ধ, মাথাধরা, মাথাঘুরা প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে।

কেহ যদি একটী ফাঁদাল মুখ পরিষ্কার বোতলের মধ্যে, কয়েকবার প্রশ্বাস ফেলিয়া, তৎক্ষণাৎ শক্ত করিয়া উহার ছিপি বন্ধ করেন এবং কয়েক দিন কোন গরম স্থানে রাখিয়া দেন, তাহা হইলে উহার ছিপি খুলিলেই দেখা যাইবে যে,

ইহার ভিতরের বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে। ফুস্‌ফুস্ হইতে যে সমুদয় বিষ অনবরত প্রশ্বাসের সহিত বাহির হয়, উহাই এই দুর্গন্ধের কারণ। দূষিত বায়ু বাহির করিয়া দিবার, এবং নির্ম্মল বায়ু ভিতরে আনিবার নিমিত্ত, যাহারা জানালা না খুলিয়া শয়ন করেন, তাহারা শ্বাসের সহিত পুনঃ পুনঃ দূষিত বায়ু গ্রহণ করিয়া শরীরের অনিষ্ট-সাধন করেন। এই সকল লোকের সহজেই সর্দ্দি হয়, এবং তাহারা সহজেই নিউমোনিয়া, ক্ষয়কাশ, প্রভৃতি ফুস্‌ফুসের ব্যাধিসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন।

গৃহের প্রতিকক্ষে একটী বা একাধিক জানালা রাখা কর্ত্তব্য। জানালা গুলি এরূপ উচ্চ, ও প্রশস্ত করিতে হইবে, যাহাতে কক্ষে প্রচুর পরিমাণ সূর্য্য-কিরণ ও নির্ম্মল বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। কাপড় চোপড় বা পর্দ্দা একেবারে জানালার সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে; কারণ তাহা হইলে বায়ু ও আলোক উপযুক্তরূপে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

শ্বাস-যন্ত্রাদি

নিশ্বাসের সহিত আমরা যে বায়ু গ্রহণ করি, তাহা নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়া ভিতরে এবং পরে গলনালীর মধ্য দিয়া পশ্চাদ্ভাগে যায়। গলনালীর (Pharynx) নিম্নভাগ দিয়া উহা শ্বাসনালীতে (Trachea) প্রবেশ করে। এই শ্বাসনালী একটী শক্ত নলের মত, এবং গলদেশের সম্মুখভাগে উহা বেশ অনুভব করিতে পারা যায়। উক্ত শ্বাসনালী বক্ষোমধ্যে অবতরণ করিয়া, দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উহার এক শাখা দক্ষিণ ফুস্‌ফুসে এবং অপরটী বাম ফুস্‌ফুসে পৌঁছিয়াছে। ফুস্‌ফুস্‌দ্বয় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুকোষে নির্ম্মিত, (৪৬ পৃষ্ঠায় চিত্র দেখুন) নিশ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা আমরা এই কোষগুলি পর্য্যায়ক্রমে বায়ুপূর্ণ ও বায়ুশূন্য করিয়া থাকি।

শ্বাসগ্রহণ

সাধারাণতঃ আমরা মিনিটে ষোল হইতে আঠার বার শ্বাসগ্রহণ করিয়া থাকি। একবার শ্বাসগ্রহণের মধ্যে চারিবার হৃদয়ের স্পন্দন হইয়া থাকে। ব্যায়ামে ও জ্বরে শ্বাসের মাত্রা বাড়িতে থাকে।

প্রাণী হউক, বা উদ্ভিদ্ হউক, সকল জীবিত বস্তুই নিশ্বাস গ্রহণ করে। বৃক্ষগুলি পাতার সাহায্যে শ্বাসগ্রহণ করিয়া থাকে। ভেক্, এবং কোন কোন কৃমি জাতীয় পোকা চর্ম্মের সাহায্যে নিশ্বাস লয়। মৎস্যের ফুল্‌কোর মধ্যে যে জল চালিত হয়, তাহা হইতে উহারা শ্বাস লয়। বাইবেলের আদিপুস্তকের, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত মানুষের সৃষ্টি বিবরণে লিখিত হইয়াছে যে, "সদাপ্রভু ঈশ্বর

মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে (অর্থাৎ মনুষ্যকে) নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণ বায়ু প্রবেশ করাইলেন, তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল।" বাইবেলে আরও লিখিত আছে যে ঈশ্বরই "সকলকে জীবন ও শ্বাস" দিয়াছেন, এবং "তাঁহারই হস্তে সমস্ত জীবের প্রাণ" রহিয়াছে। স্বর্গস্থ, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর যে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়মিত করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, যখন আমরা নিদ্রিত থাকি, তখনও ফুস্‌ফুস্ বিশুদ্ধ বায়ুগ্রহণ ও বিশুদ্ধ বায়ু পরিহার করিতে থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় আমরা সম্পূর্ণ অচৈতন্য থাকি; যদি আমাদিগকে আমাদের শ্বাসক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করিতে হইত, তাহা হইলে নিদ্রিত হইতে না হইতেই আমরা প্রাণত্যাগ করিতাম। শ্বাস-ক্রিয়া ও হৃদয়ের স্পন্দন, এই উভয় কার্য্যকে "স্বাভাবিক ক্রিয়া" বলা হয়। উহারা স্নায়ুমণ্ডলের এক অংশ দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক, বা স্বয়ং সিদ্ধ কার্য্য ইহা বলিলেই, ঐ সম্বন্ধে প্রশ্নের মীমাংসা হয় না; কারণ ইহা হইতে কিরূপে স্নায়ুমণ্ডলের কোন এক অংশ দ্বারা হৃদয় নিয়মিত ও স্পন্দিত হইতে থাকে এবং কিরূপেই বা ঐ সকল কার্য্য প্রথমে আরম্ভ হইয়াছিল, এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। হৃদয়ের স্পন্দন ও নিশ্বাসপ্রশ্বাসের উপযোগিতার, এবং কি ভাবে প্রথমে উহা উৎপন্ন, ও চালিত হইল, এই সকল বিষয় বিশেষ-রূপে অনুসন্ধান করিলে, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যে শ্বাসক্রিয়ার বলে দেহে প্রাণ বিরাজ করে, মানব শক্তির বহির্ভূত অপর কোন শক্তি, অথবা মানব শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন শক্তি দ্বারা, সেই প্রাণবায়ু নিয়মিত হইতেছে। সেই শক্তি স্বয়ং ঈশ্বরের। যিনি আমাদের জীবনের প্রতি এরূপ স্নেহপূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, সেই পরমেশ্বর সত্য সত্যই আমাদের অকপট শ্রদ্ধার পাত্র।

সোজাভাবে বসা ও দাঁড়ান

প্রতিবার শ্বাসগ্রহণের সময়ে, ফুস্‌ফুস্ যেন প্রসারিত হইবার উপযুক্ত স্থান পায়, তজ্জন্য আমাদের সোজাভাবে বসা ও দাঁড়ান বিশেষ আবশ্যক। তাহা হইলে, শরীরে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে। সোজা-ভাবে বসিলে, ও দাঁড়াইলে, কেবল যে মানুষের চেহারা ভাল দেখায় তাহা নহে, দেহ দৃঢ় ও শক্তি সম্পন্ন করিবার পক্ষেও উহা অনুকূল। পিঠ কুঁজো করিয়া বসিলে বা দাঁড়াইলে, দেখিতেও বিশ্রী দেখায়, এবং ফুস্‌ফুসের পূর্ণ প্রসারও অসম্ভব হয়; এইরূপ করিলে শরীরে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধবায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, ফলে শরীর দুর্ব্বল হয়, এবং সহজেই সর্দ্দি ও ক্ষয়রোগ হইতে পারে।

যাহারা গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া কার্য্য করেন, অথবা যাহাদের বসিয়া বসিয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহারা দিনের মধ্যে কখন কখন ঠিক সোজা হইয়া

দাঁড়াইয়া, কয়েকবার গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিবার নিয়মিত অভ্যাস করিবেন, ইহাতে ফুসফুসদ্বয় হইতে বিষাক্ত অঙ্গারাম্ল (Carbon dioxide) সম্পূর্ণরূপে বাহির হইয়া যাইবে, এবং বিশুদ্ধ বায়ু দ্বারা উহা পরিপূর্ণ হইবে ; প্রশ্বাসের সহিত পরিত্যাক্ত দূষিত গ্যাসের মধ্যে অঙ্গারাম্ল একটা। কাঠের জলন্ত কয়লা হইতে যে দূষিত গ্যাস বাহির হয়, তাহাতে প্রায়ই মাথা ধরে ও মাথা ঘুরে। এই গ্যাসে অঙ্গারায়ের ভাগই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এই ভাবে বসা উচিত

এই ভাবে বসা উচিত নহে

মুখদ্বারা শ্বাসগ্রহণ

শ্বাসগ্রহণের নিমিত্ত নাসারন্ধ্র, এবং খাদ্য গ্রহণের নিমিত্ত মুখ-গহ্বরই, স্বাভাবিক পথ। নাসারন্ধ্রের মধ্যে বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম রহিয়াছে, উহারা বায়ুর সহিত প্রবাহিত ধূলিকণা ও রোগের জীবাণু নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে দেয় না। নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বায়ু উষ্ণ ও ঈষৎ আর্দ্র হইয়া থাকে। মুখের মধ্য দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিলে বায়ু গলনালীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে উষ্ণ ও আর্দ্র হইতে পারে না ; কাজেই গলনালী শুষ্ক হইয়া যায়, এবং উহাতে অতিরিক্ত পরিমাণে শ্লেষ্মা জন্মে ; ফলে সর্দ্দি ও কাশির সৃষ্টি হয়। নাসারন্ধ্র শ্বাসক্রিয়ায় ব্যবহৃত না হইলে উহা বন্ধ হইয়া যায়, এবং এ্যাডিনয়েড (Adenoids) নামক এক প্রকার ফুলকপির ফুলের মত দ্রব্য ৩৬শ অধ্যায়ে একটা চিত্রে দর্শিত স্থানে জন্মিতে থাকে। তালুগ্রন্থিগুলিও (Tonsils) স্ফীত ও রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মুখের মধ্য দিয়া

নিশ্বাস গ্রহণ, অতিশয় ক্ষতিকর, সুতরাং এরূপ অভ্যাস ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কোন শিশুকে মুখ দিয়া শ্বাসগ্রহণ করিতে দেখিলে, অবিলম্বে তাহার নাসিকা ও কণ্ঠ পরীক্ষা করিয়া এ্যাডিনয়েড্ থাকিলে তাহা দূর করিবার জন্ম চিকিৎসকের নিকটে লইয়া যাইতে হইবে; নতুবা শিশু কখনও সুস্থ কিংবা সবল হইতে পারিবে না। তাহার দেহ খর্ব্ব এবং বুদ্ধি শক্তি ক্ষীণ হইবে। (এই বিষয় ৩৮ অধ্যায়ে আরও বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে)।

বায়ুস্থ ধূলিকণা ফুস্ফুসের অনিষ্ট করে

বায়ুর মধ্যে যে সমস্ত ধূলিকণা উড়িতে দেখা যায়, এবং আমাদের গৃহের মেজেতে ও দ্রব্যাদির উপরে, যে সকল ধূলিকণা জমিয়া থাকে, সেগুলি কেবল মাটীর গুড়া নহে, তন্মধ্যে বহু রোগোৎপাদক জীবাণুও বর্ত্তমান থাকে। এই ধূলিকণা নিশ্বাসের সহিত ফুস্ফুসের মধ্যে গিয়া অবস্থান করে। রোগোৎপাদক জীবাণু বৃদ্ধি পাইয়া, ক্ষয়রোগ, নিউমোনিয়া, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ও ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে। ধূলিকণার উৎপাত ও উহা হইতে যে সকল বিপদ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, যখন বৃষ্টি না হইবে তখন রাস্তায় জল ছিটাইতে হইবে, এবং কেহই মেজেতে বা রাস্তায় থুথু ফেলিবেন না। কাশ বা ক্ষয়রোগের রোগীর গয়ের বা কাশি, রোগোৎপাদক জীবাণুতে পরিপূর্ণ। এই প্রকার কোন রোগী যদি রাস্তায় বা মেজেতে থুথু ফেলে, তাহা হইলে উহা শীঘ্রই শুকাইয়া ধূলিকণায় পরিণত হয়। অপর লোকে এই জীবাণু নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করায় তাহাদেরও কাশি এবং ক্ষয়রোগ হইয়া থাকে। রাস্তার ধারের নর্দ্দমায়, বা কিছু কাগজ লইয়া গিয়া তাহাতে থুথু ফেলা ভাল, এই কাগজ ফেলিয়া না দিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত;
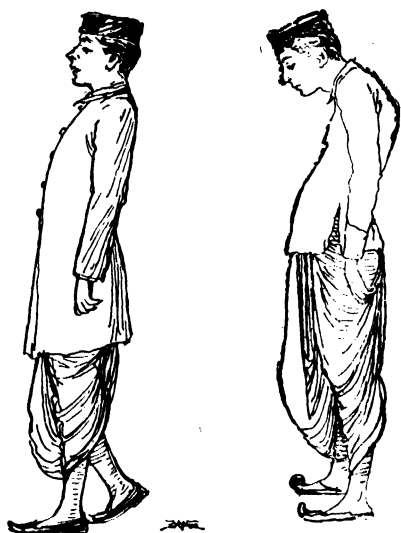
এই ভাবে দাঁড়ান উচিৎ এই ভাবে দাঁড়ান উচিত নহে

যাহাদের ক্ষয়রোগ হইয়াছে, তাহাদের সর্ব্বদাই কাগজে বা পুরাতন কাপড়ে থুথু ফেলিয়া, সেগুলি পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

ঘর ঝাঁট দিবার সময়, প্রথমে জল ছিটাইয়া লওয়া ভাল; ভিজা করাতের গুড়া বা তুষ ছড়াইয়া, সেগুলি সমেত ধূলি ঝাঁট দেওয়া আরও ভাল। ধূলি না উড়ে, এরূপ ভাবে ঝাঁটা চালাইতে হইবে।

সুরা ও তাম্রকূট শ্বাসযন্ত্রাদির অপকারী

পৃথিবীর সকল দেশের অধিবাসীরই দুইটী কু-অভ্যাস শ্বাসযন্ত্রাদির যারপর নাই অনিষ্ট-সাধন করিতেছে; একটি ধূমপান, অপরটী সুরাপান। তাম্রকূটে শ্বাস-যন্ত্রাদির প্রত্যেক অংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উহা নাসিকা, কণ্ঠ, শ্বাসনালী এবং ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়ের আবরণ ঝিল্লীতে প্রদাহ জন্মায় এবং কাশি উৎপন্ন করে। উহাতে ফুস্‌ফুসের আবরণ এরূপভাবে নষ্ট করিয়া দেয় যে, সহজেই ক্ষয়কাশ ও অন্যান্য ব্যাধির আক্রমণ হইবার খুব সম্ভাবনা থাকে।

তাম্রকূট সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সকল প্রকার সুরা সম্বন্ধেও তাহা সত্য। মদ্য পান করিবার কিছুকাল পরেই, মদ্যপায়ীর নিশ্বাসে সুরার গন্ধ বাহির হয়। ইহার কারণ এই যে, সুরা রক্তে প্রবেশ করিবামাত্র ফুস্‌ফুসে চালিত হয়, এবং ফুস্‌ফুস্‌ যত সত্বর সম্ভব এই বিষ-মুক্ত হইতে চেষ্টা করে। চিকিৎসকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, যাহারা মদ্য পান করেন, তাহারা সহজেই নিউমোনিয়া ও ক্ষয়কাশ দ্বারা আক্রান্ত হয়েন; অধিকন্তু, যাহারা মদ্য পান করেন না তাহাদের অপেক্ষা যাহারা মদ্য-পান করেন, তাহাদের ঐ সকল রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে, আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা কম। ইহা দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সুরা ফুস্‌ফুসের অপকার করিয়া থাকে।

মদ, ও তামাকের বিষ শুধু ফুস্‌ফুসের নহে, দেহের সমুদয় অঙ্গেরই অনিষ্ট-সাধন করে।

শ্বাসপ্রশ্বাস সম্বন্ধীয় কয়েকটী বিধি

১। আপনার গৃহে যেন দিনে ও রাত্রে সকল সময়েই প্রচুর মুক্ত বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে।

২। দিবসে যতদূর সম্ভব বাহিরে মুক্ত বায়ুতে থাকিবেন, এবং রাত্রি-কালে নির্ম্মল বায়ু সঞ্চালনের নিমিত্ত শয়ন কক্ষের জানালাগুলি উন্মুক্ত রাখিবেন। দিনের বায়ুতে ও রাত্রের বায়ুতে একই উপাদান রহিয়াছে, সুতরাং রাত্রির বায়ুকে ভয় করিয়া, জানালা, দরজা, রুদ্ধ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। রাত্রির বায়ুকে ভয় না করিয়া, বরং রোগের জীবাণু বহনকারী বিপজ্জনক মশক-

কুলবে ভয় করুন। বিছানায় মশারী ব্যবহার করিলেই, মশকের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

৩। প্রতিবার নিশ্বাস গ্রহণের সময়, আপনার ফুস্‌ফুস্‌ সম্পূর্ণ বায়ুপূর্ণ করুন। ইহা করিতে হইলে আপনাকে সোজাভাবে বসিতে, ও দাঁড়াইতে হইবে। বুক ফুলাইয়া, চিবুক প্রথমে উচু করিয়া পরে উহা গলার নিকটে টানিয়া, নিশ্বাস লইতে হইবে।

৪। ধূলিপূর্ণ বায়ু নিশ্বাসের সহিত টানিবেন না।

৫। কি হুঁকোয়, কি সিগার বা সিগারেটরূপে, কোন প্রকারেই তামাক সেবন করিবেন না।

৬। কোন প্রকার সুরা পান করিবেন না।

৭। সর্ব্বদা নাসারন্ধ্রের মধ্যদিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিবেন।

৮। কখনও কোমরে কসিয়া বেল্ট (কোমরবন্দ) বাঁধিবেন না, বা কাপড়ও কসিয়া পরিবেন না।

৯। প্রতিদিন কয়েকবার গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিবার অভ্যাস করিবেন।

১০। কখনও চাদর বা লেপ মুড়ি দিয়া অর্থাৎ নাক মুখ ঢাকিয়া শুইবেন না। যাহারা শয়ন কালে মুখ ঢাকিয়া শয়ন করেন, তাহারা ফুস্‌ফুস্‌ হইতে নির্গত বিষাক্ত বায়ু, পুনরায় ফুস্‌ফুসে টানিয়া লইয়া আপনাদিগের শরীর বিষাক্ত করিয়া ফেলেন। এইরূপ অভ্যাস বড়ই অনিষ্টকর।

বাসোপযোগী গৃহ

যেখানে বৃষ্টি হইলেই মাটির তলস্থ জমি জলে ডুবিয়া যায়, এরূপ নিম্ন জমিতে বাটী নির্ম্মাণ করা উচিত নহে। এই জলে মশকে ডিম পাড়ে এবং সেই বাড়ীর লোকের ম্যালেরিয়া হয়। জলে যাহা পড়ে তাহাই পচিয়া উঠে। বলিয়া, এরূপস্থানে বাস গৃহ কেবল যে, সেঁতসেঁতে ও শীতল হয় তাহা নহে, বড় দুর্গন্ধপূর্ণও হয়, এবং উহা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

বাড়ীতে বা বাড়ীর নীচে, মোরগ, শূকর, কুকুর, বা গৃহপালিত পশু রাখা উচিত নহে। উহাদের বিষ্ঠার দুর্গন্ধে বাড়ী পূর্ণ হয়, এবং উহাদের শরীরের মাছি এবং উঁকুণে গৃহের অধিবাসিবৃন্দের রোগ হইতে পারে। অধিকাংশ গৃহ-পালিত পশুর ক্ষয়রোগ আছে এবং ঐ সকল রুগ্ন প্রাণীর দ্বারা রোগাক্রান্ত হইয়া বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা মানুষের পক্ষে খুব বেশী। যদি একতলার মেজের তলায় ফাঁক থাকে, তথায় কোন প্রাণী থাকিতে দেওয়া, এবং শস্যাদি, বা ঘাস রাখা উচিত নহে। যাহাতে বাতাস বহিতে পারে, এবং ইঁদুর ও পোকামাকড় কোথাও আশ্রয় পাইতে না পারে, এরূপভাবে সমস্ত স্থান খোলা রাখিতে হইবে।
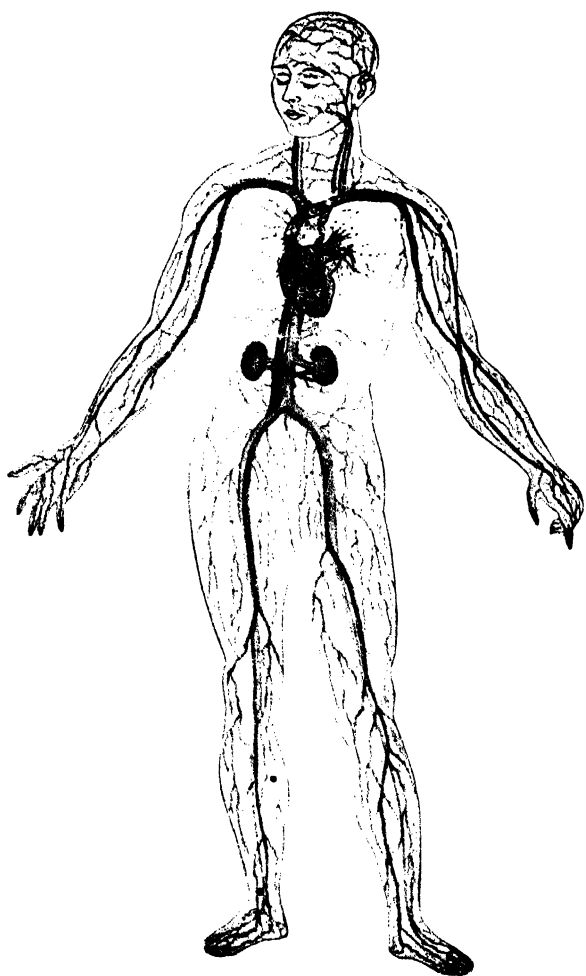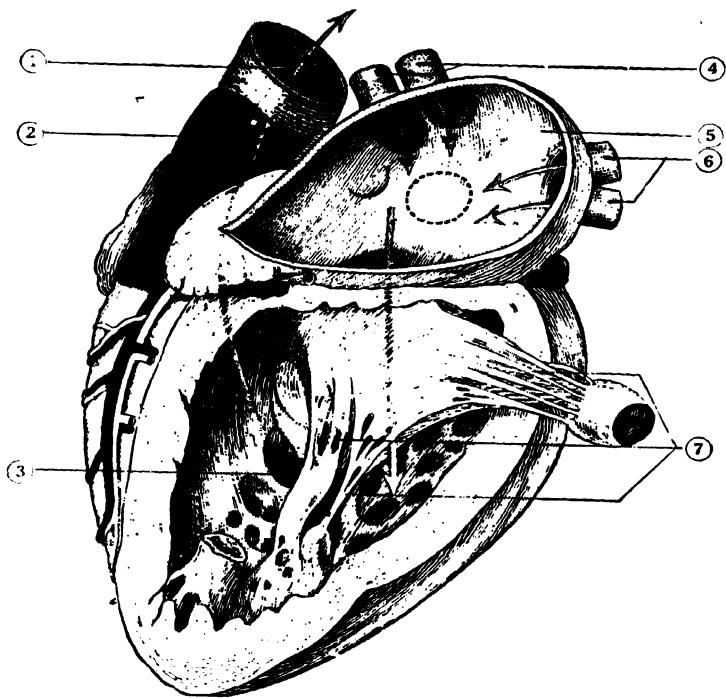
রক্ত-সঞ্চালনী যন্ত্র

ধমনী লাল এবং শিরা নীল বর্ণে রঞ্জিত.

হৃৎপিণ্ড, ও উহার বৃহৎ রক্তবহা নাড়ী

1. বৃহদ্ধমনী 2. ফুসফুস সংশ্লিষ্ট ধমনী
3. হৃৎপিণ্ডের বাম গহ্বর 4. দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ফুসফুস সংশ্লিষ্ট শিরা
5. হৃদয়ে রক্ত প্রবেশের বাম গহ্বর
6. বাম পার্শ্বস্থ ফুসফুস সংশ্লিষ্ট শিরা

7. কতকগুলি দড়ির মত পদার্থ, ইহাদের সহিত একটী ঢাক্‌নী সংযুক্ত আছে। ধমনীতে রক্ত সঞ্চালনের জন্য, হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত হইবার সময় ইহারা ঢাকনীটাকে হৃৎপিণ্ডের রক্ত প্রবেশের গহ্বরে ঢুকিতে দেয় না।

৮ম অধ্যায়

রক্ত ও রক্ত-সঞ্চালনের যন্ত্রাদি

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এক বিন্দু রক্ত পরীক্ষা করিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে উহাতে বহুসংখ্যক অতি ক্ষুদ্র ও গোলাকার লাল পদার্থ রহিয়াছে। উহাদিগকে লাল-কণিকা (Corpuscles) বলে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি সাদা সাদা কণিকাও উক্ত রক্ত-বিন্দুতে দৃষ্ট হইবে। সেইগুলিকে শ্বেত-কণিকা বলা হয়। মৎস্য যেরূপে নদীস্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়, ঐ সমুদয় শ্বেত ও লাল কণিকাও রক্ত প্রবাহে সেইরূপে বিচরণ করে।

1. ও 2. লাল রক্ত-কণা 3. শ্বেত রক্ত-কণা
4. রক্তনালীর বেষ্টনী
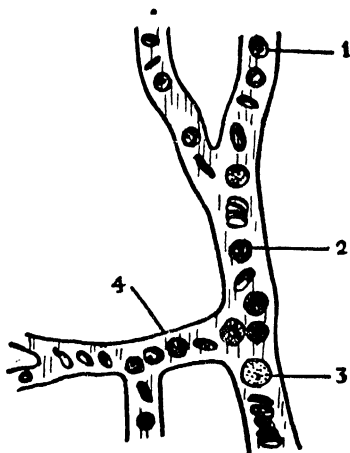
পরিপক্ক খাদ্যও রক্তে চালিত হইয়া থাকে। রক্তকে দেহের রপ্তানী-বিভাগ বলা যাইতে পারে; কারণ উহা ফুস্‌ফুস্ দ্বারা আনীত অম্লজান (Oxygen), এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রদ্বারা পরিপক্ক খাদ্য, দেহের প্রতি অঙ্গের অভাব পূরণের জন্য সমুদয় অঙ্গে প্রেরণ করিয়া থাকে। উহা আবার সর্ব্বাঙ্গ হইতে অনিষ্টকারী অসার পদার্থ এবং অঙ্গারাম্ল (Carbon dioxide) সংগ্রহ করিয়া, চর্ম্মে, ফুস্‌ফুসে ও বৃক্কদ্বয়ে প্রেরণ করে, পরে ঐ সকল স্থান হইতে উহারা প্রশ্বাস-বায়ু, ঘর্ম্ম এবং মূত্ররূপে প্রাণী দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়।

হৃৎপিণ্ড ও রক্ত-বহানালীসমূহ

রক্তবহানালী সমূহে সর্ব্বদাই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের বাহুর চর্ম্ম এবং চর্ম্মের নীচে যে সকল শিরা দেখা যায় উহারা যদি কাঁচ নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম যে শিরার মধ্য দিয়া রক্তপ্রবাহ দ্রুতবেগে হস্ত হইতে স্কন্ধের দিকে ধাবিত হইতেছে।

হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনে (Contraction) রক্ত-বহানালীসমূহে রক্ত চালিত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের আয়তন মানুষের বদ্ধমুষ্টির ন্যায়। উহা ফাঁকা, এবং দমকলের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে রক্তচালিত করে।

একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে প্রায় সত্তর বার স্পন্দিত হইয়া থাকে। ব্যায়ামের সময় উহা আরও দ্রুত স্পন্দিত হয়। জ্বরাক্রান্ত হইলেও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীলোকের হৃৎস্পন্দন পুরুষের অপেক্ষা প্রতি মিনিটে আট দশবার বেশী হইয়া থাকে। শিশুদিগের হৃৎস্পন্দন বয়ঃপ্রাপ্তদিগের অপেক্ষা বেশী; পাঁচ বৎসর বয়স্ক একটী শিশুর প্রতি মিনিটে নব্বই হইতে একশত বার হৃৎস্পন্দন হইয়া থাকে।

এই অধ্যায়ের হৃৎপিণ্ডের চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন যে, একটী বৃহৎ রক্ত-বহানালী হৃৎপিণ্ডের বাম অংশের উর্দ্ধভাগের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। এই রক্তবহানালীর নাম বৃহদ্ধমনী (Aorta)। উহা উর্দ্ধমুখী হইয়া কতকগুলি শাখা বাহির করিয়াছে। উহাদের দ্বারা মস্তকে ও বাহুদ্বয়ে রক্ত চালিত হইয়া থাকে। তারপর উহা বক্র হইয়া হৃৎপিণ্ডের পশ্চাদ্দিকে নামিয়া গিয়া নানা শাখাপ্রশাখা বাহির করিয়াছে। উহারা দেহের প্রতি অঙ্গে রক্ত প্রেরণ করিতেছে।

হৃৎপিণ্ড যখন সঙ্কুচিত হয়, তখন উহার অভ্যন্তরস্থ রক্ত বৃহদ্ধমনীতে প্রবিষ্ট হইয়া, তথা হইতে অসংখ্য শাখাপ্রশাখা দ্বারা দেহের সর্ব্বত্র চালিত হয়। রক্তের সঞ্চালন কালে উহা ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর রক্তনালীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া, অবশেষে এত ক্ষুদ্র রক্তনালীতে প্রবেশ করে যে তাহাদের তিন সহস্র পাশাপাশি করিলে মাত্র এক ইঞ্চি প্রশস্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল অতি ক্ষুদ্র রক্তনালীকে কৈশিক রক্তনালী (Capillaries) বলা হয়। কৈশিক রক্তনালী-সমূহ সংখ্যায় এত অধিক এবং এরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট যে অতিশয় সূক্ষ্মাগ্র সূচিকা দ্বারা মাংসের যে কোন স্থানই স্পর্শ করি না কেন, অন্ততঃ একটী বা একাধিক নালী তদ্দ্বারা অবশ্যই বিদ্ধ হইবে।

রক্ত কৈশিক-নালীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া শিরাপথে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আইসে। হৃৎপিণ্ডটী কাটিলে দেখা যাইবে যে উহা দুই অর্দ্ধে বিভক্ত—বামার্দ্ধ ও দক্ষিণার্দ্ধ। রক্ত হৃৎপিণ্ডের বামার্দ্ধ হইতে বৃহদ্ধমনীতে প্রবেশ করিয়া দেহের সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণার্দ্ধে ফিরিয়া আইসে। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণাংশের মধ্য দিয়া ঐ রক্ত আবার ফুস্‌ফুসে গমন করে। ফুস্‌ফুস্ দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় রক্ত সমুদয় অঙ্গ হইতে যে দূষিত পদার্থ বহিয়া আনে তাহার কিয়দংশ হইতে বিমুক্ত এবং ফুস্‌ফুসে প্রবিষ্ট শ্বাসবায়ু হইতে অম্লজান বাষ্প গ্রহণ করিয়া থাকে।

রক্তেই জীবন

এক গাছি দড়ি যদি খুব শক্ত করিয়া আঙ্গুলে জড়াইয়া রাখা যায়, শীঘ্রই আঙ্গুলটী কাল হইয়া যাইবে, এবং দুই দিনের মধ্যেই জীবনহীন হইয়া পচিয়া যাইবে। রক্তচলাচল বন্ধ করিবার জন্যই আঙ্গুলটী জীবনহীন হইবে। ইহাতেই বুঝা যায় শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের সজীবতা রক্তের উপর নির্ভর করে; সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানবের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর বলিয়াছিলেন,—"রক্তের মধ্যেই শরীরের প্রাণ থাকে।"

হৃৎপিণ্ডে ও শোণিতে আমরা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। প্রথমে হৃৎপিণ্ডের প্রতি লক্ষ্য করুন। শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে, তখন হইতেই উহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করে। তারপরে আশি বা নব্বই বৎসর পরমায়ু পর্য্যন্ত প্রতি মিনিটে অন্ততঃ সত্তর বার ইহার স্পন্দন হইতে থাকে। হৃৎস্পন্দন সম্বন্ধে আমাদের কোন চিন্তা করিতে হয় না, অথবা আমাদের ইচ্ছায় উহার স্পন্দন নিবৃত্ত হয় না; উহা যেন ঠিক স্বতঃচালিত একখানি ইঞ্জিনের ন্যায়। মানুষের আবিষ্কৃত যে কোন আশ্চর্য্যজনক যন্ত্র অপেক্ষা ইহা লক্ষ লক্ষ গুণ আশ্চর্য্যকর। এমন কি যখন আমরা নিদ্রা যাই তখনও উহা আমাদের জীবনরক্ষাকারী-রক্ত সমস্ত দেহে চালিত করিয়া থাকে। উহাকে চালাইবার ভার আমাদের উপরে নাই; আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরই হৃৎপিণ্ড চালাইয়া দিয়াছেন, এবং আমরা নিদ্রিতই থাকি বা জাগ্রতই থাকি তিনি সর্ব্বদা উহাকে চালাইবেন।
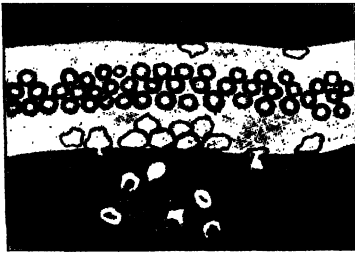
শ্বেত-শোণিত-কণিকাগুলি রোগ-জীবাণুর সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত রক্তবহানালী হইতে বহির্গত হইয়া মাংস-তন্তুর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ঐ দেখুন, শ্বেত-শোণিত-কণিকাগুলি ব্যাক্টেরিয়াগুলিকে (Bacteria) গ্রাস করিতেছে। রক্ত-বহানালীর মধ্যভাগে লাল রক্ত-কণিকার একটী তেহারা শ্রেণী প্রদর্শিত হইয়াছে।

শরীরের কোন অঙ্গ আহত বা আঘাত-প্রাপ্ত হইলে, রক্ত দ্বারাই সেই অঙ্গ সুস্থ হইতে পারে। যখন রোগের জীবাণু দেহে প্রবেশ লাভ করে, তখন শোণিতের উল্লিখিত শ্বেত-কণিকাগুলি নির্ভীক সৈন্যদলের ন্যায় ঐ সমুদয় জীবাণুকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করে। রোগের জীবাণুগুলি সংখ্যায় অত্যধিক ও অতিশয় বিষাক্ত হইলে, অথবা তামাক, সুরা বা অন্য কোন দূষিত পদার্থ ব্যবহারে শ্বেত-কণিকাগুলি শক্তিহীন হইয়া পড়িলে, উহাদের পক্ষে রোগজীবাণু ধ্বংস করা অসম্ভব হইয়া থাকে।

কখন কখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রোগজীবাণুর প্রতি শ্বেত-শোণিত-কণিকার আক্রমণ প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। উহারা এত সূক্ষ্ম যে, উহাদের আড়াই হাজার কণিকাকে পাশাপাশি রাখিলে, মাত্র এক ইঞ্চি লম্বা হয়। তথাপি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উহাদিগকে বিষাক্ত জীবাণু আক্রমণ ও নষ্ট করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় উহারা ঠিক বুদ্ধিমান জীবের ন্যায় কার্য্য করে, এবং আরও একটী প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়াই, বিরত হন নাই, তিনি তাহাদের জীবনও রক্ষা করিতেছেন। জীবন বিনাশক বিষাক্ত রোগ-জীবাণু ও অন্যান্য শত্রুগণ হইতে শরীর যাহাতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি এই শরীরেই নানা প্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

রক্তই যখন আমাদের জীবন এবং রক্তই যখন আমাদিগকে সুস্থ রাখে তখন আমাদের ভাল বিশুদ্ধ রক্তের বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের আহার্য্য দ্রব্য হইতে রক্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। খাদ্য যদি উত্তম ও বিশুদ্ধ হয়, তবে রক্তও বিশুদ্ধ হইবে। খাদ্যে যদি সারবস্তু কম থাকে, অথবা পরিমাণে কম হয়, তবে শোণিত-কোষগুলি পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। তাহাতে পরিণামে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ রোগগ্রস্ত হয়, প্রচুর পরিমাণে নির্ম্মল জল পান করিলে, রক্ত সমুদয় বিষাক্ত ও অসার পদার্থ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ রক্ত লাভ করিতে ব্যায়ামের বিশেষ প্রয়োজন। সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ও তামাক ব্যবহারের ফলে লাল ও সাদা শোণিত-কোষগুলির অনিষ্ট হয়, এবং রক্তের জীবন-রক্ষাকারী পুষ্টিসাধক, ও রোগোপশমকারী গুণসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়।

৯ম অধ্যায়

দূষিত পদার্থ নিষ্কাশনের যন্ত্রাদি

বৃক্কদ্বয়

বাষ্পীয় যন্ত্রের চালকগণ তাহাদের ইঞ্জিন হইতে ভস্ম ও অঙ্গার কণিকা নিয়মিতরূপে ফেলিয়া দেন, ইহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। ইঞ্জিন চালাইতে কয়লা জ্বালান হয়, তাহাতেই এই সমুদয় ভস্ম ও অঙ্গার জমিয়া থাকে। উহা পরিষ্কার না করিলে অল্পকাল মধ্যে ইঞ্জিনখানি অকর্ম্মণ্য ও অচল হইয়া পড়ে; আমাদের শরীর সম্বন্ধেও এই দৃষ্টান্তটী প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইঞ্জিনের কয়লার ন্যায়, আমরাও প্রতিদিন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিয়া থাকি। উক্ত খাদ্য আমাদের দেহে প্রজ্বলিত হইতে থাকে; তাহাতে কিছু ভস্ম ও আবর্জ্জনা থাকিয়া যায়। সেগুলি শরীর হইতে বহিষ্কৃত করা আবশ্যক। শরীর বা উহার কোন না কোন অঙ্গ নিয়ত কার্য্যশীল থাকে, কোন অঙ্গ সঞ্চরণশীল হইলে উহা ক্ষয় হয়, এবং এই ক্ষয়ের জন্য আবর্জ্জনার উদ্ভব হয়। আবর্জ্জনা অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। শরীর হইতে আবর্জ্জনা বা অসার পদার্থ পরিষ্কার করিয়া না ফেলিলে, উহা সমস্ত শরীরকে বিষাক্ত ও পরিণামে রোগগ্রস্ত করিয়া তুলিবে। ফুস্‌ফুস্ কিরূপে শরীরের এই প্রকার দূষিত বিষাক্ত পদার্থ দূর করিতে সাহায্য করে, তাহা পূর্ব্বেই ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বলিয়াছি। দেহ হইতে দূষিত পদার্থ নিষ্কাশন করিতে বৃক্কদ্বয়ও যথেষ্ট কার্য্য করে।
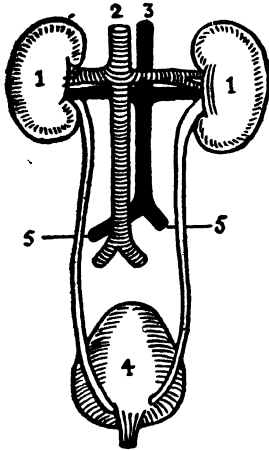
1. বৃক্কদ্বয় 2. ধমনী 3. শিরা
4. মূত্রাশয় 5. মূত্রনালীদ্বয়

বৃক্ক দেখিতে বৃহদাকার শিম-বীজের ন্যায়। উহারা উদর-গহ্বরের বাহিরে উহার পশ্চাদ্ভাগে মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। বৃক্কদ্বয়ের মধ্য দিয়া রক্ত সঞ্চালিত হইবার সময়, উহারা রক্ত হইতে দূষিত পদার্থের কতকাংশ ছাঁকিয়া লয়। উক্ত দূষিত অংশ এবং বৃক্ক দ্বারা গৃহীত শোণিতের কতক জলীয়াংশ, একত্র হইয়া মূত্রের সৃষ্টি করে। তখন মূত্র উভয় বৃক্ক হইতে একটী নালীর মধ্য দিয়া মূত্রাশয়ে প্রবেশ করে, এবং মূত্র ত্যাগের সময় উহা বাহির হইয়া যায়।

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি একদিনে আধসের হইতে দেড় সের মূত্র ত্যাগ করেন। সুস্থ ব্যক্তি, নিয়মিত জল পান করিলে, ঈষৎ হরিদ্রাভ মূত্র ত্যাগ করিবেন। কখন কখন প্রায় জলের মত মূত্রও ত্যাগ করিতে পারেন। মূত্রের রং লাল বা পিঙ্গল হইলে জল পান করা কম হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

জ্বরসংযুক্ত রোগে, রুগ্ন ব্যক্তির বৃক্কদ্বয়ের কার্য্য বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই জন্য উহার প্রচুর নির্ম্মল জল পান করা আবশ্যক। রুগ্ন ব্যক্তি যেন ইচ্ছা হইলেই জল পান করিতে পারেন এই জন্য তাহার হাতের কাছে জল রাখা কর্ত্তব্য। রুগ্ন ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণ জল পান না করিলে, তাহার শরীর হইতে দূষিত পদার্থ বাহির হইতে পারে না, ফলে রোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

মদ্য, তামাক, লঙ্কা, মস্‌লা, আদা প্রভৃতি দ্বারা বৃক্কদ্বয়ের বিষম অনিষ্ট হয়। উল্লিখিত পদার্থের মত পদার্থ সমূহকে বাহির করিয়া দেওয়া, বৃক্কদ্বয়ের কার্য্য। অপর সকলের উপকার ও রক্ষার নিমিত্ত কোন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার সময় পুলিশ নিজেই যেরূপ কখন কখন উক্ত অপরাধীদ্বারা ভীষণভাবে আহত হন ঠিক সেইরূপে রক্ত হইতে উল্লিখিত দূষিত দ্রব্যাদি বাহির করিয়া দিবার পূর্ব্বে বৃক্কদ্বয়ও উক্ত দ্রব্য সমূহ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

ত্বক্

ত্বক্ দেহের বহিরাবরণ; উহা, উহার নিম্নস্থ অংশগুলি রক্ষা করিয়া থাকে। ত্বকের সহিত আস্তর (নিম্নাবরণ) দেওয়া পোষাকের তুলনা হইতে পারে, কারণ উহার দুইটী স্তর, একটী ভিতরের, অপরটী বাহিরের। ত্বকের কোন স্থানে সহসা ফুটন্ত জল লাগিয়া ফোস্কা পড়িলে, ফোস্কার মধ্যস্থিত তরল পদার্থ উক্ত স্তর দুইটীর মধ্যে থাকে।

ত্বকের অভ্যন্তরীণ স্তরে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর্ম্মগ্রন্থি (Sweat Glands) রহিয়াছে। উহাদের প্রত্যেকটী হইতে একটী ক্ষুদ্র নালী বরাবর ত্বকের উপরিভাগে পৌছিয়াছে। হাত যদি খুব গরম থাকে, তবে একটী অঙ্গুলির অগ্রভাগ চিপিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন, যে অভ্যন্তরীণ স্বেদগ্রন্থির মুখ হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বাহির হইতেছে। ঘর্ম্মের সমুদয় অংশই জল নহে। জল ব্যতীত উহাতে লবণ এবং অসার পদার্থও রহিয়াছে। উক্ত অসার পদার্থ, এবং মূত্রের দূষিত অংশ প্রায় একই প্রকারের।

ত্বক্ ও বৃক্ক যদি শরীর হইতে দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া না দেয়, তবে বিষ অতি সত্বর দেহের অনিষ্ট করিতে থাকিবে। শুধু ত্বক দ্বারাই বহু পরিমাণ বিষাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া যায়; ত্বকের উপরিভাগ যদি এরূপভাবে রং দ্বারা

রঞ্জিত বা বার্ণিশ করিয়া দেওয়া হয়, যে কোন মতে ঘর্ম্ম বাহির হইতে না পারে, তবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত। অনেকে মনে করেন, যে যখন আমরা ত্বকে ঘর্ম্ম নির্গম হইতে দেখি, কেবল তখনই ঘর্ম্ম বাহির হইয়া থাকে। ইহা অতি ভুল ধারণা, শরীরের সমুদয় স্বেদগ্রন্থি হইতে নিয়ত ঘর্ম্ম বাহির হইতেছে। কিন্তু অনেক সময় উহা এত ধীরে ধীরে নির্গত হয় যে, তৎক্ষণাৎ বাষ্পাকারে অদৃশ্য হইয়া যায়, কাজেই দেখা যায় না। দৈহিক উত্তাপে ও ব্যায়ামে ঘর্ম্ম বৃদ্ধি হয়। প্রচুর পরিমাণ ঘর্ম্ম বাহির করিবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিয়মিত ব্যায়াম করা ভাল, ইহাতে শুধু যে ত্বক্ সবল ও সুস্থ হয় এরূপ নহে, রক্তও নির্ম্মল হইয়া থাকে।
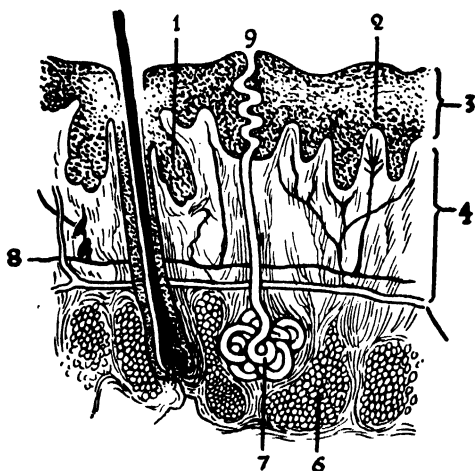
1. ও 2. দুই প্রকারের স্নায়ু-প্রান্ত 3. মৃত উপত্বক্ 4. ত্বক্ (প্রকৃত চর্ম্ম) 5. ধমনী 6. মেদকোষ 7. ঘর্ম্মস্রাবী গ্রন্থি 8. স্নায়ু 9. ঘর্ম্মরন্ধ্র

প্রচুর ঘর্ম্ম হইবার পর, ঘর্ম্ম শুকাইয়া গেলেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, ত্বকের উপরে লবণের একটা সূক্ষ্ম স্তর পড়িয়াছে। শরীর হইতে এই লবণ ঘর্ম্মের সহিত নির্গত হয়। লবণের সহিত অন্যান্য অসার পদার্থও থাকে। নিয়মিত স্নান না করিলে, ঐ সকল অসার পদার্থের নিমিত্ত শরীর ও বস্ত্রাদি হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। ত্বকের উপরিভাগে প্রতি নিয়ত যে সকল লবণ, অসার পদার্থ ও ধূলিকণা জমিতেছে, নিয়মিত স্নান দ্বারা সেই সমুদয় ধুইয়া না ফেলিলে, উহারা স্বেদ নির্গমনের মুখ বন্ধ করিয়া ফেলে, এবং স্বেদ গ্রন্থির কার্য্যে বাধা জন্মায়। এই প্রকারে রক্তে বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চিত হইয়া রোগ উৎপন্ন হয়। উষ্ণপ্রধান দেশে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিদিন স্নান করা কর্ত্তব্য।

পরিচ্ছন্নতার নিমিত্ত স্নানের সময় গরম জল ও সাবান ব্যবহার করা উচিত। শীতল জলে স্নান করিবার পর তোয়ালের দ্বারা খুব জোরে গাত্র ঘর্ষণ করা দেহ সতেজ করিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট অভ্যাস, কারণ এরূপ করিলে সর্দ্দি ও

অন্যান্য কতিপয় ব্যাধি সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। সকালবেলাই ঠাণ্ডা জলে স্নান করিবার উৎকৃষ্ট সময়। দেহ উত্তপ্ত হইলে বা পরিশ্রান্ত অবস্থায়, শীতল জলে স্নান করা বিধেয় নহে। আহারের অব্যবহিত পরেই উষ্ণ বা শীতল জলে স্নান করা কখনও উচিত নহে। খুব গরমের সময়ে শরীর শীতল করিবার জন্য স্নান করিতে হইলে, ঝাজরী বসান কলে বা ছিটকান জলে স্নান করা ভাল।

ব্যাধি পরিহার করিবার নিমিত্ত, সুস্থ ব্যক্তিগণের নিয়মিত স্নান করা আবশ্যক: আর ব্যাধিগ্রস্তদিগের পক্ষে প্রতিদিন নিয়মিত স্নান আরও আবশ্যক; কারণ সুস্থ দেহ অপেক্ষা ব্যাধিগ্রস্ত দেহে অধিক পরিমাণে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হইয়া থাকে, এবং উহা অধিকতর বিষাক্ত। প্রত্যহ স্নান করিলে অধিকাংশ রুগ্ন ব্যক্তিই সত্বর আরোগ্যলাভ করিতে পারেন। যথানিয়মে স্নান করাইতে পারিলে, পীড়িত ব্যক্তির ঠাণ্ডা লাগিবার কোনই আশঙ্কা থাকে না। ঈষদুষ্ণ জল লইয়া প্রথমে ডান হাতখানি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া সত্বর মুছিয়া ঢাকিতে হইবে, পরে বাম হাতখানি ঐরূপে ধুইয়া সত্বর মুছিয়া ঢাকিতে হইবে, তারপরে বুকের সম্মুখ ঐরূপে ধুইয়া সত্বর মুছিয়া ঢাকিতে হইবে, এইরূপে সর্ব্বাঙ্গ ধুইয়া, সত্বর মুছিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিলে রুগ্ন ব্যক্তির ঠাণ্ডা লাগিবার কোনই আশঙ্কা থাকে না।

পরিচ্ছদ

কিরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবে, তাহা স্থানীয় জলবায়ুর উপরে নির্ভর করে। ত্বকের উপরে যে পরিচ্ছদ পরিধান করা হয়, তাহা ঘন ঘন পরিষ্কৃত ও পরিবর্ত্তিত করা আবশ্যক। উষ্ণপ্রধান দেশে প্রতিদিন, অন্ততঃ একদিন অন্তর একদিন, বস্ত্র পরিষ্কৃত ও পরিবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। ঘর্ম্মের সহিত নিঃসারিত দূষিত পদার্থ অথবা তৈলগ্রন্থি হইতে নির্গত ক্লেদে অপরিষ্কৃত পরিচ্ছদ যে কেবল দুর্গন্ধপূর্ণ হয় তাহা নহে, উহাতে ত্বকে প্রদাহ জন্মায়, ত্বকের উপরে ব্রণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক হইয়া থাকে, আরও শরীর হইতে নির্গত দূষিত পদার্থের বিষাক্ত অংশ পুনরায় ত্বকের মধ্য দিয়া শরীরে ফিরিয়া গিয়া বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে।

লোমকূপ ও ত্বকের তৈলস্রাবী গ্রন্থি
(Oil Glands)

প্রতি লোমকূপের পার্শ্বে এক একটী ক্ষুদ্র গ্রন্থি রহিয়াছে, উহা হইতে তৈল নিঃসৃত হইয়া থাকে। উক্ত তৈল ত্বকের উপরিভাগে আসিয়া ত্বককে

তৈলাক্ত রাখে, সেই জন্য উহা কখন শুষ্ক হইতে বা ফাটিতে পারে না। উক্ত তৈল লোমসমূহকে তৈলাক্ত রাখে। বুরুস্ দ্বারা খুব জোরে প্রত্যহ মাথা আঁচড়াইলে চুল খুব সুন্দর হয় ও শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ধূলি ও তৈল দূর করিবার জন্য উষ্ণজল উত্তম সাবান দ্বারা মাঝে মাঝে মস্তক ধৌত করা কর্ত্তব্য।

টাক-পড়া

খুস্‌কি বা মরামাসের নিমিত্ত মাথায় টাক পড়ে। ত্বকের তৈলস্রাবীগ্রন্থি-গুলিতে জীবাণু জন্মিয়া খুস্‌কির সৃষ্টি হয়। এই রোগ সাধারণতঃ চুল আঁচড়াইবার বুরুস্ ও চিরুণীদ্বারা বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই জন্য প্রত্যেকেরই নিজের বুরুস্ ও চিরুণী রাখা কর্ত্তব্য; অপরের ব্যবহৃত বুরুস্ বা চিরুণী ব্যবহার করা কখনও উচিত নহে। ঘরের মধ্যে থাকিবার সময়ে টুপি ব্যবহার করার জন্যও অনেক সময় টাক পড়িয়া থাকে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকে চুলে অতিরিক্ত তৈল ব্যবহার করেন, এরূপ অতিরিক্ত তৈল ব্যবহারও টাক পড়িবার একটী কারণ। প্রতিদিন বুরুস্ দ্বারা ভালরূপে চুল আঁচড়াইলে, আর তৈল মাখিবার প্রয়োজন হয় না।

খুস্‌কি হইলে, অথবা মাথার চুল উঠিতে থাকিলে, নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা নিবারিত হইতে পারে। হাতে এক মুষ্টি পরিমাণ আর্দ্র লবণ লইয়া মাথায় এরূপ জোরে ঘষিতে হইবে যে তালু যেন লাল হয়। তৎপরে এই গ্রন্থের শেষ ভাগে প্রদত্ত ৫নং ব্যবস্থা পত্রের মলম বা ৬নং ব্যবস্থা পত্রের লোশন উক্ত স্থানে প্রত্যহ প্রয়োগ করিতে হইবে।

স্পর্শানুভূতি

কোন জিনিষ স্পর্শ করিলেই আমরা কিছু অনুভব করি। ত্বকে বহু স্নায়ু আছে বলিয়াই, কোন বস্তু আমাদের যে কোন অঙ্গের সংস্পর্শে আসিলেই আমরা তাহা অনুভব করিয়া থাকি। কোন বস্তু ত্বকের সংস্পর্শে আসিলেই স্নায়ুতে চাপ লাগে, তখনই ঐ স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কে সংবাদ প্রেরণ করে, এবং এইরূপে আমরা বস্তুটী উষ্ণ বা শীতল, কর্কশ বা মসৃণ, ভারী বা হাল্কা তাহা বুঝিতে পারি।

অভ্যাসের দ্বারা স্পর্শানুভূতি খুব প্রখর করা যাইতে পারে। অন্ধ ব্যক্তিগণ শুধু অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া কাগজের উপরে যে অক্ষরগুলি সামান্য উচ্চ হইয়া থাকে, সেগুলিকে পাঠ করিতে সমর্থ হন। শরীর রক্ষার নিমিত্ত এবং হস্ত-শিল্প ও বিভিন্ন কলায় মানুষ যাহাতে সুদক্ষ হইতে পারেন তজ্জন্য মানবজাতির সৃষ্টিকর্ত্তা ত্বকে বিভিন্ন স্নায়ু দিয়াছেন। ত্বকে এই প্রকার অনুভূতি না থাকিলে, আমাদের কোন অঙ্গ অপর কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া

কাটিয়া বা পুড়িয়া গেলে, আমরা কখনও জানিতে পরিতাম না। আমরা হস্তের দ্বারা সর্ব্বদা যে সকল কার্য্য করি এই প্রকার অনুভূতি না থাকিলে সে সকল কখনও করিতে পারিতাম না, কারণ কিরূপে হস্তের ব্যবহার করিতে হয়, তাহাই জানিতাম না।

ত্বকের দ্বারা যখন এত কার্য্য করিতে হয়, এবং মানুষের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের সহিত যখন উহার এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তখন উহাকে উত্তম অবস্থায় রাখা আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য। নিয়মিত স্নান দ্বারা উহাকে কেবল বাহিক পরিষ্কার রাখিলেই চলিবে না; তামাক ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের বিষ ত্বকের মধ্য দিয়া বাহির হয়, অতএব এ সমুদয় একেবারে ত্যাগ করিয়া ত্বকের ভিতরও পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য।

হাতের নখ

আঙ্গুলের অগ্রভাগ রক্ষা করিবার জন্য এবং অতি ক্ষুদ্র জিনিষপত্রাদি খুঁটিয়া লইবার জন্য হাতের নখ আমাদের পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয়। নখ বেশ ছোট করিয়া কাটিতে হইবে, কোন মতে যেন আঙ্গুলের অগ্র-ভাগের উপরে বর্দ্ধিত হইতে না দেওয়া হয়। নখ দ্বারা শরীরের কোন স্থান আঁচড়াইয়া গেলে, অনেক সময়ে উক্ত স্থান বিষাক্ত হয়। নখের মধ্যস্থ ধূলিকণায় কলেরা ও অন্যান্য ব্যাধির জীবাণু জন্মিতে পারে, এবং খাইবার সময়ে ও অন্যান্য সময়ে মুখের মধ্যে আঙ্গুল গেলে ঐ সমুদয় জীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, ফলে কলেরা বা অন্যান্য ব্যাধি প্রকাশ পায়। নখ খুব ছোট করিয়া কাটা থাকিলেও, মাঝে মাঝে ছুরি বা কাঠের টুকরা দ্বারা নখের মধ্যের ময়লা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য।

১০ম অধ্যায়

অস্থি ও পেশীসমুহ

পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় নরকঙ্কালের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। নরকঙ্কালে সর্ব্ব-সমেত দুইশত ছয় খানি অস্থি রহিয়াছে। জীবিত মনুষ্যের সমুদয় অস্থিই সজীব এবং উহাতে রক্ত এবং স্নায়ু রহিয়াছে। কঙ্কাল দ্বারা দেহের আকৃতি গঠিত হয় এবং মানুষ ইহার সাহায্যে সোজাভাবে দাঁড়াইতে সমর্থ হন। অস্থি না থাকিলে মানুষ কখন সোজাভাবে দাঁড়াইতে অথবা খাড়া হইয়া চলিতে ফিরিতে পারিতেন না, পোকা মাকড়ের ন্যায় হামাগুড়ি দিয়া চলিতে হইত।

নরকঙ্কালের বিভিন্ন অংশ ভাল করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যাইবে, যে উহার প্রত্যেক অংশ বিশেষ বিশেষ ব্যবহারের উপযোগী করিয়া কিরূপ আশ্চর্য্য ধরণে নির্ম্মিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মানুষের মাথার খুলি ধরুন।
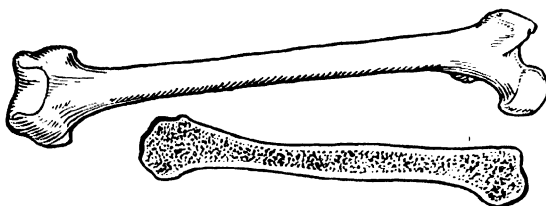
উরুদেশের লম্বা হাড়

উহা একটী বৃহৎ গোলাকার ফাঁপা বলের ন্যায়। উহার মধ্যে আছে বলিয়া মস্তিষ্ক বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা পাইতেছে।

হৃৎপিণ্ড ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতির রক্ষা কল্পে পঞ্জরাস্থি দ্বারা কিরূপ সুন্দর বক্ষপিঞ্জর প্রস্তুত হইয়াছে!

বাহু ও পদদ্বয়ের অস্থিগুলি দীর্ঘ ও সরু। এই নিমিত্ত উহাদের অবাধ ও দ্রুত সঞ্চালন সম্ভব হইয়া থাকে।

ছোট ছোট শিশুদিগের হাড়গুলি অতিশয় নরম; তাই হাড়গুলি বিকৃত না হয় এই জন্য বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। নবজাত কোন শিশুকে যদি সকল সময়ে এক পার্শ্বে শুইবার অভ্যাস করান হয়, তাহা হইলে উহার মস্তকের গঠন বিকৃত ও কপালের এক পার্শ্ব প্রশস্ত হইয়া যাইবে। শিশুকে কয়েক ঘণ্টা এক পার্শ্বে শোয়াইয়া রাখিয়া পরে পুনরায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।
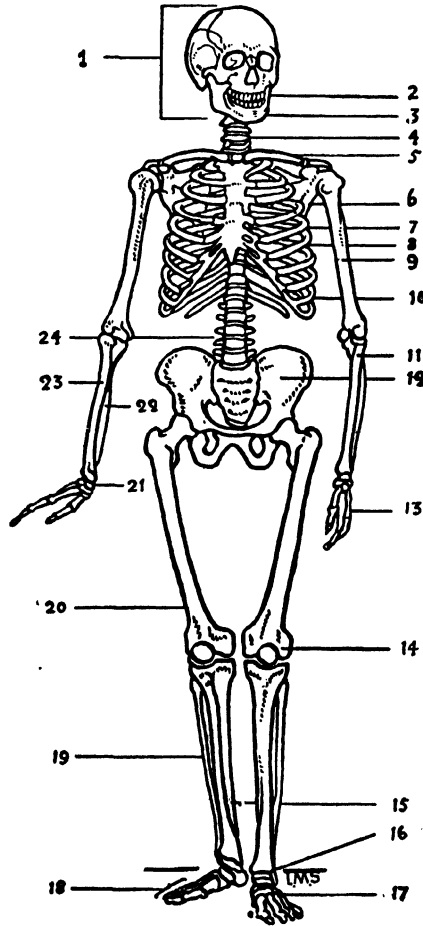
1 মাথার খুলি 2. ও 3. চোয়ালের হাড় 4. মেরুদণ্ড ও মস্তক ধারক অস্থি 5. কণ্ঠের হাড় 6. স্কন্ধাস্থি 7. 8. ও 10. পঞ্জর 9. বাহুর দীর্ঘ অস্থি 11. নিম্ন বাহুর বহিরস্থি 12. পাছার হাড় 13. আঙুলের হাড় 14. মালাই চাকি 15. বেধস্থি 16. পায়ের গাঁইটের হাড় 17. পায়ের আঙুলের উপরের হাড় 18. অঙ্গুল্যাস্থি 19. নিম্নজানুর পশ্চাদ্দিকের হাড় 20. উর্ব্বস্থি 21. কব্জির হাড় 22. অগ্রবাহুর কনিষ্ঠাঙ্গুলির দিকের হাড় 23. অগ্রবাহুর বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকের হাড় 24. মেরুদণ্ডের একটী ক্ষুদ্র হাড়।

ছোট শিশুকে খুব অল্পবয়সে পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার অভ্যাস করাইলে, পা বক্র হইয়া যাইবে। বিদ্যালয়ের বালকবালিকাদিগের বসিবার বেঞ্চির পিছনে যাহাতে ঠেসান্ দিবার কিছু থাকে এরূপ ভাবে উহা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বেঞ্চিগুলি এরূপ নীচু হওয়া প্রয়োজন যাহাতে বালকবালিকাদের পা মাটির উপরে থাকে। অনেক বালকবালিকারই পিঠ কুব্জ; কারণ তাহাদের স্কুলের বেঞ্চিগুলি খুব উচ্চ, ও তাহাতে ঠেসান্ দিবার কিছুই নাই।

শিশুরা উপযুক্তরূপে না বাড়িলে, এবং উহাদের অস্থি বিশেষভাবে ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইলে, বুঝিতে হইবে যে উহারা উপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে না। তাহাদিগকে এরূপ খাদ্য দিতে হইবে যাহা দ্বারা অস্থি নির্ম্মিত হইয়া থাকে; যেমন, —প্রচুর পরিমাণে গো বা ছাগদুগ্ধের সহিত ময়দা বা গম, মটরশুঁটি, ডাল, কলাই ও জোয়ার প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত খাদ্য।
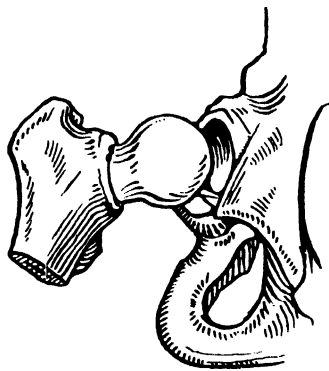
পাছার গোলা ও খোল নিশ্মিত সন্ধি : উরুর অস্থি ও কুক্ষির হাড়

যে স্থানে দুইখানি অস্থি মিলিত হয়, তথায় অস্থি-সন্ধি (Joints) গঠিত হয়। কোন কোন অস্থি-সন্ধিকে চলৎ-সন্ধি বা কোর-সন্ধি (Hinge Joint) বলা হয়; যেমন অঙ্গুলির সন্ধিগুলি, উহাদিগকে গৃহদ্বারের ন্যায় উন্মুক্ত ও বন্ধ করা যাইতে পারে। স্কন্ধ সন্ধি আবার অন্য প্রকারের, উহা শুধু নমনীয় নহে, বাহু বৃত্তাকারে ঘূর্ণিত হইবার পক্ষেও উহা উপযোগী।

যে স্থানে দুইখানি অস্থি মিলিত হইয়া অস্থি-সন্ধি গঠিত, সেই স্থানে উহারা দৃঢ় সন্ধি-রজ্জু (Ligaments) দ্বারা সংলগ্ন হইয়া থাকে। কখন কখন কোন সন্ধি-স্থল সজোরে চালিত হইলে, সন্ধি-রজ্জুগুলি ছিঁড়িয়া যায়; ইহাকেই আমরা মচকান বলিয়া থাকি।
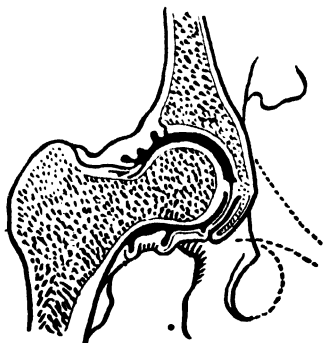
উরুর অস্থি কুক্ষি মধ্যে যথাস্থানে অবস্থিত : অস্থি মধ্যস্থ মজ্জাও দেখান হইয়াছে।

অস্থিগুলি কখনও কখনও ভাঙ্গিয়া যায়। বৃক্ষের শাখা ভগ্ন হইলে যেরূপে আপনা হইতেই জুড়িয়া যাইতে পারে,

সেইরূপে কোন ভগ্ন অস্থিও উপযুক্ত যত্ন পাইলে, পুনরায় জুড়িয়া যাইতে পারে।

৪৫শ অধ্যায়ে হাড় মচকান বা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার চিকিৎসা পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

পেশীসমূহ

মানবদেহ হইতে ত্বক্ ও ত্বকের নিম্নস্থিত চর্ব্বি বা মেদ অপসারিত করিলে, উহার আকৃতি ঠিক একাদশ অধ্যায়ের পেশীর চিত্রের ন্যায় হইবে। জীবন্ত পেশী রক্তবর্ণ। পাঠা বা ভেড়ার মাংসের যে অংশ লাল তাহাই পেশী।
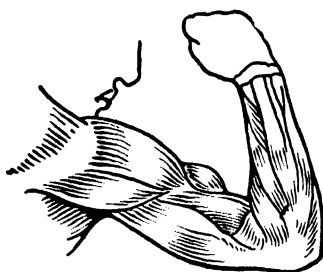
বাহুর মাংসপেশী

মানব দেহে পাঁচ শতের অধিক সংখ্যক পেশী রহিয়াছে। উহাদের আকৃতি ও গঠন বিভিন্ন প্রকারের। পেশীসমূহের চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, কতকগুলি দীর্ঘ, কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি ক্ষুদ্র, কতকগুলি খাট।

দক্ষিণ হস্ত বাম বাহুর উপরিভাগে স্থাপন করিয়া, বাম হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, স্কন্ধের দিকে গুটাইলে যে বৃহৎ পেশী দ্বারা বাহু গুটান যায় তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিছু চর্ব্বণ করিবার সময় কর্ণমূল ও রগের মধ্যভাগে যে সকল পেশী নিম্ন চোয়াল উত্তোলিত করে, সেই সমুদয় পেশীর সঞ্চলন দেখিতে পাওয়া যায়। হস্তপদ ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ চালনা করাই পেশীসমূহের কার্য্য।

কেবল যখন আমরা চলা ফিরা করি, তখনই যে পেশীর প্রয়োজন তাহা নহে, যখন আমরা স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকি, তখনও শরীরকে সোজা রাখিবার জন্য বহু পেশীর নিয়ত সঙ্কোচনের প্রয়োজন। অনেকে দাঁড়াইবার বা বসিবার সময়ে পৃষ্ঠ-দেশের পেশী-গুলি শিথিল করিয়া দেয়; ফলে পৃষ্ঠ কুব্জ হইয়া যায়, এবং স্কন্ধদ্বয় সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহাতে কেবল চেহারা কদাকার হয় না, ফুস্‌ফুসের

উপরে বক্ষ-পঞ্জর চাপিয়া পড়ায়, গভীর শ্বাস গ্রহণেও বাধা জন্মায়। চেয়ারে বসিবার অথবা টেবিলের সম্মুখে লেখা পড়া করিবার সময় শরীর সোজা রাখা উচিত। দাঁড়াইবার সময় যতদূর সম্ভব লম্বা হইয়া দাঁড়াইবেন। আপনি যেন মাথায় করিয়া কোন বস্তু বহন করিয়া লইতেছেন, ঠিক সেইরূপ মনে করিয়া দণ্ডায়মান হইবেন। চিবুকখানি গলার সম্মুখ ভাগে অতি নিকটে রাখিবেন। বক্ষঃস্থল সম্মুখ দিকে উচ্চ থাকিবে। তলপেটের সম্মুখ দিক প্রলম্বিত হইতে না দিয়া বরং পশ্চাদ্দিকে টানিয়া রাখিবেন।
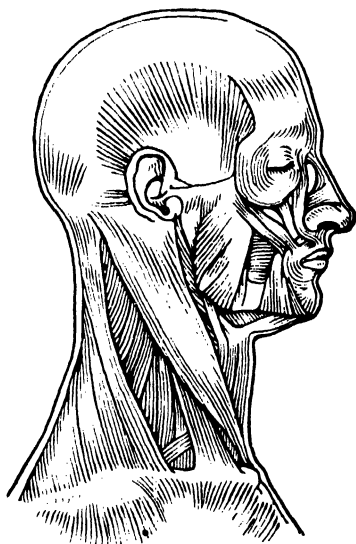
মস্তক ও গলদেশের মাংসপেশী

সোজাভাবে বসা ও দাঁড়াইবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যতই বলা যাউক না কেন কিছুতেই অত্যুক্তি হয় না। আমরা নিয়মিত খাদ্য দ্বারা আমাদের শরীরের রক্ত পরিষ্কার রাখিতে পারি, কিন্তু যদি অভ্যাসের দোষে অনিয়মিত ভাবে চলাবসার জন্য রক্ত বহা শিরা রুদ্ধ হইয়া জীবনদায়ী তরল পদার্থের চলাচল বন্ধ করিয়া দেয়, তবে অবশ্যই রুগ্ন হইতে হইবে। অতএব মাতাপিতা ও শিক্ষকগণ দেখিবেন, যাহাতে বালকবালিকাগণ সোজা হইয়া বসে ও দাঁড়ায়।

১১শ অধ্যায়

ব্যায়াম

শরীর সুস্থ ও সবল রাখিবার নিমিত্ত ব্যায়ামের নিতান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেকেই জানেন যে, কোন যন্ত্র ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া রাখিলে, মরিচা ধরে, এবং শীঘ্রই একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের শরীর সম্বন্ধেও এ কথা সত্য। আমরা যদি ক্রমাগত কয়েক সপ্তাহ শুধু শয়ন করিয়া বা বসিয়া কাটাই, এবং পদদ্বয়ের মোটেই ব্যবহার না করি, তবে উহারা এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে যে, ভ্রমণ করা বা দাঁড়ান অসম্ভব হইবে। ব্যায়াম না করিলে পেশী-সমূহ ক্ষুদ্র ও নরম হইয়া যায়, পরিপাক শক্তি ক্ষীণ হয়, এবং শরীরে যে সমুদয় রোগের জীবাণু প্রবেশ করিতে পারে, সেই সমুদয় বিনষ্ট করিতে শোণিত অসমর্থ হইয়া পড়ে।

ব্যায়ামের সময় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অধিকতর দ্রুত হইতে থাকে, তাই সর্ব্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চালন আরও ভাল মত চলিতে পারে। ব্যায়ামের সময়ে শ্বাসক্রিয়াও বৃদ্ধি পায়, তাই দেহের প্রতি অঙ্গে প্রচুর পরিমাণ অম্লজান প্রবেশ করিতে পারে। শরীরের পেশীসমূহ চালিত না হইলে মনে জড়তা জন্মে, তাই উত্তম স্মৃতিশক্তিলাভ করিতে, পরিশ্রম সহকারে পাঠ করিতে, বা পঠিত বিষয় আয়ত্ত করিতে হইলে, প্রতিদিন পেশীসমূহের চালনা করিতে হইবে।

একজন কর্ম্মকারের বাহু দৃঢ় ও সুবৃহৎ, কারণ সে সর্ব্বদা উহার চালনা করে। পক্ষান্তরে অনেক ছাত্র ও অফিসের কর্ম্মচারীর হস্ত, পদ, ও সমস্ত শরীর অতিশয় দুর্ব্বল ও খর্ব্বাকার, কারণ তাঁহাদের অধিকাংশ সময় বসিয়া কাটাইতে হয়; এবং তাঁহাদের হস্ত ও পদের মোটেই চালনা হয় না। শিক্ষিত ব্যক্তির পরিশ্রম করা শোভা পায় না, শুধু কুলি শ্রেণী লোকদেরই হাতের কাজ সাজে অনেকে আবার এরূপ ধারণা পোষণ করেন। ইহা অতি ভুল ধারণা। শারীরিক পরিশ্রম অতিশয় সম্মানের ও গৌরবের; বালক, বালিকা, পুরুষ, স্ত্রী, সকলের পক্ষেই ব্যায়াম সমভাবে প্রয়োজনীয়। কারণ দুর্ব্বল ও শিথিল পেশী থাকা সকলের পক্ষেই লজ্জার বিষয়।

মানবদেহ সৃষ্টি করিবার সময়, ঈশ্বর, কিসে উহার স্বাস্থ্য ও দৃঢ়তা রক্ষা হইবে তাহাও ভাবিয়া রাখিয়াছেন; তাই তিনি দেহ রক্ষার জন্য শুধু খাদ্যেরই বন্দোবস্ত করেন নাই, খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্ত মানুষের পরিশ্রম ও অঙ্গচালনা

করিতে হইবে, এরূপ ব্যবস্থাও করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "তুমি ঘর্ম্মাক্ত মুখে (অর্থাৎ হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া) আহার করিবে।" যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিয়মিত আহার করেন, অথচ নিয়মিত তাহার হস্তপদাদি চালনা করেন না, সেই ব্যক্তি স্বাস্থ্যের একটী মূল্যবান নীতি লঙ্ঘন করিতেছেন; ইহার দণ্ডস্বরূপ তাহাকে দুর্ব্বল ও পীড়িত দেহের ভার বহন করিতে হইবেই।

নানা প্রকারে ব্যায়াম বা অঙ্গ চালনা করা যাইতে পারে; কিন্তু সাধারণ কাজ করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যায়াম, যথা:—বাগানের কাজ, মিস্ত্রির কাজ ইত্যাদি। ভ্রমণ, দৌড়ান, এবং সাঁতার প্রভৃতিও উত্তম ধরণের ব্যায়াম।

পড়িবার ডেস্কে কিছুকাল বসিয়া স্থির ভাবে পাঠ করিবার পরে, বালক-বালিকাদিগের শ্বাসপ্রশ্বাস খুব ধীরে ধীরে বহিতে থাকে, এবং প্রতিবার শ্বাস-গ্রহণের সময়ে খুব অল্প পরিমাণ বায়ু ফুস্ফুসে প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ধীরে ধীরে হইতে থাকে, মন অবসাদগ্রস্ত হয়, এবং তাহারা ভালরূপ পাঠাভ্যাস করিতে পারে না। এই নিমিত্ত বালকগণ যাহাতে মাঝে মাঝে বাহিরে যাইয়া খেলিতে ও ছুটাছুটী করিতে পারে, সেই জন্য শিক্ষকগণ ছুটির বন্দোবস্ত করিবেন; এবং খেলা ও বিশ্রামের ছুটি ব্যতীত বালকবালিকাদিগকে সকালে এক বা দুইবার, এবং বৈকালে এক বা দুইবার, প্রতিবারে তিন চারি মিনিট করিয়া দেহ সটান করিবার ও জোরে শ্বাসপ্রশ্বাস লইবার প্রণালী শিক্ষা দিবেন। এই সমুদয় ব্যায়ামের ফলে তাহাদের হৃৎস্পন্দন দ্রুত ও শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর ও দ্রুত হয়। তাহাতে তাহাদের মন অধিক কার্য্যক্ষম হয়।

ব্যায়াম করিবার দ্বাদশটী প্রণালী

প্রত্যেক ব্যায়াম আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গোড়ালি সংলগ্ন করিবার দুই পায়ের উপর সমান ভর রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। পায়ের গোড়ালির সহিত ৬০ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করিয়া শরীর সোজা রাখিয়া সম্মুখ দিকে কিঞ্চিৎ ঝুঁকিয়া দাঁড়াইবেন। গ্রীবাদেশ সম্পূর্ণ সোজা রাখিবেন এবং হাত দুইখানি দুই পার্শ্বে ঝুলাইয়া দিবেন, এবং ধীরে ও নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক অঙ্গ চালনা করিবেন। দ্রুত কিংবা অযত্ন পূর্ব্বক কোন অঙ্গ চালনা করিতে অগ্রসর হইবেন না। নিম্নলিখিত প্রথম তিনটী ব্যায়াম খুবই সহজসাধ্য।

প্রথম—আপনার হস্তদ্বয় দুইদিকে স্কন্ধ পর্য্যন্ত উত্তোলন করিয়া সমান্তরাল-ভাবে রাখিবেন। পরে উপরের দিকে উঠাইয়া পুনরায় আস্তে আস্তে নামাইয়া রাখিবেন। দ্বিতীয় — হস্ত দুইখানি উত্তোলনপূর্ব্বক কনুইদ্বয় পশ্চাদ্দিকে রাখিয়া উরুদেশে সংস্থাপন করিতে হইবে পরে হস্তদ্বয় নামাইয়া দুই পার্শ্বে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। তৃতীয়—পুনরায় হস্ত উত্তোলন করিয়া

কনুইদ্বয় ঈষৎ পশ্চাদ্দিকে রাখিয়া হস্তদ্বয় গ্রীবার পশ্চাতে নিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্পর্শ করিতে হইবে। এই সকল প্রণালীতে কয়েকবার অঙ্গ পরিচালনা করা আবশ্যক।

পরে নিম্নোক্ত প্রণালী অনুযায়ী অন্য প্রকার অঙ্গচালনা করিবেন :—

১ম অঙ্গচালনা—আপনার হস্তদ্বয় দুইদিকে সোজাভাবে স্কন্ধ পর্য্যন্ত উত্তোলন করুন। হস্তের করতল ভাগ উপরের দিকে রাখিয়া পশ্চাদ্দিকে যথাসম্ভব ঘুরাইতে হইবে, এইরূপে হস্ত ঘুরাইতে ঘুরাইতে আস্তে আস্তে ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত গণনা করিয়া ১২ ইঞ্চি পরিমিত একটী বৃত্ত করিতে হইবে। বাহু দৃঢ় রাখিয়া স্কন্ধের উপরে এইরূপ করিতে হইবে। পরে বিপরীতদিকে পুনরায় ১০বার এই প্রকার করিবেন। (১নং চিত্র দেখুন)।
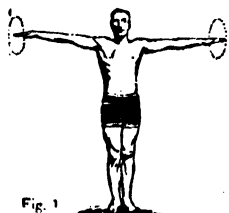
Fig. 1

২য় অঙ্গচালনা — পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে হস্ত উত্তোলন করুন। তৎপরে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে আপনার হস্তদ্বয় এরূপ উর্দ্ধে উঠাইতে হইবে যাহাতে উহাদের উপরে ৪৫ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয়, সঙ্গে সঙ্গে পায়ের গোড়ালিদ্বয়ও যথাসম্ভব উর্দ্ধে তুলিয়া দাঁড়াইবেন। পুনরায় আস্তে আস্তে প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পূর্ব্বাবস্থায় উপনীত হইবেন। অর্থাৎ হস্তদ্বয় ভূমির সহিত সমান্তরাল এবং পদদ্বয় ভূমিতে সংলগ্ন রাখিবেন। কিন্তু হস্ত যাহাতে ৪৫ ডিগ্রি অপেক্ষা উর্দ্ধে, কিংবা সমান্তরাল অপেক্ষা নিম্নে বা উর্দ্ধে না যায় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই প্রক্রিয়াটী ১০বার করিতে হইবে। (২নং চিত্র দেখুন)।
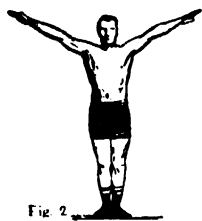
Fig. 2

Fig. 3

৩য় অঙ্গচালনা—পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক গ্রীবার পশ্চাদ্দিকে এমন ভাবে সংস্থাপন করুন যেন তর্জ্জনীদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন এবং কনুইদ্বয় পশ্চাদ্দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। এই অবস্থায় থাকিয়া উরুদেশের উপরাংশ আস্তে আস্তে সম্মুখ দিকে যথাসম্ভব বাঁকাইয়া দিবেন, এবং পুনরায় সোজা হইয়া, পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয়া পড়িবেন; কিন্তু এই সমস্ত অঙ্গচালনা যেন হঠাৎ কিংবা সত্বর সাধিত না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ চালনা করিবেন,—সম্মুখ দিকে অবনত হইবার পর আবার সোজাভাবে দণ্ডায়মান হইয়া পরে পশ্চাদ্দিকে অবনত

Fig. 4

হইবেন। ৫বার এই পদ্ধতিতে ব্যায়াম করিবেন। (৩নং চিত্র দেখুন)।

৪র্থ অঙ্গচালনা—পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পুনরায় হস্তদ্বয় পার্শ্বে বাড়াইয়া দিয়া ভূমির সহিত সমান্তরাল করুন। তৎপরে বাম হস্তের করতল ভাগ উর্দ্ধদিকে রাখিয়া যে পর্য্যন্ত না উহা শিরঃদেশের উপরে এবং দক্ষিণ হস্ত জানুর সহিত সংলগ্ন হয়, তাবৎ বাম হস্ত উঠাইবেন ও দক্ষিণ হস্ত নামাইবেন। এখন আস্তে আস্তে উরুদেশ হইতে শরীরের উপরাংশ দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে অবনত করিয়া, দক্ষিণ হস্ত জানুর সহিত ঝুলাইয়া দিউন; কিন্তু বাম হস্ত মস্তকের উপর হইতে ঘুরাইয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করুন। আবার পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় দণ্ডায়মান হউন, এবং অপর পার্শ্বে বাম হস্ত বাম পায়ের পার্শ্বে ঝুলাইয়া দিয়া দক্ষিণ হস্ত ঘুরাইয়া বাম কর্ণ স্পর্শ করুন; ৫বার এইরূপ করুন। (৪নং চিত্র দেখুন)।

Fig. 5

৫ম অঙ্গচালনা—(ক) পূর্ব্বের নিয়মে পুনরায় হস্ত তুলিয়া বাম পা দক্ষিণ পা হইতে ১২ ইঞ্চি দূরে স্থাপন করুন। তৎপরে কনুই হইতে হস্তের মুষ্টি নিম্ন দিকে বাঁকা করিতে থাকুন, এবং পুনরায় মুষ্টি উপরের দিকে রাখিয়া বাঁকা করিয়া বগলে সংস্থাপন করুন। ইতিমধ্যে মস্তকটী পশ্চাদ্দিকে অবনত করিয়া উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। পশ্চাদ্দিকে এইরূপে মস্তক নমন করিবার সময়ে জোরে শ্বাস গ্রহণ এবং পূর্ব্বাবস্থায় উপনীত হইবার সময়ে শ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিবেন। মস্তক সোজা এবং হস্ত ভূমির সহিত সমান্তরাল ভাবে থাকিবে। (৫নং চিত্র দেখুন)।

Fig. 6

(খ) পুনরায় বিশ্রাম না করিয়া হস্তের করতল নিম্নদিকে রাখিয়া সম্মুখ দিকে প্রসারিত করুন। পরে হস্তদ্বয় আস্তে আস্তে ঝুলাইয়া দিয়া উরুদেশের উর্দ্ধাংশ সম্মুখ দিকে বাঁকাইয়া এবং হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে প্রসারিত করিয়া যথাসম্ভব উর্দ্ধে উঠাইবেন। মস্তক সোজা এবং নজর সম্মুখ দিকে রাখিবেন। নিম্নদিকে অবনত হইবার সময়ে শ্বাস গ্রহণ এবং উপরের দিকে উঠিবার সময়ে শ্বাস ত্যাগ করিবেন। এই ব্যায়ামের প্রণালী (ক এবং খ) ৫বার অনুসরণ করিবেন। (৬নং চিত্র দেখুন)।

Fig. 7

৬ষ্ঠ অঙ্গচালনা—বাম পা হইতে দক্ষিণ পা ১২ ইঞ্চি পরিমিত ফাঁক করিয়া হস্তদ্বয় ভূমির সহিত সমান্তরাল করিয়া দাঁড়াইবেন। পরে গোড়ালি উত্তোলন পূর্ব্বক পায়ের অঙ্গুলির উপরে ভর রাখিয়া জানু অবনত করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে শরীরও যথাসম্ভব সোজা রাখিয়া প্রায় পায়ের

গোড়ালি পর্য্যন্ত নীচু করিতে থাকিবেন। ১০ বার এইরূপ করিবেন। (৭নং চিত্র দেখুন)।

৭ম অঙ্গচালনা—বাহুদ্বয় ভূমির সহিত সমান্তরাল করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। পরে উহা ঊর্দ্ধে মস্তকের উপরে এমন ভাবে সোজা করিয়া রাখিতে হইবে, যেন হস্তের অঙ্গুলিসমূহ পরস্পর আবদ্ধ এবং বাহুদ্বয় কর্ণের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। পরে অঙ্গুলি বদ্ধাবস্থায় ২৪ ইঞ্চি ব্যাস সহ একটী সম্পূর্ণ বৃত্ত অঙ্কিত করিতে এবং কেবল উরুদেশের ঊর্দ্ধাংশ বক্র করিতে হইবে ৫বার এইরূপ করিবেন। পুনরায় বিপরীত দিকে আর ৫বার এইরূপ করিবেন। উরুর উপরাংশ এইরূপে স্থির এবং ধীর ভাবে ঘুরাইতে হইবে। (৮নং চিত্র দেখুন)।

Fig. 8

৮ম অঙ্গচালনা—(ক) পায়ের মধ্যস্থলে দ্বাদশ ইঞ্চি পরিমিত ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। বাহুদ্বয় ভূমির সহিত সমান্তরাল রাখিয়া এবং মুখ বাম দিকে ফিরাইয়া উরুর উপরাংশও বাম দিকে ঘুরাইতে হইবে। এইরূপে ঘুরাইলে দক্ষিণ হস্ত সম্মুখ দিকে এবং মুখ ও বাম হস্ত পশ্চাদ্দিকে ঘুরিয়া যাইবে। (৯নং চিত্র দেখুন)।

(খ) এই অবস্থায় থাকিয়া সম্মুখদিকে উরু হইতে এমন ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িতে হইবে; যাহাতে দক্ষিণ হস্তে অঙ্গুলিগুলি দুই পায়ের মধ্যস্থলে ভূমি স্পর্শ করে এবং বাম হস্ত উপরের দিকে থাকে। কিন্তু এইরূপ করিবার সময়ে দক্ষিণ পা কিঞ্চিৎ বাঁকা করিতে হয়। পুনরায় বাম পা ১২ ইঞ্চি পরিমিত ফাঁক করিয়া দক্ষিণ দিকে এমন ভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইতে হইবে যেন বাম হস্ত সম্মুখ দিকে থাকে। পরে যে পর্য্যন্ত না অঙ্গুলিগুলি দুই পায়ের মধ্যস্থলে ভূমি স্পর্শ করে তাবৎ সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে হইবে। প্রতিবারে এইরূপ করিয়া পূর্ব্বাবস্থায় উপনীত হইতে হইবে। অর্থাৎ শরীর সোজা ও হস্ত ভূমির সহিত সমান্তরাল করিতে হইবে। এইরূপ চালনায় অভ্যস্ত হইলে আপনি একাদিক্রমে ইহা (ক এবং খ) করিতে পারেন।

Fig. 9

এইরূপে এই প্রক্রিয়া দুইটী (ক এবং খ) প্রথম দক্ষিণদিকে পরে বামদিকে ১০বার করিবেন। (১০নং চিত্র দেখুন)।

Fig. 10

৯ম অঙ্গচালনা—বাহুদ্বয় ভূমির সহিত সমান্তরাল করুন; পরে উহা ঊর্দ্ধে মস্তকের উপরে তুলিয়া শরীর উরু হইতে সম্মুখ দিকে বাঁকাইয়া বাহুদ্বয়

সম্মুখের এবং নীচের দিকে নামাইবেন, পরে দেহের দুই পাশ দিয়া হাত দুইখানি আস্তে আস্তে লইয়া গিয়া ৫ম ও ৬ষ্ঠ প্রণালী অনুযায়ী যতদূর সম্ভব উপরের ও পিছনের দিকে উত্তোলন করিবেন। স্মরণে

Fig. 11

রাখিবেন যে, যখন, শরীর সম্মুখ দিকে বক্র করেন তখন যেন মস্তক ঊর্দ্ধোন্মুখ এবং চক্ষের দৃষ্টি সম্মুখ দিকে থাকে, শরীর সম্পূর্ণ সোজা ও বাহুদ্বয় উপরের দিকে রাখিবেন। পরে উহা নামাইয়া ভূমির সহিত সমান্তরাল করিবেন। যখন এইরূপ করিবেন তখন যেন করতল ঊর্দ্ধদিকে, বাহু এবং স্কন্ধদ্বয় পশ্চাদ্দিকে ঝুঁকিয়া থাকে, পরে হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া পুনরায় এইরূপ করিতে থাকুন। এই সমুদয় চালনা আস্তে আস্তে ৫বার করুন। সম্মুখের দিকে ঝুঁকিবার সময়ে নিশ্বাস বাহির করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু শরীর সোজা করিবার সময়ে আবার শ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে। (১১নং চিত্র দেখুন)।

৮ম অধ্যায়

স্নায়ুমণ্ডল (Nervous system)

মানব শরীরে নানা প্রকার যন্ত্র রহিয়াছে। প্রত্যেক যন্ত্রেরই একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে। পাকস্থলী খাদ্যের পরিপাক কার্য্য, বৃক্কদ্বয় দূষিত ও বিষাক্ত পদার্থ নিঃসারণ, ত্বক্ দৈহিক উত্তাপের সমতা রক্ষণ, হৃৎপিণ্ড রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া করিতেছে। প্রত্যেক যন্ত্রেরই যথা সময়ে যথা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, এবং সমুদয় যন্ত্রই একযোগে কার্য্য করিতে থাকিবে, নতুবা শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু ঘটাইবে। অসংখ্য অঙ্গপ্রতঙ্গ সমন্বিত দেহকে এক দল সৈন্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। একদল সৈন্যের কেহ কেহ এক রকম কার্য্য করেন, অপর কেহবা অন্য রকম কার্য্য করেন, কিন্তু প্রত্যেককেই তাহার কার্য্য নিয়মিত সময়ে করিতে হয়; বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাহারা সকলে এক সঙ্গে এরূপ ভাবে কাজ করেন, যে মনে হয় যেন একজন লোক কাজ করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে এমন একজন লোকের প্রয়োজন, যিনি সমস্ত সৈন্যদলের এবং প্রত্যেক সৈন্যের কার্য্যের ব্যবস্থা ও পরিচালন করিবেন। সেইরূপ দেহেও এরূপ একজন থাকা প্রয়োজন, যিনি শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ নিয়মিত পরিচালিত করিবেন। স্নায়ুমণ্ডল এই নিয়ামক।

শরীরের সমুদয় অঙ্গপ্রতঙ্গ দ্বারা, ঠিক ভাবে ঠিক সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ কার্য্য করান স্নায়ুমণ্ডলের কার্য্য। আমরা যখন হাত দিয়া কোন বস্তু লইতে ইচ্ছা করি, স্নায়ুমণ্ডলই তখন হস্তের পেশীসমূহকে চালনা করে। যখন আমরা চলিতে ইচ্ছা করি, স্নায়ুমণ্ডলই তখন আমাদের পায়ের পেশীসমূহকে কার্য্যে নিযুক্ত করে। স্নায়ুমণ্ডলই ফুস্‌ফুস্, বৃক্কদ্বয়, হৃৎপিণ্ড, এবং যকৃৎকে কার্য্য করায়। শরীরের সমুদয় অংশই স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা চালিত; আমাদের চিন্তা করা, স্মরণ করা প্রভৃতিও স্নায়ুমণ্ডলের কার্য্যের অংশ।

স্নায়ুমণ্ডল প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জু। মাথার খুলির অস্থিময় পেটাবার মধ্যে মস্তিষ্ক সুরক্ষিত। মস্তিষ্কই একগাছি দীর্ঘ দড়ির মত হইয়া মেরুরজ্জুরূপে প্রসারিত। উক্ত রজ্জু কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় পুরু। এই মেরুরজ্জু মস্তিষ্কের নিম্নাংশে সংযুক্ত, ইহা একটী বৃহৎ রন্ধ্রের মধ্য দিয়া মাথার খুলি হইতে বাহির হইয়াছে। মেরুরজ্জুটী অতি আশ্চর্য্য উপায়ে সুরক্ষিত হইয়াছে। একটীর উপর আর একটী করিয়া পর পর চব্বিশখানি

মেরুদণ্ডের পর্ব্ব একত্র হইয়া সমস্ত মেরুদণ্ড রচিত করিয়াছে, এবং উক্ত পর্ব্ব-গুলির প্রত্যেকটার মধ্যে বৃহৎ ছিদ্র আছে। পর্ব্বগুলি পরে পরে সজ্জিত বলিয়া, উহাদের ছিদ্র একটার উপর আর একটা মিশ খাইয়াছে, তাহাতে মেরুরজ্জুটার উপযুক্ত একটা অস্থিময় নল হইয়াছে। মেরুরজ্জু, মেরুদণ্ড অতিক্রম করিয়া, কটিদেশের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।
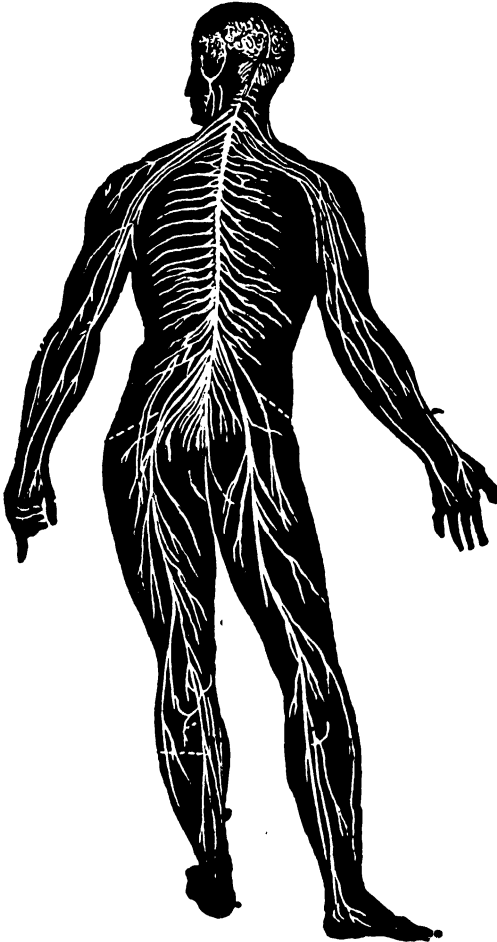
সাধারণ স্নায়ুমণ্ডল

মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জু হইতে বহু সংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু দেহের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে কতকগুলি রেশমের সূক্ষ্মতম তন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর। স্নায়ু সংখ্যায় এত অধিক এবং এরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট যে, আমাদের দেহে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম সূচিকাও বিদ্ধ করিয়া দিলে, অন্ততঃ একটী স্নায়ুকেও স্পর্শ করিবে না, ও তজ্জন্য বেদনা বোধ হইবে না।

স্নায়ুকোষ (Nerve cells) ও তন্তুসমূহ (Fibres)

মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জু টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত তন্তুবৎ পদার্থ দ্বারা উহারা গঠিত। ঐগুলিকে স্নায়ুতন্তু বলা হয়। প্রত্যেক স্নায়ু তন্তুর এক প্রান্তে ক্ষুদ্রগ্রন্থির মত একটী অংশ দেখিতে পাওয়া যাইবে। উহাকে স্নায়ুকোষ বলে। এই জাতীয় অধিকাংশ স্নায়ুকোষ, শুধু মস্তিষ্কে ও মেরু-রজ্জুতে রহিয়াছে; ইহাদের দ্বারা চিন্তা, স্মরণ, পেশীসমূহের সঞ্চালন, এবং সর্ব্বাঙ্গের পরিচালন সাধিত হইতেছে। তার দ্বারা যেরূপ রাজ-ধানীর প্রধান টেলিগ্রাফ্ অফিস ও দূরবর্ত্তী সহরের টেলিগ্রাফ্ অফিসের মধ্যে সংযোগ থাকে, ও সংবাদ যাতায়াত হয়, সেইরূপ স্নায়ুতন্তু দ্বারা মস্তিষ্ক বা মেরুরজ্জু ও দেহের অপরাপর অঙ্গের মধ্যে সংযোগ রহিয়াছে, এবং সংবাদ যাতায়াত হইতেছে।
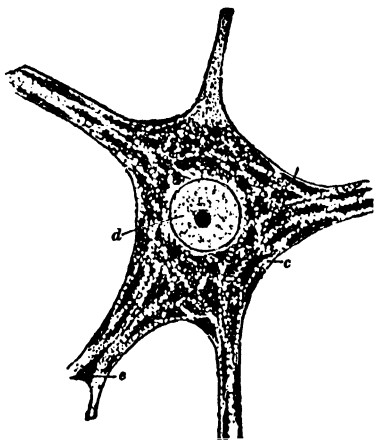
একটী স্নায়ুকোষ

মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জুর কার্য্য

মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জু কোন প্রদেশের রাজধানীর অফিসের লাট্সাহেবের ন্যায়, আর স্নায়ুসমূহ সমগ্র দেহে টেলিগ্রাফের তারের ন্যায়, উহারা যেন লাট্সাহেবের বাড়ীর সঙ্গে সমগ্র প্রদেশের প্রধান প্রধান সহরগুলি সংযুক্ত করিয়াছে। কোন সহরে কোন ঘটনা ঘটিবামাত্র অমনি লাট্সাহেবের বাড়ীতে তারযোগে সংবাদ পৌঁছে। তিনি আবার তৎক্ষণাৎ উক্ত তারের সাহায্যে সহরের প্রধান কর্ম্মচারীকে যাহা করিতে হইবে তাহা আদেশ করিয়া পাঠান।

মস্তিষ্ক যে শুধু অঙ্গসমূহ হইতে সংবাদ গ্রহণ করেন তাহা নহে, কিন্তু উহা দ্বারা অঙ্গসমূহে সংবাদ প্রেরিত, পেশীসমূহ সঞ্চালিত, এবং হৃৎপিণ্ড দ্রুত বা ধীর ভাবে স্পন্দিত হইয়া থাকে। আমাদের বেড়াইবার ইচ্ছা হইলে, মস্তিষ্ক অমনি পদদ্বয়ের পেশীসমূহকে পদদ্বয় চালনা করিবার হুকুম দেয়। চক্ষু হয়তো মস্তিষ্কে সংবাদ প্রেরণ করিল যে, অতি নিকটে একটী সাপ রহিয়াছে। মস্তিষ্ক অমনি অতি সত্বর দেহ চালিত করিবার জন্য পেশীসমূহকে আদেশ করিয়া, দেহকে স্থানান্তরিত করিবে। অঙ্গুলি হইতে স্নায়ু যদি মস্তিষ্কে ও মেরুরজ্জুতে এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, অঙ্গুলি কোন উষ্ণ বস্তু স্পর্শ করিতেছে, মস্তিষ্ক ও মেরু-রজ্জুই তখন বাহুর পেশীসমূহকে অঙ্গুলি সরাইয়া লইবার জন্য আদেশ করিবে। স্নায়ু না থাকিলে ঐ অঙ্গুলিটী পুড়িয়া গেলেও আমরা কিছু জানিতে পারিতাম না। এবং হয়ত একেবারে পুড়িয়া গেলেও উহাকে সরাইয়া লইতাম না।

মস্তিষ্ক চিন্তা করে, অনুভব করে ও স্মরণ করে। উহা ভালবাসে ও ঘৃণা করে। আমরা কি করিব ও কি বলিব, তাহা মস্তিষ্ক ঠিক করিয়া দেয়। উহা দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর কর্তৃত্ব করে। দেহের কোন স্থানের মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত স্নায়ুগুলি খণ্ডিত বা আহত হইলে, সেই স্থান অবশ হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ উহার কোন বোধশক্তি থাকিবে না, ও ঐ স্থান নাড়াচাড়া করা যাইবে না। যাহারা মদ্য পান করেন, অথবা চরিত্র দোষ হেতু যাহারা উপদংশ রোগ দ্বারা আক্রান্ত, তাহাদের অর্দ্ধেক অঙ্গ প্রায়শঃ অবশ হইয়া যায়; কারণ মদের বিষ এবং উপদংশের বিষ উভয়েই স্নায়ুতন্তুসমূহ নষ্ট করিয়া দেয়।

স্নায়ু বিধানের স্বাস্থ্যরক্ষা

স্নায়ু বিধানকে সুস্থ রাখিতে হইলে, সমস্ত শরীর সুস্থ ও সবল করিতে হইবে। স্নায়ু বিধানকে সুস্থ অবস্থায় রাখিবার নিমিত্ত উত্তম খাদ্য বিশুদ্ধ বায়ু, সুনিদ্রা এবং দেহ ও মনের উপযুক্ত ব্যায়াম প্রয়োজন।

সমগ্র দেহের ও স্নায়ু বিধানের স্বাস্থ্যের সহিত মনের অতিশয় নিকট সম্বন্ধ। আমরা উহার অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই; যেমন,—কোন ব্যক্তি লজ্জিত বা অপ্রতিভ হইলে স্নায়ুগুলি ত্বকের রক্তবহানাড়ীসমূহ প্রসারিত করিয়া দেয়, এবং মুখমণ্ডলের ত্বক লাল হইয়া উঠে। কোন প্রকার উত্তেজনা হইলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বর্দ্ধিত হয়। ভীত হইলে, স্নায়ুসমূহ স্বেদগ্রন্থি দ্বারা, শরীর উত্তপ্ত না হইলেও ঘর্ম্ম উৎপন্ন করায়। মনে বিষম আঘাত লাগিলে, মূর্চ্ছা হইতে পারে। কেহ ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত হইলে ক্রমাগত কয়েক দিন হয়ত সে কিছু না খাইয়াই কাটাইতে পারে, অথচ তাহার মোটেই ক্ষুধা বোধ হয়

না। মনে স্ফূর্ত্তি থাকিলে বেশ ক্ষুধাও হয়; এবং দেহের সকল অঙ্গ ভালরূপ কার্য্য করে। এই সমুদয় হইতে শরীরের উপরে মনের প্রভাব বুঝা যায়। সুস্থ দেহ এবং সুস্থ স্নায়ু বিধান লাভ করিতে হইলে হৃদয়ে পবিত্র চিন্তা পোষণ করা কর্ত্তব্য। কু-চিন্তা পোষণে মন এরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হয় যে, পরিণামে উন্মাদ রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

মন আছে বলিয়াই, মনুষ্য অন্যান্য ইতর প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; মন আছে বলিয়াই, মনুষ্য ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে পারে। প্রাণী জগতে একমাত্র মানুষই মনের অধিকারী, এবং এই নিমিত্ত শুধু মানুষই পরমেশ্বরের সেবা ও আরাধনা করিতে পারে। মনুষ্যের মন উচ্চ ও পবিত্র চিন্তা দ্বারা পূর্ণ থাকিবে, এই জন্যই ঈশ্বর মানুষকে মনোরূপ সম্পদ দান করিয়াছিলেন। সকল প্রকার জ্ঞান আহরণ করিয়া মানুষ তাহার মনের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখিবে, এই উদ্দেশ্যে ঈশ্বর মানুষকে মন দিয়াছেন। মনকে সুপথে চালিত করিয়া ঈশ্বরের সঙ্কল্প অনুযায়ী কার্য্য করা, মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। আপনার মনকে সুসংযত করুন; মনে কোন প্রকার ক্রোধের স্থান দিবেন না, কারণ বিষ যেরূপ দেহ বিষাক্ত করে, ক্রোধ সেইরূপ মনকে বিষাক্ত করে। দেশজয়ী অপেক্ষা আত্মজয়ী শ্রেষ্ঠ; জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের বিষয় চিন্তা করিয়া, এবং তাঁহার ইচ্ছামত মনকে চালিত করিয়া, আমরা সর্ব্বোত্তম উপায়ে মনের বিকাশ সাধন এবং প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা মনকে পরিপূর্ণ করিতে পারি। এই ভাবে মনকে চালিত করিতে হইলে, বাইবেলগ্রন্থে প্রকাশিত ঈশ্বরের ভাবরাশি পাঠ করিতে হইবে।

অভ্যাস

শিশুর স্নায়ুমণ্ডল একবারও ভাজ করা হয় নাই, একটীও ভাজের দাগ নাই, এরূপ নূতন পোষাকের মত। কয়েকবার ভাজ করিতে পোষাকে ভাজের দাগ পড়ে এবং সেই দাগে দাগে ভাজ করা সহজ, কিন্তু নূতন দাগ সৃষ্টি করিয়া ভাজ করা শক্ত। শিশুদিগের স্নায়ুমণ্ডলও তদ্রূপ। একই ভাবে কয়েকবার ভাজ করিলে, কাপড়ে যেরূপ দাগ পড়ে, শিশুও যখন হইতে ভাবিতে, কথা কহিতে ও কার্য্য করিতে শিখে, তখন হইতে তাহার মস্তিষ্কের অভ্যাস গঠিত হইতে থাকে। তখন হইতেই সে যেরূপভাবে ভাবিতে, কথা বলিতে ও কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হয়, সেইরূপভাবে ভাবা, কথা বলা ও কার্য্য করা, তাহার পক্ষে সহজ হইয়া দাঁড়ায়, ইহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা তাহার পক্ষে কঠিন।

যখন আমরা প্রথমে কোন নূতন কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করি,—মনে করুন যেন কোন বাদ্য যন্ত্র বাজান,—প্রথমে আমাদের সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ প্রয়োজন;

কিন্তু যখন আমরা ঐ কার্য্য পুনঃ পুনঃ করি, তখন আমরা এরূপ অভ্যস্ত হই যে, আমাদের ভাবিতেও হয় না যে আমরা তাহা করিতেছি। যিনি কোন বাদ্য যন্ত্র বাজাইতে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি বাজাইতে বাজাইতে অপর বিষয় দেখিতে এবং ভাবিতে পারেন।

আমরা যাহাই করি, ভালই হউক, মন্দই হউক, প্রায় সকলই আমাদের অভ্যাস হইয়া যায়। কেহ কেহ মনকে এরূপ অভ্যস্ত করিতে পারেন যে, কেবল সৎ বিষয়ই তাহাদের অভ্যাস হইয়া যায়; কাহারও বা পুনঃ পুনঃ কু-চিন্তা ও কু-কার্য্য করিয়া, কু-অভ্যাস গঠিত হয়। পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইবার পূর্ব্বে, প্রায় আমাদের সমস্ত অভ্যাস দৃঢ় হইয়া যায়; অতএব বালক ও যুবকদিগের নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া কত প্রয়োজন। তাহাদিগকে সত্য, সৎ, ন্যায় এবং পবিত্র বিষয় সমূহ চিন্তা করিতে দেওয়া উচিত। এই ভাবে মহৎ চরিত্র গঠিত হয়। যদি উত্তম শারীরিক ও মানসিক অভ্যাস গঠিত হয়, অতি সহজে রোগের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে, এবং কার্য্যক্ষম দীর্ঘজীবন লাভ আরও সম্ভব হইবে।

১৩শ অধ্যায়

চক্ষু ও কর্ণ

চক্ষু একটী আশ্চর্য্য যন্ত্র। দৃষ্টিপথে যাহা পড়ে, চক্ষুর স্নায়ুসমূহ মস্তিষ্ককে তাহারই সংবাদ জ্ঞাপন করে। চক্ষুদ্বয় অতি সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, তাই করোটীর সম্মুখভাগে দুইটী গহ্বরের মধ্যে, চক্ষুর পাতা, পিছি ও ভ্রূ দ্বারা উহা যথাস্থানে সুরক্ষিত রহিয়াছে।

অন্ধের অপেক্ষা আর কাহারও দুঃখ অধিকতর শোচনীয় নহে। তাহারা ইচ্ছানুযায়ী যাতায়াত করিতে, বা তাহাদের ঈপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। তাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী প্রায় কোন উপায়ই নাই, এবং এই জন্য তাহাদের অনেকেই ভিখারী হয়। জগতের কোন সুন্দর বস্তুই তাহারা দেখিতে পায় না, সারা জীবন যেন গাঢ়তম অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে আবদ্ধ থাকে। তাহারা পড়িতে পায় না, অতএব শিক্ষা পাওয়া, তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা. কঠিন। কাজেই যাহাতে আমরা, চক্ষু নষ্ট হইয়া, অন্ধ হইয়া না যাই, এ জন্য আমাদের সকলেরই কি প্রকারে চক্ষু রক্ষা করিতে হয়, জানা উচিত।

চক্ষু ভাল রাখিবার উপায়

শিশুদিগের চক্ষুর বিশেষভাবে যত্ন লওয়া উচিত। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বোরাসিক এ্যাসিড্ দ্বারা উহাদের চক্ষু ধৌত করিতে হয়। (৫০শ অধ্যায়ের ১নং ব্যবস্থাপত্র এবং ২৩শ অধ্যায়ের উপদেশ দ্রষ্টব্য)। নিদ্রিত শিশুর চক্ষে মাছি বসিয়া রোগ বিস্তার করিতে না পারে, তজ্জন্য মশারী টাঙ্গাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মকালে প্রায় সর্ব্বত্র, শিশুদিগের চক্ষু রুগ্ন ও পিচুটিতে পরিপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমুদয় রুগ্ন চক্ষুর উপর মাছি পড়িয়া দূষিত পিচুটি পায়, উহাদের পায়ে উহার কিয়দংশ লাগিয়া যায়। তারপর যে শিশুর কোন চক্ষু রোগ নাই, তাহার চক্ষে গিয়া পড়ে। এইরূপে উহাদের পায়ে বাহিত ময়লা উক্ত শিশুর চক্ষে প্রবেশ করিলে চক্ষু রোগ হয়। এইরূপে একটী শিশুর চক্ষু রোগ আরও প্রায় বিশ, পঞ্চাশ বা শতাধিক শিশুকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

বালকবালিকাদিগের পাঠগৃহে প্রচুর আলোকের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহাদের পড়িবার ঘরে এরূপ আসন দেওয়া কর্ত্তব্য, যেন তাহাদের পায়ের ভার মেজের উপরে পড়ে, আর সম্মুখস্থ টেবিল এরূপ হইবে, যে, আসনে সোজা হইয়া বসিয়া পড়িবার সময় টেবিলে বই রাখিলে পুস্তকের অক্ষর
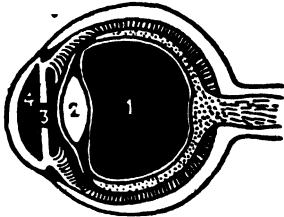
উপরের চিত্র :—1. চক্ষুর তারা 2. চক্ষুর তারাবেষ্টক রঞ্জিত গোলাকার চর্ম্ম।
নিম্নের চিত্র :—1. চক্ষু-মধ্যস্থ তরল বস্তু 2. উভপৃষ্ঠ কুব্জ কাচখণ্ডবৎ পদার্থ (লেন্স) 3. চক্ষুর তারা 4. চক্ষুর সম্মুখবর্ত্তী কুঠরী।
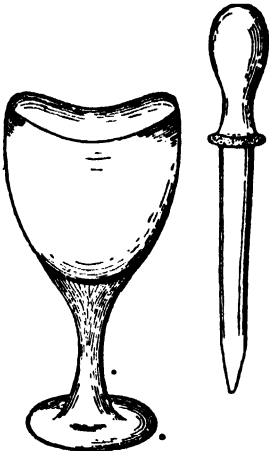
চক্ষু হইতে এক ফুট দূরে থাকে। বালকবালিকাদিগের পাঠ্যপুস্তকের অক্ষরগুলি বেশ বড় ও পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। হাম বা বসন্ত রোগের পর, চক্ষু দুর্ব্বল হয় বলিয়া কয়েক সপ্তাহ বালকবালিকাদিগকে স্কুলে যাইতে দেওয়া উচিত নহে।

চক্ষুতে কিছু পড়িলে, আঙ্গুল বা ময়লা কাপড় দিয়া উহা রগড়ান উচিত নহে; ইহাতেও চক্ষু রোগাক্রান্ত হয়, কারণ সকল প্রকার ময়লাই আঙ্গুলে লাগে, এবং কাপড়েও পিচুটি উৎপন্ন করিবার জীবাণু সর্ব্বদাই থাকে, এই জীবাণু প্রবেশ করিলে চক্ষু শীঘ্রই জ্বালা করিতে ও বেদনা করিতে আরম্ভ করে; চক্ষু লাল হয়, এবং জল পড়ে, ও অল্পকালের মধ্যেই পিচুটি জমিতে আরম্ভ করে। প্রাতে চোখের কোনে অনেক পিচুটি জমিয়া থাকে। এই জন্য ময়লা কাপড় বা ময়লা রুমাল দিয়া কখন চক্ষু রগড়ান উচিত নহে। চক্ষে ধূলি বা অন্য কোন ময়লা পড়িলে, কয়েক ফোঁটা বোরাসিক্ এ্যাসিড্ দিয়া উহা বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে (২০শ অধ্যায়ের ১নং ব্যবস্থা পত্র দেখুন)। চক্ষে আবর্জ্জনা পড়িলে যদি বোরাসিক্ এ্যাসিড্ সংগ্রহ করিতে না পারেন, তবে কাপড় বা রুমাল দিয়া না ঘসিয়া চক্ষে পরিষ্কার জল দিবেন।

মদ, তামাক ও গাঁজা ব্যবহারেও চক্ষুর বিষম ক্ষতি হয়। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে মদ্যপায়ী ও গাঁজাখোরদের চক্ষু সর্ব্বদাই লাল থাকে, এবং তামাক সেবীদের চক্ষু হলদে থাকে। ঐ তিনটী মাদক দ্রব্যের যে কোন একটী ব্যবহার করিলেই, দৃষ্টি শক্তির হানি হইবে।

চক্ষু মর্জ্জনের পাত্র
চক্ষে ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র

ব্যাধি ও অনিষ্ট সাধন হইতে চক্ষু দুইটীকে রক্ষা করিতে হইলে, পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত নিম্নে যে কয়েকটী বিধি প্রদত্ত হইল, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। ক্ষীণ আলোকে কখনও পাঠ করা, অথবা সূচি-শিল্পের ন্যায় কোন সূক্ষ্ম কাজ করা উচিত নহে।

২। আলোকের দিকে মুখ করিয়া পড়িতে বসিবেন না; আলোক যেন পশ্চাদ্দিক হইতে স্কন্ধের উপর দিয়া পুস্তকের উপরে পতিত হয়।

৩। গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ বা কোন কার্য্য করিতে হইলে মাঝে মাঝে কয়েক সেকেণ্ড চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া, অথবা জানালার বাহিরে সুদূর আকাশের দিকে, অথবা সবুজ ঘাস বা বৃক্ষের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত।

৪। ধূলিকণা বা অপর কিছু চক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিলে, চক্ষু না রগড়াইয়া বোরাসিক্ এ্যাসিড্ দ্বারা ধুইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। হাতের কাছে বোরাসিক্ এ্যাসিড্ না পাইলে, নির্ম্মল সিদ্ধ জল ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৫। অপরের ব্যবহৃত তোয়ালে, সাবান, প্রক্ষালন-পাত্র বা গামছা ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ ঐ সমুদয় যাহারা পূর্ব্বে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাদের হয়ত চোক্ উঠিয়াছিল; সুতরাং উহা ব্যবহারে কোন প্রকার চক্ষু-রোগ হইবারই সম্ভাবনা।

৬। ধূম চক্ষুর পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর। ধূম নির্গমনের জন্য, উনানের উপর যদি চিমনী সংলগ্ন না থাকে, সমস্ত বাড়ী বিরক্তিকর ধূমে পরিপূর্ণ হয়। দিনের পর দিন যখন দুই বা তিন বার করিয়া এইরূপ হইতে থাকে, ইহার দ্বারা পরিবারের প্রত্যেকের চক্ষের হানি হয়। অতি অল্প ব্যয়েই রান্নাঘরে ধূম নির্গমনের পথ প্রস্তুত করিয়া এই অশান্তি ও ক্ষতি নিবারিত করা যায়।

কর্ণের স্বাস্থ্য-বিধি

এই অধ্যায়ে কর্ণের যে চিত্র আছে, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, উহা তিন ভাগে বিভক্ত। মস্তকের বহির্ভাগে আমরা যে অংশ দেখি তাহা কেবল কর্ণের মধ্যস্থলে ও অভ্যন্তরে শব্দ বহিবার জন্য চুঙ্গীর কাজ করে। কর্ণের মধ্যমাংশ গলার সহিত একটী ক্ষুদ্র নল দ্বারা সংযুক্ত। এই সূক্ষ্ম নলটী রুদ্ধ হইলে বধিরতা জন্মে। সর্দ্দি লাগিয়া নাসিকায় ও কণ্ঠে শ্লেষ্মা জমিলে, কণ্ঠের ও পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম নলের আবরণী স্ফীত হইয়া, নলটী বন্ধ হইয়া যায়। ইহা একটী বধিরতার কারণ।

উক্ত সূক্ষ্ম নল রোগদুষ্ট হইলে, কর্ণের মধ্যভাগ ও দূষিত হইয়া যায়। কর্ণাভ্যন্তরে পুঁজ সঞ্চিত হইলে, কর্ণে বেদনা হয়। অধিকমাত্রায় পুঁজ সঞ্চিত হইলে উক্ত পুঁজ কর্ণপটহের (Tympanic membrane) উপরে চাপ দিয়া উহা ছিঁড়িয়া দিতে পারে; তাহা হইলে কর্ণের মধ্য হইতে পুঁজ বাহির হইতে দেখা যায়। (৪৪শ অধ্যায়ে উক্ত ব্যাধির চিকিৎসা প্রণালী দ্রষ্টব্য)।

কর্ণের যত্ন লইতে হইলে, নিম্নলিখিত উপদেশগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।

১। কর্ণমল (Ear wax) কর্ণের এক মহা উপকার সাধন করে। উহার স্বাদ অতিশয় তিক্ত বলিয়া কোন পোকা—সহসা কর্ণের মধ্যে উড়িয়া না

1. কানের হাড় 2. কর্ণের মধ্যমাংশের ক্ষুদ্রাস্থি বিশেষ 3. কর্ণ কুহরের গহ্বর বিশেষ এবং কর্ণাভ্যন্তরের অংশ বিশেষ 4. কর্ণের মধ্যমাংশ ও গলদেশের সংযোজক নল 5. কর্ণের মধ্যমাংশ 6. কর্ণ পটহ 7. হাড়।
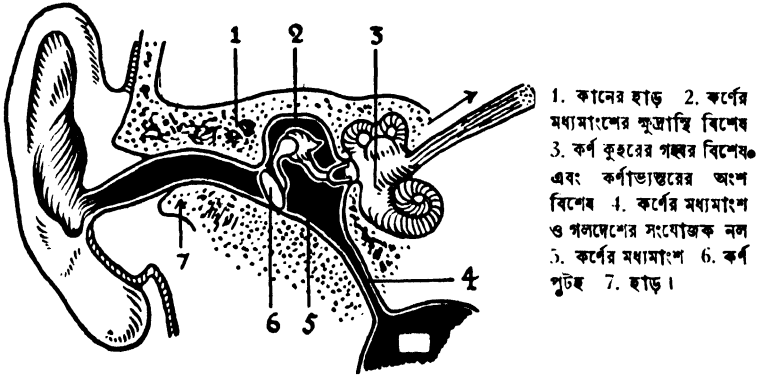
গেলে—কখনও স্বেচ্ছায় প্রবেশ করে না। এই কর্ণমল খুঁটিয়া বাহির করা উচিত নহে। কানের মল যদি শক্ত হইয়া শুনিবার পক্ষে অসুবিধা ঘটায়, তাহা হইলে ৪৪শ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপে উহা বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। কানের মধ্যের লোমও পোকা মাছি প্রভৃতি ও ধূলির পথ অবরোধ করে। এই লোম যেন নাপিত দিয়া তুলিয়া ফেলা না হয়।

২। কর্ণ মধ্যে কোন পোকা প্রবেশ করিলে, কয়েক ফোঁটা গরম তিলের তৈল, বা অপর কোন বিশুদ্ধ তৈল ঢালিয়া দিবেন। ইহাতে পোকা বাহির হইয়া আসিবে, অথবা মরিয়া যাইবে, মরিয়া গেলে পিচকারীতে একটু উষ্ণজল লইয়া উহা অনায়াসেই বাহির করা যাইতে পারে।

৩। খুব জোরে নাসিকা ঝাড়া উচিত নহে। কারণ তাহাতে নাসিকা ও কণ্ঠের জীবাণুগুলি কর্ণের সূক্ষ্ম নলের মধ্য দিয়া, কর্ণের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে, ফলে বধিরতা জন্মে।

৪। কোন শিশুর কাণে চপেটাঘাত করিবেন না, কাণে বিষম আঘাত লাগিলে বধিরতা জন্মিতে পারে।

১৪শ অধ্যায়

প্রজনন ক্রিয়া, ও যৌন স্বাস্থ্য-বিধি

(বিশেষতঃ পুরুষের পক্ষে)

এই পুস্তকে সন্তানোৎপাদন ও যৌন স্বাস্থ্য-বিধি সম্বন্ধে আলোচিত হইবার কারণ এই যে, উক্ত বিষয়ের অজ্ঞতা বহু কঠিন ব্যাধির, এবং মানব চরিত্রের অবনতিকর অপকৃষ্ট কয়েকটী পাপের কারণ।

পনের কি ষোল বৎসর বয়ঃক্রম কালে, বালকের শরীরে বিভিন্ন পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। তখন তাহার বয়ঃসন্ধিকাল, অর্থাৎ প্রথম যৌবন (Age of puberty)। তখন পর্য্যন্তও তাহার সম্পূর্ণ বৃদ্ধিলাভ হয় নাই; কারণ যুবকের সম্পূর্ণ বৃদ্ধি পাইতে, ইহার পর সাধারণতঃ আরও প্রায় আট বৎসর প্রয়োজন। সুতরাং চব্বিশ কি পঁচিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে, বিবাহ করিবার বা সন্তানের পিতা হইবার উপযুক্ত শারীরিক বা মানসিক শক্তি কাহার থাকে না।

প্রথম যৌবনে বালকের দেহে নানারূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়,—তখন মুখমণ্ডলে, বগলে, এবং বস্তিপ্রদেশে লোমসমূহ উদ্গত হইতে আরম্ভ করে, কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন ঘটে; জননেন্দ্রিয় আকারে বর্দ্ধিত হয় এবং অণ্ডকোষে সন্তানোৎপাদনকারী শুক্র জন্মাইতে আরম্ভ করে।

মাতাপিতা ও শিক্ষকগণ এই সময়ে উপযুক্ত সুশিক্ষা না দিলে, ও যত্ন না করিলে, এই বয়সেই বালকদিগের কু-অভ্যাস অভ্যস্ত হইবার ভয়। বালকদিগকে অধিকক্ষণ ফাঁকা জায়গায় খেলিতে বা কার্য্যরত রাখিতে হইবে। তাহাদের মাতাপিতার কার্য্যের সাহায্য করা উচিত। কখনও বালকদিগকে কুসঙ্গে মিশিতে দেওয়া উচিত নহে। তাহাদিগকে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করিতে অবহেলা না করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। বালকদিগকে সত্য ঈশ্বরের উপাসনা ও জ্ঞান লাভ করিতে চালিত করা, এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাইবেল প্রতিদিন পাঠ করিতে উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক। চরিত্র গঠন কল্পে, যুবকের প্রতি বাইবেলের সদুপদেশের সহিত অপর কোন উপদেশের তুলনা হইতে পারে না।

পুংজননেন্দ্রিয়ের গঠন প্রণালী ও জীবতত্ত্ব

শরীরের বহির্ভাগে পুংজননেন্দ্রিয়ের দুইটী অংশ,—লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ (Scrotum)। অণ্ডকোষের অভ্যন্তরে দুইটী অণ্ড বা বীচি রহিয়াছে। লিঙ্গের অগ্রভাগে প্রায় এক ইঞ্চিপরিমিত স্থান, স্থূল ও গোলাকার। উহাকে গ্লান্স

(Glands) বলে। একখানি শিথিল ত্বক্ দ্বারা উক্ত স্থূলাকার অংশ আবৃত, এবং ঐ ত্বক্ পশ্চাদ্দিকে টানিয়া লওয়া যাইতে পারে। উহাকে লিঙ্গের অগ্রত্বক্ বা আবরণত্বক্ (Prepuce) বলে। আবরণত্বক্কে লিঙ্গ-মুণ্ডের উপর হইতে টানিয়া লওয়া সম্ভব না হইলে, অস্বাভাবিক কোনও কারণ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তাই অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাকিয়া উহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আবরণত্বকের নীচে, এক প্রকার সাদা গাঢ় তরল পদার্থ সঞ্চিত হয়, মাঝে মাঝে উহা ধুইয়া না ফেলিলে, দুর্গন্ধ ও চুলকানি হয়। সাধারণতঃ লিঙ্গমুণ্ড অপরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত উৎপন্ন চুলকণার জন্যই বালকগণ হস্তমৈথুন করিতে শিখে।
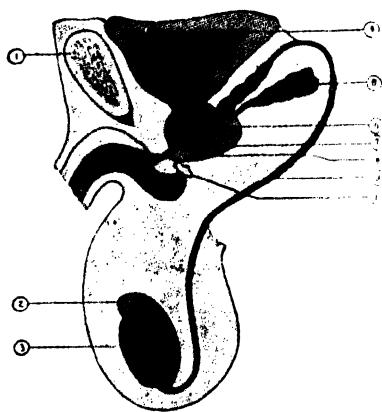
1. বস্তির নিম্নাস্থি 2. অণ্ডকোষের পশ্চাৎস্থিত অংশ (Epididymis) 3. অণ্ডকোষ 4. মূত্রাশয় 5. রেতঃকোষ 6. রেতঃপ্রণালীর সংলগ্ন নালী (Ejaculatory Duct) 7. মূত্রদ্বার 8. গ্রন্থি (Prostate Glands) 9. রেতঃনালী 10 মূত্রদ্বারিক গ্রন্থি (Bulbo-urethral Gland)।

অণ্ডকোষ নামক চর্ম্মথলির মধ্যস্থ অণ্ড দুইটী শুক্র-কীট উৎপন্ন করে। এই শুক্র-কীটগুলি এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। রেতঃপাতের সময়ে ঐ সকল শুক্র-কীট, রেতঃপ্রণালীর (Seminal duct) মধ্য দিয়া মূত্রপথে পৌঁছিয়া থাকে, এবং পরে উহা লিঙ্গ হইতে বহির্গত হয়। স্ত্রীসঙ্গমকালে, স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে এই শুক্রকীটগুলিই নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। শুক্রকীটগুলির যে কোন একটী যদি স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে নির্গত স্ত্রীশুক্রের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা তৎক্ষণাৎ বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে, এবং দুইশত আশি দিন পরে উহা একটী সম্পূর্ণ পরিণত শিশু হয়।

রেতঃপাত

মূত্রদ্বারের সহিত দুইটী গ্রন্থি সংযুক্ত রহিয়াছে; প্রথম যৌবন হইতে উক্ত গ্রন্থিদ্বয়ে, একপ্রকার গাঢ় শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থ অল্পাধিক পরিমাণে নিয়তই উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যবান, অবিবাহিত ও নির্ম্মল চরিত্র যুবকের, প্রতি দশ বা পনের দিন অন্তর উক্ত গ্রন্থিদ্বয় হইতে সাধারণতঃ আপনা আপনি রেতঃপাত হইয়া থাকে। কোন কোন যুবকের মাসে একবার অথবা দুই বা তিন মাস অন্তর একবার ঐরূপ ঘটিতে পারে। এইরূপ বীর্য্যস্খলন প্রায়শঃই রাত্রিকালে

নিদ্রিতাবস্থায় কখন কখনও বা স্বপ্নের ঘোরে হইয়া থাকে, তাই ইহাকে স্বপ্নদোষ বলা হয়। ইহা কিছুই অস্বাভাবিক নহে, সুতরাং যুবকদের ইহাতে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। বাজারের পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনে উক্ত রেতঃপাতকে শক্তি হানির বা ধাতুদৌর্ব্বল্যের কারণ প্রভৃতি কত কি বলে, কিন্তু ঐ সকল কথা ঠিক নহে। ঐ প্রকার স্বপ্নদোষ দশ দিনের কম অন্তর অন্তর হইতে থাকিলে, এবং তৎসঙ্গে মাথাধরা ও পরদিবস অবসাদ বোধ হইলে, উহা অস্বাভাবিক বুঝিতে হইবে; তাহা হইলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য। যে স্বাভাবিক রেতঃপাতের বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইল তাহা যে সকল যুবক পবিত্র জীবন যাপন করেন, কোন আদিরসাত্মক পুস্তক পাঠ, কোন প্রকার অশ্লীল চিত্র দর্শন, অথবা অন্তরে অশ্লীল চিন্তা পোষণ করেন না, সেই সকল যুবকেরই হইয়া থাকে। হস্তমৈথুন ও অশ্লীল পুস্তক পাঠ করিবার ফলে স্বপ্নদোষ ঘটিয়া শক্তি হানি করে এবং উহা বড়ই বিপজ্জনক।

সংযম

অবিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে কামোপভোগ হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকাই সংযম। বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে সংযম বলিতে অতিরিক্ত সঙ্গমেচ্ছা হইতে আত্মদমন করা বুঝাইয়া থাকে। প্রত্যেক যুবকের সংযমী হওয়া কর্ত্তব্য। বিবাহের পূর্ব্বে প্রত্যেক সুস্থ-দেহ যুবকের মাঝে মাঝে প্রবল ইন্দ্রিয়-লালসা জন্মে, কিন্তু শরীর সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে, সংসারে সুখী এবং কাজের লোক হইতে হইলে, এবং সাধ্বী স্ত্রী ও সবল সন্তান লাভ করিতে হইলে, ইচ্ছা-শক্তির চালনা করিতে হইবে। বহু যুবক ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া, হস্তমৈথুন, বা অবৈধ স্ত্রী গমন করিয়া থাকেন। ঐ উভয় প্রকারেই তাহারা আপন আপন অবনতি সাধন করেন।

হস্তমৈথুন

হস্তমৈথুন পাপপঙ্কিল অভ্যাস। বালকেরা প্রায় শৈশবেই ইহা শিক্ষা করে। কখন কখন যে বালকের রক্ষণাবেক্ষণ করে, সে বালকের জননেন্দ্রিয় ধরিয়া নাড়াচাড়া করিয়া বালককে আমোদ দেয়। পরে বালক নিজেই ঐরূপ করে; এবং এইরূপে শেষে তাহার হস্তমৈথুন অভ্যাস হইয়া যায়। পিঠে ঝুলাইয়া অথবা কটীদেশে বসাইয়া, শিশুদিগকে বহন করিলে তাহাদের শিশ্ন ঘর্ষিত হইতে থাকে; অনবরত ঘর্ষণের ফলে উহার উক্ত কু-অভ্যাসের প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। বালকেরা অনেক সময়ে বিদ্যালয়ের কু-সঙ্গীদের নিকট হইতেও উহা শিক্ষা করে। আর আবরণত্বক্ দীর্ঘ হইলে বা উহা টানিয়া সরান না গেলে উহার অগ্রভাগ চুলকাইতে থাকে; ক্রমাগত চুলকাইতে চুলকাইতে বালক

হস্তমৈথুন করিতে শিখে। এই জন্য কোন বালককে, তাঁহার শিশ্নদেশ চুলকাইতে বা ঘষিতে দেখিলে তাহাকে কোন চিকিৎসকের নিকটে লইয়া গিয়া প্রয়োজন হইলে তাহার লিঙ্গের অগ্রত্বক্ ছেদন করা উচিত। রক্তবাহী কোন নাড়ী কাটিয়া, কয়েক ছটাক রক্ত বাহির করিয়া দিলে যেমন তাহার সহিত কিছু আয়ু এবং শক্তি ফেলিয়া দেওয়া হয়, সেইরূপ কোন যুবক যতবার হস্তমৈথুন করেন, ততবারই তাহার কতকটা আয়ু ও শক্তি তিনি ফেলিয়া দেন। প্রত্যেকেই জানেন যে প্রত্যহ শরীর হইতে কিছু পরিমাণ রক্ত ফেলিয়া দিলে, শরীরের বিষম ক্ষতি হয়, এবং পরমায়ু কমিয়া যায়, কিন্তু হস্তমৈথুনের কু-ফল ইহা অপেক্ষাও বিষময়; কেননা উহাতে নৈতিক অধঃপতনও ঘটে। যিনি হস্তমৈথুন করেন, তাহার নিজের প্রতি কোন শ্রদ্ধা থাকে না; অনুতপ্ত হৃদয়ে এই কু-অভ্যাস ত্যাগ না করিলে, তিনি কখনই সংসারে কাজের লোক হইতে পারেন না। হস্তমৈথুন হইতে কোন বালককে বিরত করিতে হইলে, সাধারণতঃ সর্ব্বপ্রথমে তাহার ত্বক্চ্ছেদ করা প্রয়োজন হয়।

অবৈধ স্ত্রীগমন

অবৈধ স্ত্রীগমন অপেক্ষা ভীষণ ক্ষতিকর ও নিকৃষ্ট পাপ মানুষের আর নাই। প্রথমতঃ উহা সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য নৈতিক পাপ; উহা পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কেই পশুত্বের নিম্নতমস্তরে পাতিত করে। অবৈধ দার গমন এরূপ পাপ যে উহার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি হওয়া আবশ্যক; রতিক্রিয়া ঘটিত ব্যাধিসমূহ ঐ শাস্তির অঙ্গবিশেষ, কেননা কেবল অবৈধদারগমনেই উহার উৎপত্তি। অনেক সময়ে শুধু একবার মাত্র উক্ত পাপ করায়, বহু বৎসর ব্যাপী ঐরূপ সাংঘাতিক রোগ ভোগ করিতে হয়। বিষাক্ত ক্ষত, গণোরিয়া (মেহ), গর্মী, প্রভৃতি কুৎসিত ব্যাধি পরদারগমনের ফল। ৪১শ অধ্যায়ে ঐ সমুদয় রোগের বিষয় আলোচিত হইবে।

এই ভীষণ পাপ সম্বন্ধে করুণাময় পরমেশ্বর মানবজাতিকে সতর্ক করাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "তোমরা ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না; কেননা মনুষ্য যাহা কিছু বুনে তাহাই কাটিবে। ফলতঃ আপন মাংসের উদ্দেশ্যে যে বুনে, সে মাংস হইতে ক্ষয়রূপ শস্য পাইবে।" (গালা ৬ : ৭,৮)

বেশ্যাদিগের সম্বন্ধে বাইবেলে একস্থানে লিখিত আছে: "সে অনেককে আঘাত করিয়া নিপাত করিয়াছে, তাহার নিহত লোকেরা বৃহৎ দল। তাহার গৃহ পাতালের পথ, যে পথ মৃত্যুর অন্তঃপুরে নামিয়া যায়।" (হিতো ৭ : ২৬, ২৭)।

কুৎসিত কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে অবশ্যই মনে কুৎসিত চিন্তা উদিত হইতে থাকে; কুৎসিত চিন্তা ও কার্য্য উভয়ই সমভাবে অবনতির পথে লইয়া যায়,—এই সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। তাই পরমেশ্বর মানব-

জাতিকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন: "তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, 'তুমি ব্যভিচার করিও না।' কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল।" (মথি ৫ : ২৭, ২৮)।

সংযত জীবনযাপন করিবার উপায়

বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কামোপভোগ হইতে বিরত থাকা বিশেষ কষ্টকর নহে। কাহারও কাহারও ধারণা আছে, কামোপভোগ হইতে বিরত থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্ট-জনক; কিন্তু তাহা নহে। কেহই পরোপভোক্তা রমণীকে বিবাহ করিতে চাহেন না, সকলেই পবিত্র চরিত্রা কুমারীকে বিবাহ করিবার বাসনা পোষণ করেণ। নারীর পক্ষে সংযত থাকা যেমন বাঞ্ছনীয়, পুরুষের পক্ষেও তদ্রূপ। নরনারী উভয়েরই নিমিত্ত নৈতিক আদর্শ একই।

কেবল বিবাহের পূর্ব্বে নহে বিবাহের পরেও কাম প্রবৃত্তি সংযত রাখা মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। স্ত্রীসঙ্গমের উদ্দেশ্য সন্তানোৎপাদন; তাই কোন পুরুষেরই বিবাহিত বলিয়া কামস্রোতে গা ঢালিয়া প্রতি রাত্রে বা দুই এক রাত অন্তর অন্তর স্ত্রীসম্ভোগ করা উচিত নহে। বৃহৎ পরিবার পালনে সমর্থ ব্যক্তিগণও বেশীর পক্ষে মাসে একবার কি দুই বারের অধিক কোন মতে স্ত্রীসঙ্গম করিবেন না (২৩শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ঋতুকালে বা গর্ভাবস্থায় এবং সন্তান জন্মিবার পর তিন মাসের মধ্যে কখনও স্ত্রীসহবাস করিবেন না। গর্ভাবস্থায় সঙ্গম করিলে গর্ভস্রাব হইতে পারে, এবং স্রাব না হইলেও স্ত্রীলোকদের স্নায়বিক শক্তি অতিশয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। গর্ভাবস্থায় সঙ্গম করিলে গর্ভিণীর এবং জরায়ুস্থ ভ্রূণেরও স্বাস্থ্যহানি হয়।

মাঝে মাঝে কাম রিপুর প্রবল তাড়না উপস্থিত হইলে বিবাহিত বা অবিবাহিত সকলেই কয়েকটী পন্থা অবলম্বন করিয়া উহা সংযত করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পেশী বা মস্তিষ্ক মোটেই চালনা করেন না, অথচ অতিমাত্রায় ভোজন করেন, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই কাম পীড়িত হইয়া হস্তমৈথুন বা ব্যভিচার ক্রিয়ায় রত হইবেন। কামেন্দ্রিয় সংযত করিতে ও মিতাচারী হইতে হইলে, উগ্র মসলাযুক্ত খাদ্য ত্যাগ করিতে হইবে ও মাংস প্রায়ই খাইতে হইবে না, উহা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাই ভাল। সাত্ত্বিক ও পবিত্র জীবনযাপন করিতে হইলে, সাত্ত্বিক নিরামিষ খাদ্য ভোজন করাই বিধেয়।

অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, মদ্যের দোকানের পার্শ্বেই বেশ্যালয়। ইহার কারণ এই যে, কাম-বহ্নিতে ইন্ধন যোগানই মদ্য পানের একটী প্রধান কার্য্য; এই নিমিত্ত মদ্যপায়ীদের আড্ডার নিকটেই বেশ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়। তামাকের প্রভাবও মদ্যের ন্যায়; তবে ঐরূপ সাংঘাতিক নহে। কামেন্দ্রিয় সংযতকারী স্নায়ুসমূহ চা ও কাফি দ্বারাও উত্তেজিত হইয়া থাকে।

সংযত জীবন যাপন করিতে হইলে মদ্য ও তাম্রকূট একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। অশ্লীল পুস্তক পাঠ, অশ্লীল চিত্র দর্শন, অশ্লীল গল্পের আলোচনা সমুদয়ই অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় লালসা জাগাইয়া তোলে।

প্রতিদিন কোষ্ঠ পরিষ্কার করা আবশ্যক; নতুবা দূষিত মলের বিষে কামেন্দ্রিয়-সঞ্চালক স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হইবে। [কিরূপে প্রতিদিন অন্ততঃ একবার কোষ্ঠ পরিষ্কার করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে ২৯শ অধ্যায়ে লিখিত উপদেশ দ্রষ্টব্য।] প্রচুর পরিমাণে জল পান করা উচিত, তাহা হইলে স্বাভাবিক মত প্রস্রাব হইবে এবং মূত্রকোষ ও মূত্রনালী কখনও বিচলিত হইবে না।

রাত্রি ৯টার পরে আর জাগিয়া থাকা উচিত নহে এবং অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল শারীরিক পরিশ্রম করিবেন; যাহাতে ঘর্ম্ম বাহির হয়, এরূপভাবে পরিশ্রম করিতে হইবে।

নিয়মিত স্নান করিয়া শরীর পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। লিঙ্গ প্রতিদিন অন্ততঃ একবার ধৌত করা বিধেয়। বিশেষতঃ যাহার লিঙ্গের আবরণত্বক্ এরূপ দীর্ঘ যে লিঙ্গ-মুণ্ড উন্মুক্ত নহে, তাহার প্রতিদিন অবশ্যই উহা ধৌত করিতে হইবে। কাম প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে, তৎক্ষণাৎ কোন প্রকার কঠিন ব্যায়াম, অথবা শীতল জলে স্নান করিলে, উহা প্রশমিত হইবে। সম্পূর্ণরূপে স্নান করা সম্ভব না হইলে, কেবল কয়েক মিনিট ধরিয়া জননেন্দ্রিয় শীতল জলে ধুইয়া ফেলিলেও যথেষ্ট হইবে।

চিন্তারাশি সংযত করিবার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বিষয়টী অত্যাবশ্যক। "কেননা মানুষ অন্তরে যেরূপ ভাবেন তাহার চরিত্রও সেইরূপ।" যে ব্যক্তি কেবল কামোপভোগের চিন্তা করেন, এবং স্ত্রীলোক দেখিলেই যাহার মনে কুৎসিত ভাবের উদয় হয়, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই—শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক—তাহার চিন্তারাশি কার্য্যে পরিণত করিবেন। তিনি তাহার ইচ্ছা শক্তি দুর্ব্বল করিয়া ফেলেন, তাই প্রলোভন দমন করিতে পারেন না। অতএব সদ্‌গ্রন্থ পাঠে বা পবিত্র চিন্তায় মনকে নিযুক্ত রাখিবেন। পৃথিবীতে কাজের লোক হইবার উচ্চাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করুন, কঠোর পরিশ্রম করুন, এবং জ্ঞানানুশীলনে রত থাকুন। মন সর্ব্বদা কার্য্যে রত থাকিলে উহা কখন কাম বিষয় চিন্তা করিবার অবকাশ পাইবে না; তাহা হইলে মন ও দেহ উভয়ই সুদৃঢ় হইবে। "অলস ব্যক্তির মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।" এই প্রাচীন নীতিবাক্যটী মনে রাখিবেন।

কামেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার পাপ-প্রবৃত্তি ভয়ানক বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে বহু প্রতিভাশালী যুবকের মূল্যবান জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। ইন্দ্রিয় দমন না করিলে পরমায়ু হ্রাস হয়, এবং মানসিক অবনতি ঘটে। একটী মোমবাতি দুই দিকে জ্বালার মত ইহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ ক্ষতি হয়।

১৫শ অধ্যায়

প্রজনন ক্রিয়া, ও যৌন স্বাস্থ্য-বিধি

(বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে)

যে আশ্চর্য্য উপায়ে মাতাপিতা সন্তানের জন্মদান করেন, তাহাতে তাহারা উভয়েই সমান অংশভাগী সত্য, কিন্তু তবুও স্ত্রীজাতির উপরেই অধিকতর দায়িত্ব অর্পিত। মাতৃদেহেই যতদূর সম্ভব সুরক্ষিত ভাবে প্রত্যেক শিশুর জীবনের আরম্ভ এবং মানব জীবনের প্রথম দুইশত আশি দিন মাতৃগর্ভেই উহা বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। শুধু প্রথম দুইশত আশি দিন নহে, জন্মিবার পরেও দেড় বৎসর ধরিয়া, শিশুর দেহের পরিপুষ্টি ও রক্ষণের নিমিত্ত, সাধারণতঃ সর্ব্বতোভাবে মাতার উপরে নির্ভর করে। তারপর মাতৃস্তন্য-পান ত্যাগ করিবার পরেও, কয়েক বৎসর ধরিয়া শিশু সতত নিজ জননীর তত্ত্বাবধানে থাকে।

এইরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত, পিতা অপেক্ষা মাতার দায়িত্ব অনেক বেশী। সন্তান জঠরে ধারণে এবং সন্তান পালনে, নারীজাতির দায়িত্ব যখন এত অধিক তখন যে চক্ষে অনেকে বর্ত্তমানে নারীজাতিকে দেখেন, তদপেক্ষা তাহাদের কি অধিকতর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা উচিত নহে? সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশ সাধনে, মাতার দায়িত্ব যখন এত অধিক, তখন যাহাতে মায়েদের এই বিশিষ্ট কার্য্যে উপযুক্তা হইবার জন্য শিক্ষালাভে সকল প্রকার সুবিধা থাকে, যাহাতে দাসীবৃত্তিতে আবদ্ধ থাকিয়া তাহাদের জীবন বিষময় না হয়, এবং যাহাতে তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে মাতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করা না হয়, প্রথমেই কি সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত নহে?

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের বিশ্লেষণ ও জীবতত্ত্ব

ডিম্বাশয় বা ডিম্বকোষ (Overy) এবং গর্ভাশয় (Uterus) এই দুইটাই স্ত্রী-দেহের প্রধান যৌনযন্ত্র। ডিম্বকোষদ্বয় ক্ষুদ্র ও গোলাকার এবং তলপেটের নিম্নদেশে অবস্থিত। ডিম্বকোষে রজোডিম্ব (Oveum) উৎপন্ন হইয়া থাকে। রজোডিম্বগুলি এত ক্ষুদ্র যে, উহাদের এক শত পঁচিশটী পাশাপাশি রাখিলে এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানও উহাদের দ্বারা আবৃত হইবে না।

গর্ভাশয়ের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া, ডিম্বকোষের অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত চারি পাঁচ ইঞ্চি লম্বা একটী নল রহিয়াছে, উহাকে রজোডিম্বনালী

(Oviduct) বলে। ঐ নলের মধ্যদিয়া রজোডিম্বগুলি ডিম্বকোষ হইতে গর্ভাশয় পৌঁছিয়া থাকে।

কুমারীর গর্ভাশয় পৌনে তিন ইঞ্চি লম্বা, এবং পৌনে দুই ইঞ্চি চওড়া। উহার নিম্নপ্রান্ত যোনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।

যোনিবত্মের মুখ সতীচ্ছদ (Hymen) নামক অতি সূক্ষ্ম ঝিল্লি দ্বারা প্রায় আচ্ছাদিত থাকে; সাধারণতঃ প্রথম সঙ্গমকালে উহা বিদীর্ণ হইয়া যায়। সতীচ্ছদে কোন প্রকার ছিদ্র না থাকিতে পারে বা কোন প্রকার রোগ বশতঃ উহার ছিদ্র বন্ধ হইয়া যাইতে পারে, এইরূপে যোনিবত্মে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া, কখন কখন উহা ফুলিয়া উঠে আর বেদনা অনুভূত হয়; এই প্রকার রোগাক্রান্তা বালিকাকে চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের নিকট লইয়া যাইতে হইবে।
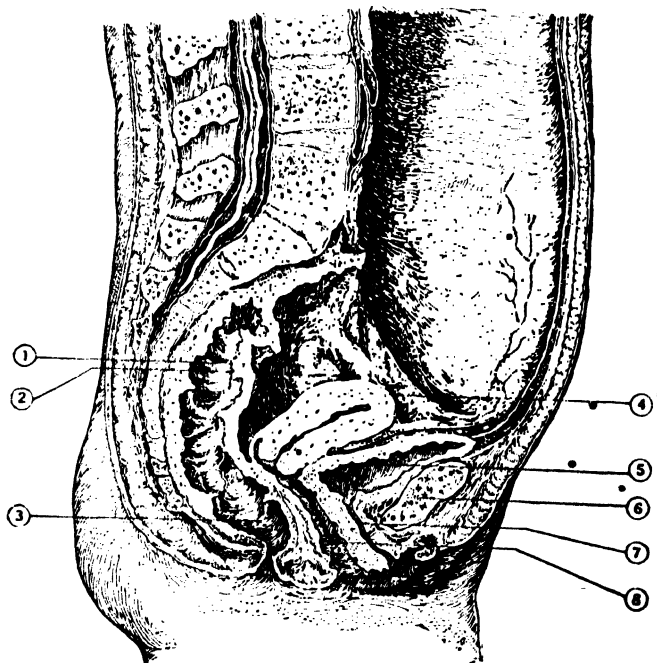
1. ডিম্বাশয় বা ডিম্বকোষ
2. রজোডিম্বনালী
3. গুহ্যদ্বার বা নিম্নোদর
4. জরায় বা গর্ভাশয়
5. মূত্রনালী
6. বস্তির নিম্নাস্থি (Pelvic Bone)
7. মূত্রদ্বার
8. যোনিবত্ম

প্রথম যৌবন বা বয়ঃসন্ধি ও রজোস্রাব

নয় হইতে পনের বৎসরের মধ্যে বালিকাদিগের প্রথম যৌবন আরম্ভ হয় ঐ সময়ে বালিকাদের দেহে নানাপ্রকার পরিবর্তন হইতে থাকে, উহাতে সে গর্ভধারণ করিবার উপযুক্তা হয়। বগলে ও যোনির উপরিভাগে লোমসমূহ উদ্গত হইতে আরম্ভ করে; স্তনযুগল ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, সমগ্র দেহ অতিদ্রুত বাড়িতে থাকে, এবং বালিকার রজোস্রাব হইতে আরম্ভ হয়।

সাধারণতঃ আঠাশ দিন অন্তর স্ত্রীলোকের রজোস্রাব হয়, এবং উহা সাধারণতঃ পাঁচ দিন থাকে। ঋতুকালে গর্ভাশয়ের ভিতরের আবরণী আংশিক-ভাবে স্রাবের সহিত বাহির হইয়া যায়। ঋতুকালীন রজোস্রাব সাধারণতঃ রক্ত ও শ্লেষ্মা জড়িত থাকে। গর্ভাবস্থায় ও সাধারণতঃ যতদিন শিশু স্তন পান করে, ততদিন স্ত্রীলোকদিগের রজোস্রাব বন্ধ থাকে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে ঋতু নিবৃত্তির পরে গর্ভধারণ সম্ভব নহে।

কোন কোন বালিকা উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও ঋতুমতি হয় না ৪২শ অধ্যায়ে উক্ত ব্যাধির চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে।

এমন কি, মাত্র নয় কি দশ বৎসর বয়সেও বালিকাদের রজোস্রাব আরম্ভ হইতে পারে। ঋতু আরম্ভ হইলেই গর্ভসঞ্চার ও সন্তান ধারণ সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এত অল্প বয়সে বালিকার বিবাহ করা ও সন্তান ধারণ করা নিতান্ত অস্বাভাবিক। দশ বৎসর কেন, ষোল কি সতের বৎসর বয়ঃক্রম কালেও বালিকা, বালিকা মাত্র। তখন পর্য্যন্ত তাহার মন ও দেহের পূর্ণ বিকাশ লাভ হয় না। সেই বয়সে গর্ভবতী হইলে তাহার দেহ কখনও সম্পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে না; এবং সে চিরদিনই খর্ব্বাকার থাকিবে। নিজের অপরিণত দেহের জন্য, পূর্ণ পরিণত সন্তানের জননী হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। বিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোন স্ত্রীলোকেরই বিবাহ হওয়া বা তাহাদের গর্ভধারণ করা উচিত নহে। একুশ অথবা বাইশ বৎসর বয়সে গর্ভধারণ করিতে আরম্ভ করিলে আরও ভাল হয়। বাল্য বিবাহ দৈহিক মঙ্গলের জন্যও ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে নৈতিক জীবনের অধঃপতন হয়, এইরূপ অনেক বিষয় এই কু-রীতির ফল।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উপদেশ

প্রজনন ক্রিয়ার যন্ত্রাদির কার্য্য ও উহাদিগের কিরূপে যত্ন লইতে হয়, এই সম্বন্ধে প্রত্যেক জননীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাঁহারা নিজ নিজ কন্যাদিগকে যৌন ব্যাপার সম্পর্কে, তাহাদিগের ধারণা শক্তি অনুযায়ী উপদেশ প্রদান

করিবেন। এই প্রকার উপদেশ ও শিক্ষার ফলে বালিকাদের স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্র সুরক্ষিত হইবে। অনেক বালকবালিকা উক্ত বিষয়ে কোন সুশিক্ষা লাভ না করিয়া, তাহাদের খেলার কুসঙ্গীদের নিকট হইতে, এই সম্বন্ধে প্রথম তথ্য সংগ্রহ করে, এবং ফলে তাহারা নানাবিধ কু-অভ্যাস শিক্ষা করিয়া থাকে।

বালিকাদিগের এমন কি খুব ছোট ছোট বালিকাদিগেরও জননেন্দ্রিয়ের বহির্ভাগ ধৌত করা কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে ময়লা জমিয়া, উক্ত স্থান চুলকাইবার প্রবৃত্তি জন্মিবে। চুলকাইতে চুলকাইতে ও ঘষিতে ঘষিতে হস্তমৈথুন করিবার কু-অভ্যাস জন্মে।

শিশুদিগকে উলঙ্গাবস্থায় যাতায়াত করিতে দেওয়ার, রীতি চরিত্রের অবনতি সাধন করে। যে দেশে এইরূপ রীতি প্রচলিত সেই দেশ কখনও উচ্চ নৈতিক আদর্শ লাভ করিতে পারে না। বহু বৎসর আগে জাপান, কোন মাতাপিতা তাহাদের সন্তানদিগকে উলঙ্গাবস্থায় রাখিতে পারিবেন না, এই সম্বন্ধে এক আইন জারী করিয়াছে।

বালকবালিকাদিগকে এক বিছানায় শয়ন করিতে দেওয়া উচিত নহে। এইরূপ করিলে, অতিশয় অল্প বয়স্ক বালকবালিকাগণও কু-অভ্যাস শিক্ষা করিবার সুযোগ পায়।

অতি শৈশবকাল হইতেই বালকবালিকাদিগকে কখনও আপন আপন জননেন্দ্রিয় নাড়াচাড়া করিতে বা ঘষিতে দিবেন না। উহাতে ছোট বালিকারাও হস্তমৈথুন করিতে শিক্ষা করে।

বালিকার প্রথম যৌবনে রজোস্রাব আরম্ভ হইলে, বালিকার মাতা তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন যে, ঋতুকালে সহজেই ঠাণ্ডা লাগিতে পারে, এবং তজ্জন্য যেন সে সতর্ক থাকে। উক্ত বয়সে বালিকাকে খুব কঠিন পরিশ্রম করিতে দেওয়া উচিত নহে, এবং তাহাকে রাত্রিকালে নয় কি দশ ঘণ্টা ঘুমাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

ঋতুকালে রজোস্রাব শোষণ করিতে পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড অথবা পরিষ্কার তুলা, সূক্ষ্মবস্ত্রে জড়াইয়া লইয়া ব্যবহার করিবে। এই সময়ে নোংরা বস্ত্রখণ্ড অথবা কোন প্রকার পুরু কর্কশ কাগজ ব্যবহার করা বড়ই অস্বাস্থ্যকর; ইহার ফলে অনেক সময়ে জননেন্দ্রিয়ে চুলকানি, যন্ত্রণা ও ব্রণ হইয়া থাকে, এমন কি উহার অভ্যন্তরভাগেও রোগ হইতে পারে। ঋতুস্রাব বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন যোনিদ্বার উত্তমরূপে ধৌত করা কর্ত্তব্য। গরম জল ব্যবহার করিলে এবং তোয়ালে দিয়া তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিলে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় থাকে না। ঋতুকালে কোন স্ত্রীলোকেরই তাহার দেহ পরিষ্কার রাখিতে তাচ্ছিল্য করা উচিত নহে।

১৩শ অধ্যায়

সুরাপান

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, স্বদেশ হিতৈষী একদল ফরাসী লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, ফরাসী দেশের লোক সংখ্যা বৎসর বৎসর বৃদ্ধি না পাইয়া বরং হ্রাস পাইতেছে। তাঁহারা প্রতি বৎসর, ফরাসীদেশে যত জন্মে তাহার সংখ্যা অপেক্ষা, যত মরে তাহার সংখ্যার আধিক্যের কারণ নির্ণয় করিতে সঙ্কল্প করিলেন। অনুসন্ধান সমাপ্ত হইলে দেখা গেল; নানাবিধ কারণের মধ্যে মদ্যপানই উহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। তাহাদের লিখিত বিবরণে অপরাপর বিষয়ের সহিত তাহারা বলিয়াছেন :—

"মদ্যপানে মানুষের স্বাভাবিক স্নেহ নষ্ট হইয়া, এবং পুত্ররূপে, পিতারূপে, স্বামীরূপে যে সকল কর্ত্তব্য আছে, তাহা ভুলিয়া যায়; মদ্যপায়ী তাহার করণীয় কার্য্য সম্যক্‌রূপে সাধন করিতে পারে না, চুরি করা, আইন অমান্য করা, তাহার স্বভাব হইয়া যায়। শুধু ইহাই নহে, মদ্যপান পক্ষাঘাত, পাকস্থলী, যকৃৎ ও বৃক্কদ্বয়ের প্রদাহ, ক্ষয়কাশ, নিউমোনিয়া, উন্মাদ্ রোগ প্রভৃতি বহুবিধ কঠিন ব্যাধির কারণ। এতদ্ব্যতীত উহাতে, রক্ত-বহানাড়ীগুলিও রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। মদ্যপান ঐ সমুদয় রোগের শুধু যে কারণ মাত্র, তাহা নহে; চিকিৎসকগণের অভিমত এই যে যাহারা মদ্যপান করেন না, তাহারা উক্ত রোগসমূহে আক্রান্ত হইলে বাঁচিবার আশা করিতে পারেন; কিন্তু মদ্যপায়িগণ ঐ সমুদয় রোগে আক্রান্ত হইলে, তাহাদের বাঁচিবার আশা কম।"

উপরিউক্ত বিবরণে প্রমাণিত হয় যে, সুরাপানে দেহের কেবল অপকারই হয়, কোন উপকার হয় না। গ্লাডষ্টোন্ নামক ইংলণ্ডের একজন পূর্ব্বতন প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন,—"যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, এই তিন উৎপাতে যত অনিষ্ট হয়, তাহা একত্র যোগেও সুরায় যে অনিষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা ভয়ানক নহে।"

বিভিন্ন প্রকারের সুরা

সুরা স্বভাবজাত বস্তু নহে। কতিপয় পদার্থ পচাইয়া উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। গম, ভুট্টা, যই, যব, চাউল, আঙ্গুর ও তালের রস হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। মদ যাহাতে মাতাইয়া উঠে, তাহা শস্য ও ফলের শ্বেতসার, ও শর্করাকে সুরাসারে পরিণত করে। সকল প্রকার মদই—দ্রাক্ষারসের মদে, ভুট্টা বা যবের মদে, ব্রাণ্ডীতে, জিন্‌মদে, তাড়িতে—সুরাসার আছে। কয়েক প্রকার মদে শতকরা পাঁচ বা দশ ছটাক সুরাসার আছে।

সুরাসার উগ্র বিষ। অল্প মাত্র খাঁটি সুরাসার অল্পকাল মধ্যে লোকের প্রাণ নাশ করিতে পারে। যিনি মদ খান তাহাকে যদি বলা যায় যে, তিনি বিষাক্ত দ্রব্য খাইতেছেন, তাহা হইলে তিনি বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু বহু প্রকারে প্রমাণ করা যায় যে, এ কথা সত্য। শত করা এক ভাগ সুরাসার মিশ্রিত জলে, একটী কেঁচো বা একটী মৎস্য ছাড়িয়া দিলে, শীঘ্রই মরিয়া যাইবে। ডিম্বের শ্বেতাংশ ফুটন্ত জলে, অথবা গরম লোহার উপর দেওয়া মাত্রই উহা যেরূপ, জমিয়া শক্ত ও সাদা হইয়া যায়, সুরাসারে ডিম্ব রাখিলেও তদ্রূপই হয়। মানুষের পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড, যকৃত, বৃক্ক ও পেশীসমূহও ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় উপাদানে গঠিত, ইহা স্মরণ রাখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, সুরাসার উহাদের উপরেও ঐরূপ ক্রিয়া করিবে।

সুরা খাদ্যদ্রব্য নহে

সুরা কি খাদ্য দ্রব্য? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, খাদ্যদ্রব্য কাহাকে বলে, তাহা বলা প্রয়োজন। যে বস্তু আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া, শরীরকে কোনও রূপে ক্ষতিগ্রস্ত করে না; অথচ তাপ, শক্তি এবং শরীরের পুষ্টি ও আরোগ্য বিধানের নিমিত্ত, সার বস্তু দান করে; তাহাই "খাদ্য"। সুরা খাদ্য নহে, কারণ উহা অন্ননালীতে প্রবেশ করিয়া, পরিপক্ব বা অপর কিছুতে পরিবর্ত্তিত হয় না। রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলেও যে সুরা সেই সুরাই থাকে। ইহাও জানা গিয়াছে যে, সুরা দেহের যে কোন অঙ্গের সংস্পর্শে আইসে, উহা সেইটীকেই সঙ্কুচিত করিয়া দেয়; উহা দেহে শক্তি প্রদান করে না। যখন সুস্থ পাকস্থলীতে সাধারণ খাদ্য প্রেরণ করা হয়, পাকস্থলী উহা গ্রহণ করে, কিন্তু সর্ব্ব প্রথমে মদ্যপান করিলে, পাকস্থলী উহা বমনের সহিত বাহির করিয়া ফেলে। সুরা পাকস্থলীর পরম শত্রু, তাই যত সত্বর সম্ভব, উহা দূর করিতে চেষ্টা করে। খাদ্যবস্তু দেহের বৃদ্ধি সাধন করে, কিন্তু সুরা উহা প্রতিরোধ করে। মদ্যপানাসক্ত বালকবালিকার দেহ কখনও উপযুক্ত মত বাড়িতে পারে না।

সুরাপানে পেশীসমূহ সবল হয় না

যাঁহারা শারীরিক শক্তি ও সহনশীলতার অনুশীলন করেন, সেই সকল মল্ল ও খেলোয়াড়গণ কখন মদ্যপান করেন না। জগতের সকল চিকিৎসকই বলেন যে সুরা পেশীসমূহকে দুর্ব্বল করে। সুরা মস্তিষ্ক অসার করিয়া দেয়, তাই সুরাপান করিয়া শক্তি হইল, নিজে নিজে, এই ভুল ধারণা করিয়া অনেকে মনে করেন, সুরায় শক্তি বৃদ্ধি করে। যুদ্ধকালে বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে যে, মদ্যপানকারী সৈন্যগণ কখনও "মার্চ্চ" করিবার সময়ে, যাহারা মদ্যপান করেন না, তাহাদের মত অধিকদূর যাইতে পারেন না।

মনের উপরে মদ্যের প্রভাব

মদ্যপায়ী ব্যক্তি মনে করেন যে, মদ্যপানে চিন্তা শক্তি বাড়িয়া যায়। আসল কথা এই যে, অল্প পরিমান মদ্য পান করিবার পরে, প্রথম দশ কি বার মিনিটকাল, মন খুব সতেজ বলিয়া মনে হয়; এবং তখন চিন্তারাশি অবাধে বহিতে থাকে। কিন্তু একটী লক্ষ্যের বিষয় এই যে, কথাগুলি অর্থহীন ও অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। আর স্বভাবতঃ যাহার বাক্য ও কার্য্য সংযত, এবং আচরণ সাধু, সেই ব্যক্তিও কিছুকাল মদ্য পান করিবার পরে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির পরিচয় দিয়া থাকেন। অল্পভাষী ব্যক্তি বাচাল হইয়া পড়েন, তাহার বাক্যগুলির পরস্পর কোন সামঞ্জস্য থাকে না, এবং এইরূপ অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ, ও অসঙ্গত কার্য্য করিয়া থাকেন, যাহা নিতান্তই অযৌক্তিক ও অশোভন। পান করিবার প্রথম কয়েক মিনিট পরে, মদ্যপায়ী ব্যক্তি মস্তকে খুব ভার বোধ করিয়া থাকেন। তখন তিনি শান্ত হইয়া পড়েন, এবং শুইয়া পড়িয়া নিদ্রিত হইতে চাহেন। মদ্য-পানে মস্তিষ্ক অসাড় হওয়ায় ঐরূপ হয়।

একজন চিকিৎসক, মস্তিষ্কের উপরে মদ্যের কার্য্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপে পরীক্ষা করিয়াছেন। ক্রমাগত বার দিন তিনি দৈনিক তিন আউন্স করিয়া মদ্য পান করিলেন। দ্বাদশ দিবসে দেখা গেল তাঁহার মানসিক শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা বহু নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে তিনি এক মিনিটে চল্লিশ অঙ্কের এক পংক্তি যোগ দিতে পারিতেন, কিন্তু বার দিন দৈনিক তিন আউন্স করিয়া মদ্য পান করিয়া, এক মিনিটে মাত্র চব্বিশ অঙ্কের এক পংক্তি যোগ দিতে পারিলেন। মদ্যপানের পূর্ব্বে, যে কবিতা মুখস্থ করিতে তাঁহার মাত্র দুই মিনিট লাগিত, বার দিন মদ্যপান করিবার পরে, তাহা মুখস্থ করিতে ছয় মিনিট সময় লাগিল। উন্মাদ রোগের একটী প্রধান কারণ মদ্যপান। পান দোষে মস্তিষ্কের কিরূপ সাংঘাতিক অনিষ্ট হয়, ইহাই তাহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মানবকে বিবেক দান করা হইয়াছে, উহারই বলে তাহারা ন্যায় অন্যায় বুঝিতে পারেন। মদ্যের প্রভাবে এই শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। যাহাতে মানুষের জেল হয়, এমন অধিকাংশ অপরাধ, যেমন—মারামারি, খুনজখম, বলাৎকার প্রভৃতি মদ্যের ঝোঁকেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ফৌজদারী মকর্দ্দমার বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিই নেশার ঝোঁকে ভয়ঙ্কর পাপে লিপ্ত হন।

মদ্যপানে ব্যাধির সৃষ্টি

যিনি প্রতিদিন অল্প পরিমান মদ্যপান করেন, তিনি হয়ত মনে করেন যে উহাতে বেশী কিছুই অনিষ্ট হয় না; কিন্তু যদি তাহা দেহাভ্যন্তরের যকৃৎ,
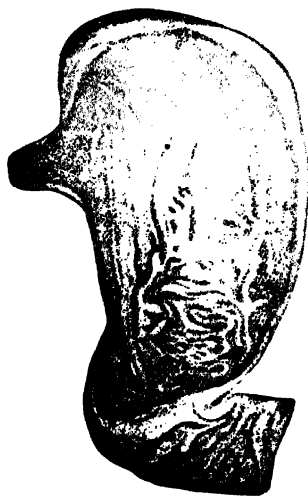
এই চিত্রে একটী সুস্থ পাকস্থলীর অভ্যন্তর ভাগ দেখান হইয়াছে। উহার অভ্যন্তরস্থ আবরণী ভাঁজ করা ও কোঁচকান, উহারা দেখিতে এক রকম এবং উহাদের বর্ণও স্বাস্থ্য-ব্যঞ্জক

এই চিত্রে সুরাপান জনিত পাকস্থলীর ক্ষত ও উহাতে রক্ত—সঞ্চয় দেখান হইয়াছে; অভ্যন্তরস্থ সাধারণ অস্বাস্থ্যকর বর্ণ অপর চিত্রের সহিত তুলনা করিয়া দেখুন

বৃক্ক, পাকস্থলী, ফুস্‌ফুস্‌ ও রক্তবহানাড়ীগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা সম্ভব হইত, তবে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, ঐ সমুদয় যন্ত্র ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। দেহে প্রবিষ্ট রোগ জীবাণু বিনষ্ট করিবার ক্ষমতা, দেহের স্বভাবতঃই রহিয়াছে। মদ্য এই রোগ জীবাণু প্রতিহত করিবার ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেয়, তাই মদ্যপায়ীর দেহের যন্ত্রগুলি এইরূপে পীড়িত হইয়া পড়ে যে, তিনি সহজেই নিউমোনিয়া যক্ষ্মা, মূত্ররোগ, কলেরা, প্লেগ, আমাশয় প্রভৃতি বিকট ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ মদ্যপায়ীর যে কোন ব্যাধি দ্বারাই সহজে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা; আরও, পীড়াগ্রস্ত হইলে যিনি মদ্যপান করেন না, তাহা অপেক্ষা তাহার আরোগ্য লাভ করিবার সম্ভাবনা অতিশয় কম।

মদ্যপানের কুপ্রভাব ও অপকারিতা, কেবল যে মদ্যপায়ীর নিজের উপরে পতিত হয় তাহা নহে; তাহার সন্তানসন্ততিগণের উপরেও পতিত হয়। অনাথ আশ্রমে যে সকল দুর্বলমনা বালকবালিকা থাকে, পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে উহাদের মধ্যে শতকরা ৪১ জন মদ্যপায়ীর সন্তান।

মদ্য পরমায়ু হ্রাস করে

সকল দেশের জীবন-বীমা কোম্পানীগুলি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, মদ্যপায়ীরা, যাহারা মদ খান না তাহাদের ন্যায় দীর্ঘায়ু হয় না। জীবন-বীমা কোম্পানীর বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা মদ্যপান করেন না, তাহাদের তুলনায় মদ্যপায়ীদের মধ্যে রোগীর সংখ্যা দ্বিগুণ ও মৃত্যু সংখ্যা দেড়-গুণ। মনে করুন যদি এক হাজার মদ্যপায়ী ও এক হাজার মদ্যপান করেন না এরূপ লোকের দুইটী বিভক্ত দল থাকে, তবে মদ্যপায়ীদের দলে তিন জন মরিলে, অপর দলে কেবল দুই জন মরিবেন। জগতের বড় বড় জীবন-বীমা কোম্পানীর লিখিত বিবরণী অনুসারে, উক্ত বিষয় সম্পূর্ণ সত্য। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, মদ্যপায়ী তাহার চারি হইতে দশ বৎসর আয়ু নষ্ট করিয়া ফেলে।

সুরা কি ঔষধ?

সুরা ব্যাধি আরোগ্যে সাহায্য করিবে, চিকিৎসকগণ এতদিন এই ভাবিয়া পীড়িত ব্যক্তিদিগকে, ঔষধরূপে সুরা দিতেন; কিন্তু বর্তমান কালে তাঁহারা কদাচিৎ খাইবার ঔষধে সুরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধুনা জানা গিয়াছে সুরায় কোন ব্যাধি আরোগ্য হয় না; বরং উহা প্রায় সকল ব্যাধির প্রকোপ বাড়াইয়া থাকে। কোন কোন রোগে শরীরের কোন স্থানে মালিশ করিবার জন্য মদ্যের ব্যবহার হইতে পারে। সংবাদ পত্রে কোন কোন বিশেষ বিশেষ মার্কা বিশিষ্ট মদ্য পরিপাক শক্তির সহায়তা ও শক্তি সঞ্চার করে, এইরূপ

আড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপন দেখা যায়। ঐ সমুদয় সম্পূর্ণ মিথ্যা। রুগ্নব্যক্তির সকল প্রকার মাদক দ্রব্য পরিহার করা নিরাপদ।

পান দোষ ত্যাগ করিবার উপায়

এই কু-অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে উহা ত্যাগ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রয়োজন। এই কু-অভ্যাস ত্যাগ করিবার নিমিত্ত, ঈশ্বরের নিকটে শক্তি ভিক্ষা করিলে, তিনি মানুষকে এরূপ শক্তি দান করিবেন, যাহার বলে উহা বর্জ্জন করা যাইবে।

বর্ত্তমানে জানা গিয়াছে, মাদক দ্রব্য গ্রহণ করিবার ইচ্ছা, ভক্ষ্য দ্রব্য হইতে জন্মিয়া থাকে। এই নিমিত্ত যিনি পান দোষ ত্যাগ করিতে চাহেন, তাহার সকল প্রকার মাংস ও মসলাযুক্ত খাদ্য ত্যাগ করা উচিত। মদ্যপানের স্পৃহা ত্যাগ করিতে হইলে, ধূমপানের অভ্যাস একেবারেই ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ অনেক সময় ধূমপানের অভ্যাস হইতে মদ্যপানের স্পৃহা জন্মে। প্রচুর পরিমাণ টাটকা ফল খাইতে ও নির্ম্মল জল পান করিতে হয়। চা বা কাফি পান করিতে নাই। দৈনিক একবার গরম জলে স্নান করা উচিত। প্রথমে গরম জলে সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, অতি সত্বর কিছু শীতল জল সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া দিতে হইবে, এবং অতিদ্রুত বেশ ভাল করিয়া গা মুছিয়া ফেলিতে হইবে। মুক্ত বায়ুতে যত বেশী সময় থাকা যায়, ততই ভাল। ঘাম বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত দৈনিক ব্যায়াম করিবেন। নিজ গৃহে কোন কারণেই মদ রাখা, অথবা কোন মদের দোকানে প্রবেশ করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি প্রকৃতই মদ্য ত্যাগ করিতে অভিলাষী, সে ব্যক্তি উপরের নিয়মগুলি পালন করিলে, নিশ্চয়ই আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারিবেন।

১৭শ অধ্যায়

তাম্রকূট সেবন

পৃথিবীতে নানা প্রকার উদ্ভিদ্ জন্মে। তন্মধ্যে কতকগুলি মানুষের ও কতকগুলি জীবজন্তুদিগের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়; কতকগুলি দ্বারা মানুষের পরিধেয় বস্ত্রাদি ও আবশ্যক জিনিষ পত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু বাকি কতকগুলির,—অনিষ্টকারী কীট পতঙ্গাদি নষ্ট করা ব্যতীত,—কোন প্রকৃত ব্যবহার দেখা যায় না। তামাক এ শেষোক্ত উদ্ভিদ্ শ্রেণীভুক্ত। বিড়াল, কুকুর, ঘোড়া, গরু বা অন্যান্য কোন প্রাণীকেই তাম্রকূট পান করান যায় না, কেবল মানুষেই এই অদ্ভুত বিষয় অভ্যাস করিয়াছে।

স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত তামাকের কোনই প্রয়োজন নাই; কারণ দেখা যায় যে, যাহারা তামাক ব্যবহার করেন, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা উহা মোটেই ব্যবহার করেন না, তাহারা সবল, সুস্থকায়, ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। চীন দেশে আফিং সম্বন্ধে যেরূপ আইন হইয়াছে, পাশ্চাত্য দেশে তাম্রকূট যখন প্রথম প্রচলিত হয়, তখন সমুদয় রাজ সরকারই, অপকারী বিষ বলিয়া, সেইরূপ আইন দ্বারা ইহার প্রচলন নিষেধ করিয়া দেন; কিন্তু প্রায় সমুদয় রাজ সরকারেই এখন উহা ব্যবহৃত হইতেছে; তাই ধূমপান সম্বন্ধীয় আইনগুলির এখন আর চলন নাই, সেগুলি প্রায় বাতিল হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

তাম্রকূট বিষ

একশত ছটাক পরিমাণ শুষ্ক তামাকের পাতায়, দুই ছটাক পরিমাণ নিকোটিন্ নামক মারাত্মক বিষ আছে। এই বিষ আর্সেনিক (সেঁকোবিষ) অপেক্ষাও ভীষণ। উহা এত ভীষণ যে, মাত্র এক ফোঁটা একটা শশকের গায়ে দিয়া, উহার প্রাণ বিনাশ করা যাইতে পারে। দুই ফোঁটা কোন কুকুর বা বিড়ালের জিহ্বার উপরে রাখিলে উহা মরিয়া যাইবে। তামাক গিলিয়া ফেলায় উহার বিষে কাহারও কাহারও মৃত্যু হইয়াছে। চীন দেশে সাধারণতঃ হুঁকোর জল পান করিয়া আত্মহত্যা করে, ঐ জলে নিকোটিন্ থাকে।

সাধারণতঃ প্রথম তামাক সেবন করিবার সময়, লোকে অসুস্থ হইয়া পড়ে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তামাক অতিশয় হানিকর বিষ।

যে ভাবে, যে কোন আকারেই ব্যবহৃত হউক না কেন, তামাক দেহের পক্ষে অতিশয় অপকারী বিষ। কেহ কেহ মনে করেন যে পাইপ বা চুরুট

অপেক্ষা সিগারেট অল্প ক্ষতিকর, আবার কেহ কেহ ভাবেন যে শুষ্ক সিগারেট বা বিড়ি ব্যবহার করা অপেক্ষা হুঁকোর সাহায্যে জলের মধ্য দিয়া তামাক সেবনে অনিষ্ট অল্প হয়। কিন্তু যে ভাবেই ব্যবহার করা হউক না কেন, তামাক অপকারী। উহা যত ব্যবহার করা যায়, অপকারও তত হয়; কেহ কেহ আবার তামাকের শুধু ধূম্রপান নহে, তামাক চর্ব্বণও করিয়া থাকেন; কেহ নস্য আকারে তামাক ব্যবহার করেন। তামাকের এই প্রকার ব্যবহারও ধূম্রপানেরই ন্যায় অপকারী। ধূম্রপায়ীদের মধ্যে, অধিকাংশ লোক ফুস্ফুসের মধ্যে তামাকের ধূম টানিয়া লন, এবং পরে নাসিকার দ্বারা বাহির করিয়া ফেলেন। এই ভাবে ধূম পান করিলে, যে পরিমাণ বিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, অপর কোনরূপে পান করিলে, সেইরূপ হয় না।

লোকে তামাক ব্যবহার করে কেন?

আফিং, কোকেন প্রভৃতি ব্যবহারের ন্যায় তামাক ব্যবহারও ক্রমে অভ্যাস হইয়া যায়। প্রথমবার উহা ব্যবহারে অসুস্থ বোধ হয়, দ্বিতীয় বার ব্যবহারে অসুস্থ ভাব অল্প বোধ হয়, এবং অবশেষে কয়েকবার ব্যবহার করিবার পরে উহাতে বেশ একটু আরাম বোধ হয়। তারপর যত অধিক দিন ব্যবহৃত হয়, উহা ত্যাগ করিতে কোনরূপ চেষ্টা করাও ততই কঠিন হইয়া উঠে। তামাক দ্বারা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসমূহ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। মানুষ ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইলে ধূমপান করিয়া থাকে; এবং তৎক্ষণাৎ বেশ ভাল বোধ করে। বস্তুতঃই যে, ভাল বোধ করে, তাহা নহে—প্রকৃতপক্ষে কিছুই বোধ করিতে পারে না, কারণ তামাকে তাহাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসমূহ অসাড় হইয়া যায়। কাজেই ক্লান্তি বা শ্রান্তি-জনিত যন্ত্রণা ও অশান্তি অনুভব করিতে পারে না। যন্ত্রণা বা অশান্তি পূর্ব্ববৎই থাকে, কেবল অনুভূত হয় না।

তাম্রকূট সেবীদের অবিলম্বে মৃত্যু হয় না কেন?

ধূম্রপানের সময় যদি কতকটা বিষ পুড়িয়া না যাইত, তাহা হইলে তাম্রকূট সেবীরা অতি সত্বরই মরিয়া যাইতেন। যাহা হউক সমস্ত বিষ কিছুতেই পুড়িয়া যায় না; ধূমের সহিত উহার অনেকাংশ (শতকরা ৩০ হইতে ৯৫ ভাগ) থাকিয়া যায়, এবং রক্তে প্রবেশ করে। যে কোন ক্ষতিকর দ্রব্য শরীরে কতক পরিমাণে সহিয়া যায়,—যেমন যাহারা গুটি হইতে রেশম গুটান তাহাদের অঙ্গুলিতে গরম জল এরূপ সহ্য হইয়া যায় যে, তাহারা ফুটন্ত জলে আঙ্গুল ডুবাইতে পারেন—তামাকের বিষও সেইরূপ কালে সহ্য হইয়া যায়, কিন্তু কোন ক্ষতিকর দ্রব্য সহিয়া গেলেই যে উহাতে কোনই ক্ষতি হয় না, তাহা নহে।

ধূমপানে মদ্যপানের প্রবৃত্তি জন্মে

প্রত্যহ তাম্রকূট সেবীর নাসিকায় ও কণ্ঠে প্রদাহ জন্মে। এই নিমিত্ত তাহারা ঘন ঘন কাশেন। নাসিকার আবরণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাই তাহাদের ঘ্রাণশক্তি প্রখর থাকে না। তামাকের ধূমে জিহ্বা ঝল্‌সিয়া যায় বলিয়া, সাধারণ খাদ্য দ্রব্যাদি তাহাদের নিকটে স্বাদ বিহীন বোধ হয়। এই জন্য ধূমপায়ীদিগের অধিক মসলা যুক্ত আহারের প্রবৃত্তি জন্মে। তামাকের ধূমে মুখ ও কণ্ঠনালী শুষ্ক করিয়া ফেলে। অধিক মসলা যুক্ত আহারেও মুখ ও কণ্ঠনালী জ্বালা করে। এইরূপে, এরূপ তৃষ্ণা উপস্থিত হয় যে, পানীয় জলে তাহা প্রশমিত হয় না; কেবল মাত্র কোন প্রকার সুরা পানে ইহা প্রশমিত হইতে পারে। এই কারণে ধূমপায়ীর মদ্যপানের সম্ভাবনা খুব অধিক।

তাম্রকূট-বিষ-দুষ্ট হৃৎপিণ্ড

হৃৎপিণ্ডে তাম্রকূট বিষের প্রভাব অধিক বোধ হয়। তাম্রকূট-বিষ-দুষ্ট হৃৎপিণ্ড (অতিরিক্ত তামাক সেবন জনিত হৃদ্রোগ বিশেষ) নামক এক প্রকার ব্যাধি আছে। যাহারা অধিক তাম্রকূট ব্যবহার করেন, তাহাদের এই রোগ হয়। এই রোগে হৃৎপিণ্ড কিছুকাল অতি দ্রুত স্পন্দিত হইয়া সহসা দুই বা একবার স্পন্দিত না হইয়া থামিয়া যায়, তারপর অতি ধীরে স্পন্দিত হইতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের গতি এইরূপ হইলে, সহজেই লোকে হাঁপাইয়া পড়ে। যাহারা তামাক ব্যবহার করেন, তাহাদের দম খুব কম; এই কারণেই কোন মল্ল বা যাহারা মাংস পেশী সবল করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা তামাক ব্যবহার করেন না। যে সকল যুবক সিগারেট ব্যবহার করেন, তাহাদের প্রায় সকলেরই হৃৎপিণ্ড তাম্রকূট-বিষ-দুষ্ট। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের নৌবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্য ৪১২ জন যুবক দরখাস্ত করিয়াছিলেন; বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিয়া তন্মধ্যে ২৯৮ জনের দরখাস্ত না-মঞ্জুর করেন; কারণ তামাক ব্যবহারে তাহাদের হৃৎপিণ্ড ও অন্যান্য কতিপয় জীবনপোষক যন্ত্র একেবারে চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

তামাকে দেহ-পুষ্টির বাধা জন্মায়

খাদ্যের উপর শরীরের বৃদ্ধি নির্ভর করে, কিন্তু বৃদ্ধি সাধন করিতে ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে, ইহা উত্তমরূপে পরিপাক হওয়া আবশ্যক। আবার তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি, এই পরিপাক কার্য্য অন্নবহানালীতে সম্পন্ন হয়। তামাকে অন্নবহানালীর এরূপ অনিষ্ট হয় যে, উহাদ্বারা উত্তমরূপে খাদ্য পরিপাক হয় না। কাজেই শরীর যথেষ্ট বৃদ্ধিসাধনোপযোগী দ্রব্য পায় না। কেবল ইহাই নহে, একটী বর্দ্ধনশীল বৃক্ষের শিকড়ের চতুর্দ্দিকে বরফ রাখিলে, উহাতে যেরূপ শিকড়-

গুলি অবশ হইয়া গাছটী আর বাড়িতে পারে না, অথচ বরফ খুব বেশী না হইলে, গাছটী মরিয়াও যায় না, খর্ব্ব হইয়া বাঁচিয়া থাকে; সেইরূপ তামাকের বিষও দেহের যে সমুদয় অঙ্গ বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই সমুদয় নিস্তেজ করিয়া দিয়া, দেহের বৃদ্ধি সাধনে বাধা জন্মায়।

তামাক পরমায়ু হ্রাস করে

আমেরিকার একটী বড় জীবন-বীমা কোম্পানী ষাট বৎসরে এক লক্ষ আশি হাজার ব্যক্তির জীবন-বীমা করিয়া দেখিতে পাইয়াছেন যে, যাহারা
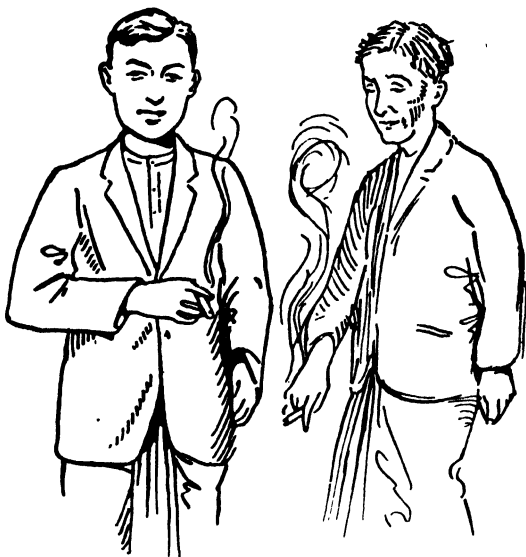
তাম্রকূট ব্যবহারের পরিণাম

তামাক ব্যবহার করেন না, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা তামাক ব্যবহার করেন, তাহারা অল্পায়ুঃ হন। দেখা গিয়াছে, যাহারা তামাক সেবন করেন না, এরূপ চারি জন লোক, চল্লিশ বৎসর বয়সে মরিলে, তামাক সেবন-কারী ঐ বয়সে পাঁচজন মরিবেন।

অস্ত্রচিকিৎসকগণ দেখিয়াছেন, অনেক অস্ত্রোপচারে যাহারা তামাক ব্যবহার করেন না, তাহারা শীঘ্রই নরোগী হন, কিন্তু যাহারা তামাক ব্যবহার করেন, তাহারা প্রায়ই মরিয়া যান। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের সভাপতি গুলির আঘাতে অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যান। তাঁহার চিকিৎসক বলিয়াছিলেন

"তিনি খুব তামাক খাইতেন, ঐরূপ তামাক না খাইলে, তিনি বাঁচিতে পারিতেন।"

ধূমপান অন্ধ হইবার এবং ওষ্ঠ, জিহ্বা ও কণ্ঠনালীতে কর্কট রোগ হইবার সাধারণ কারণ।

মনের উপরে তামাকের প্রভাব

পরিশ্রান্ত ব্যক্তি কিছুকাল ধূম্রপান করিবার পরে, ক্লান্তি ভুলিয়া যান। বিষন্ন ব্যক্তি কয়েক মিনিট ধূমপান করিলে, দুঃখ ভুলিয়া যান। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাম্রকূটের বিষ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসমূহ অসাড় করিয়া দেয়, এবং তন্নিমিত্ত ঐরূপ হইয়া থাকে। এই কারণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাম্রকূট-সেবী বালকবালিকাগণ সাধারণতঃ মেধাবী হয় না। যে সকল স্কুল বা কলেজ, তাম্রকূটসেবী ও যাহারা তাম্রকূট সেবন করে না, এই দুই প্রকার বালকবালিকাই অধ্যয়ন করে, সে সকল স্কুল কলেজে দেখা যায়, তাম্রকূট সেবিগণ পরীক্ষায় শতকরা ২০ নম্বর বা তদপেক্ষা কম পায়। আমেরিকার কোন বড় সহরের দশটী বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটী কুড়িটী তাম্রকূটসেবী, ও কুড়িটী যাহারা তাম্রকূট ব্যবহার করে না এরূপ ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাম্রকূটসেবী প্রত্যেক বিশ জন বালকের মধ্যে চৌদ্দজনের কোন না কোন স্নায়ু রোগ আছে; এবং তাম্রকূট সেবন করে না এরূপ বিশজনের মধ্যে মাত্র একজন রোগাক্রান্ত। তারপর তাম্রকূটসেবী প্রত্যেক বিশজন বালকের মধ্যে আঠার জন স্থূলবুদ্ধি, এবং যাহারা তাম্রকূট সেবন করে না, এই প্রকার বিশ জনের মধ্যে মাত্র এক-জন স্থূলবুদ্ধি হইয়া থাকে।

তাম্রকূট ব্যবহারের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি এই যে, উহা ব্যবহারে বালকবালিকাগণ মিথ্যাবাদী, চোর এবং ভ্রষ্ট চরিত্র হয়। যে সকল বালকবালিকা ধূম্রপান করে, তাহারা সিগারেট কিনিতে প্রায়ই চুরি করে ও মিথ্যা কথা বলে।

কিরূপে তামাক ব্যবহারের অভ্যাস ত্যাগ করা যায়

যাঁহারা তামাক ব্যবহার করেন না, তাঁহারা কখনও আরম্ভ করিবেন না। যাঁহারা উহা ব্যবহার করেন, তাঁহারা উহার অপকারিতা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া যদি শান্তিপূর্ণ কর্ম্মক্ষম দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে চাহেন, তবে এই কু-অভ্যাস ত্যাগ করিবেন। ধীরে ধীরে পরিমাণ কমান অপেক্ষা একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এইরূপ করিতে হইলে দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি ও অটল সঙ্কল্পের প্রয়োজন। এই পুস্তকে মদ্যপায়ীদিগকে মদ্যত্যাগ করিবার যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাম্র-কূট সেবনের প্রবৃত্তি ত্যাগ করিবার পক্ষেও সেই সমুদয় অতিশয় প্রয়োজনীয়। প্রতিদিন শরীর হইতে প্রচুর পরিমাণ ঘর্ম্ম উৎপাদন করিয়া শরীর হইতে তাম্র-কূট-বিষ বাহির করিয়া দেওয়া একটী উৎকৃষ্ট উপায়।

১৮শ অধ্যায়

পেটেণ্ট ঔষধ

খবরের কাগজে বা বিজ্ঞাপন মারিবার স্থানে, যে সকল বিজ্ঞাপন দেখা যায়, তাহার মধ্যে অন্য বিষয় অপেক্ষা ঔষধের বিজ্ঞাপনই অধিক। প্রত্যহ নূতন নূতন আশ্চর্য্যজনক ঔষধ বাহির হইতেছে। অধিকাংশ ব্যক্তিই পীড়িত হইলে মনে করেন, যে কেবল কয়েকটী বড়ি ও কয়েক মাত্রা ঔষধ খাইলেই তাঁহারা আরোগ্যলাভ করিবেন, ইহাই পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রেতার সুযোগ। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে চিকিৎসকগণও, রোগের লক্ষণ, প্রকৃতি ও কারণ জানিতেন না। তাঁহারা ভাবিতেন, কোন দৈবদুর্ব্বিপাক রোগের হেতু। রোগের কারণ না জানায়, তাঁহারা নিশ্চয়ই চিকিৎসার দ্বারা নীরোগ করিবারও প্রকৃষ্ট উপায় জানিতেন না। সেকালে চিকিৎসক হইতে হইলে, কাহারও কলেজে কয়েক বৎসর ধরিয়া, শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy), জীবতত্ব (Physiology) প্রকৃতি বিজ্ঞান পড়িতে হইত না। তাহাদের পিতা বা পিতামহের নিকট হইতে কয়েক প্রকার অদ্ভুত ঔষধ প্রস্তুত করিতে শিখিলেই হইত। রোগীদের ধারণা ছিল কোন দৈবকারণ বশতঃ তাহাদের রোগ হইয়াছে; অতএব ঔষধ যত অদ্ভুত হইবে, উহা ততই কার্য্যকারী হইবে। পূর্ব্বকালে লোকের এইরূপ ধারণা ছিল, এবং দুঃখের বিষয় এই যে এখনও জগতে অনেক লোকের কিছু কিছু ঐরূপ ধারণা আছে।

রোগীর দৈহিক প্রকৃতি ও ঔষধে কি কি আছে, তাহা না জানিয়া, শরীরের মধ্যে ঐ ঔষধ প্রবেশ করান অন্যায়। শরীরতত্ব ও রোগের বিষয় ভাল করিয়া শিক্ষা করিয়াছেন এরূপ অভিজ্ঞ চিকিৎসক যে হাঁসপাতালে বা ডাক্তারখানায় আছেন, খুব অসুস্থ হইলে সেখানে যাওয়া উচিত। নীরোগ হইবার জন্য কি করা আবশ্যক তিনি উপদেশ দিতে পারিবেন। একটী প্রবাদবাক্য আছে যে, রোগ হইলে যিনি নিজে নিজের চিকিৎসা করেন, তিনি নির্ব্বোধ চিকিৎসক ও নির্ব্বোধ রোগী দুইই। যাহারা পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার করেন, এই প্রবাদ বাক্য তাহাদের উপর প্রযোজ্য।

খবরের কাগজে যে সকল ঔষধের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, ঐ সকল ঔষধ আবিষ্কারকেরা বুঝেন যে প্রত্যেকেরই কখন না কখন পিঠে বা মাথায় বেদনা হইবে বা কাশি হইবে, তাই তাহারা লোককে ঐ সকল লক্ষণের কোন একটী দেখিলেই ভয়ানক রোগ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে—ইহা বুঝাইয়া যত প্রকারে

সম্ভব ভীত করেন, এইরূপ কোন লোককে তাহার কোন সাঙ্ঘাতিক রোগ হইয়াছে বলিয়া ভয় দেখাইয়া তাহারা ঐ রোগের কোন আশ্চর্য্য ঔষধের বিষয় —(তাহারা বলেন যে, এমন আশ্চর্য্য যে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে)—বলিতে আরম্ভ করেন।

খবরের কাগজে যে সকল ঔষধের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহার অধিকাংশই সস্তা জিনিষে তৈয়ারী। ঔষধকারী চারি আনা দরের মদ লইয়া, তাহাতে জল, রং ও সুতার করিবার জন্য কিছু দিয়া ঔষধ করিতে পারেন। বোতল শুদ্ধ সমস্ত জিনিষের দাম, আট আনার বেশী হয় না, কিন্তু খুচরা দরে পাঁচ ছয় টাকা বিক্রয় হয়।

লোকে বিজ্ঞাপনের ছলনায় প্রবঞ্চিত হইয়া, কোন কোন ঔষধ ক্রয় করে। খুব প্রচারিত হইয়াছে, এমন অনেক ঔষধেই হয় মদ, না হয় মরফিয়া, না হয় কোকেন আছে। সকলেই জানেন, এই সকল ব্যবহার করিলে উহা অভ্যাস হইয়া যায়, এবং যিনি যত খান, তিনি তত চান। পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রেতারা, এবং হাতুড়ে ডাক্তারেরা উহা জানেন। কোন পীড়িত ব্যক্তি এক বোতল ঔষধ খাইবেন, তাহাকে দ্বিতীয় বোতল লইতে হইবে ইহা বুঝেন বলিয়া প্রায়ই তাহারা প্রলোভন দিবার জন্য প্রথম বোতল দাম না লইয়া দেন। বিজ্ঞাপনের কুহকে প্রবঞ্চিত হইবেন না। "আমরা এই ঔষধে আরোগ্য হইয়াছি।" লোকের এইরূপ প্রশংসাপত্রে বিশ্বাস করিবেন না।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, তিনি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপিত কোন ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, এই অবস্থায় বুঝিতে হইবে খুব সম্ভবতঃ ঔষধ না খাইলে, তিনি আরও শীঘ্র নীরোগ হইতেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় গত কয়েক বৎসরের অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, যে, অনেক বালকবালিকা এবং বয়স্ক ব্যক্তি পেটেণ্ট ঔষধ খাইয়া শরীর বিষাক্ত করিয়াছেন। কোন রোগী অন্ধকারে ডাক্তারখানায় ঢুকিয়া প্রথম যে বোতল ঔষধ পান সেই বোতলেরই ঔষধ খাইলে, তাহার যেরূপ বিপদের সম্ভাবনা, যিনি পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার করেন তাঁহারও তদ্রূপ। সকলেই পূর্ব্বোক্ত রোগীকে ঐরূপ ভয়ের কাজ করার জন্য নির্ব্বোধ বলিবেন, কিন্তু প্রত্যেক পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহারকারী পুনঃ পুনঃ ঐ বিপদের কাজ করিয়া থাকেন।

১৯শ অধ্যায়

আরোগ্য শক্তির মূল কারণ

বর্ত্তমানে ভারতে হয়ত প্রায় এক কোটী লোক অসুস্থ, এই এক কোটী লোকের প্রত্যেকেই সুস্থ হইতে চাহেন, অতএব রোগীকে সুস্থ করিবার বিষয় অতিশয় প্রয়োজনীয়।

রোগ মুক্ত হইতে হইলে প্রথমে উহার কারণ দূরীভূত করিতে হইবে

প্রথম অধ্যায় বলা হইয়াছে যে, বিষাক্ত জীবাণু দেহে প্রবেশ করাই, অধিকাংশ রোগের কারণ। কারণ যাহাই হউক না কেন, প্রত্যেক দশটী রোগের মধ্যে, অন্ততঃ আট বা নয়টী রোগের আক্রমণ পরিহার করা যাইতে পারে। কারণ স্বাস্থ্যনীতি লঙ্ঘন হেতু ঐ পরিমাণ রোগ জন্মে, সুতরাং রোগ উপস্থিত হইলেই প্রথমে উহার কারণ দূর করিতে হইবে।

প্রকৃতির চেতনাবাণী

হাতে কাঁটা বিঁধিয়া, হাতখানি ফুলিয়া লাল হইয়া যন্ত্রণা হইলে, প্রথমে কাঁটাটী না তুলিয়া, হাতখানি সুস্থ করিতে চাহিবেন, এমন নির্ব্বোধ ত কেহই নাই? তবুও প্রচুর পরিমাণ অসিদ্ধ ভাত ভালরূপে না চিবাইয়া তাড়াতাড়ি খাওয়ায়, পেটে দারুণ বেদনা হইলে, ও অম্ল ঢেঁকুর উঠিতে থাকিলে, অনেকে মনে করেন শুধু কয়েক ফোঁটা ঔষধ খাইলেই, পেটের বেদনা ও অম্ল উদ্গার দূর হইবে। তাহাদের বুঝা উচিত কাঁটা তুলিয়া না ফেলিলে যেরূপ হাতের ফুলা ও যন্ত্রণা আরোগ্য হয় না, সেইরূপ পেট বেদনাও, কারণ দূর না করিলে সারিতে পারে না। কাঁটা তুলিয়া ফেলিলে কোন ঔষধ বিনাই যেমন হাতখানি সহজে সারিয়া যায়, পেটের অসুখও সেইরূপ, চাউল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া বেশ ধীরে ধীরে চিবাইয়া খাইলে, আপনা হইতেই ভাল হইয়া যায়, এক ফোঁটা ঔষধেরও প্রয়োজন হয় না।

উপরে হাতে কাঁটা বিদ্ধ হওয়া ও পেট বেদনার উদাহরণ দ্বারা যাহা বলা হইল, সকল ব্যাধির পক্ষেই উহা প্রযোজ্য। রোগের কারণ দূরীভূত হইলে, আরোগ্য করিবার বাকি অংশ রক্তই সম্পন্ন করে। কোথাও বেদনা হইলে, বা ফুলিলে, বা জ্বর হইলে, বুঝিতে হইবে, শরীর জানাইতেছে যে, কোন গণ্ডগোল

হইয়াছে, তখন উহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া, তাহা দূর করা উচিত। কোন প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইলে জ্বর হয়, এই জ্বর উপকারী, কারণ ব্যাধি উৎপন্নকারী বিষ সমূহ জ্বালাইয়া দিবার জন্যই জ্বর হয়। গুরুপাক বা পচা খাদ্য খাওয়ায়, তলপেটে বেদনা বা উদরাময় হইলে, একমাত্র আফিং বা মরফিয়া খাইলে, সহজেই উহা থামিয়া যায়। কিন্তু ঐরূপ করা বড়ই নির্ব্বোধের কাজ। পেটের বেদনায় বুঝা যায়, পেটে কোন গোলমাল হইয়াছে, সুতরাং চুপ করিয়া শুইয়া থাকা এবং কিছুই না খাওয়া প্রয়োজন। অন্ত্রে যে সকল গুরুপাক ও পচা দ্রব্য জমা হইয়াছে, সেই সমুদয় দূর করিতেই উদরাময় হয়। পেটের বেদনা ও উদরাময় থামাইবার জন্য, আফিং বা সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী আফিং মিশ্রিত কোন পেটেন্ট ঔষধ খাইলে, স্নায়ুসমূহ অসাড় হইয়া পড়ে, ফলে পেটে আর কোন বেদনা বোধ হয় না, ও উদরাময় বন্ধ হইয়া যায়; তখন লোকে আবার কাজে প্রবৃত্ত হয়, এবং ইচ্ছামত আহার করে; কিন্তু অন্ত্রসমূহ ক্রমে আরও খারাপ হইতে থাকে; এবং উহার মধ্যের দুষ্পাচ্য এবং দূষিত খাদ্য হইতে বিষ রক্তে প্রবেশ করে; কাজেই পরে আফিং মিশ্রিত ঔষধ বন্ধ করিলেই রোগের মাত্রা এত বাড়িয়া যায় যে, বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া, কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। অনেক সময় রোগ বাড়িয়া মৃত্যুর কারণও হইতে পারে।

যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই আরোগ্য করেন

শরীর প্রকৃতি স্বাভাবতঃই আপনাকে সুস্থ করিতে চেষ্টা করে। সহসা হয়ত আমাদের হাতের একখণ্ড চামড়া আঁচড়াইয়া গেল; তাহাতে ঘা যদি ছোট হয়, এবং কোন রোগোৎপাদনকারী জীবাণু উহাতে প্রবেশ না করে, তবে বিনা ঔষধে অল্পকাল মধ্যেই উহা আপনা হইতে সারিয়া যাইবে। বাহুর কোন হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে, যদি হাড়খানির দুইপ্রান্ত একত্র মিলিত হয় এরূপ ভাবে সোজা করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তিন সপ্তাহের মধ্যে ভঙ্গস্থান সম্পূর্ণ জোড়া লাগিবে। বাহ্যিক কোন ঔষধ, মালিস অথবা আভ্যন্তরীণ কোন ঔষধ প্রয়োগ ব্যতীত ভঙ্গ হাড় আপনা হইতেই জোড়া লাগিবে। আমাদের শরীরাভ্যন্তরে যে নিরাময় শক্তি রহিয়াছে ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে কি? সপ্তম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, রক্ত দেহকে নিরাময় ও উহার জীর্ণ সংস্কার করিয়া থাকে। রক্তই দেহের সর্ব্বাঙ্গে পরিপক্ক খাদ্য ও অম্লজান বহন করে, এবং উহারাই জীর্ণ সংস্কারকারী উপাদান। রক্তেই দেহের জীবন নিহিত। রক্তে যে জীবন রহিয়াছে, তাহা মহা জীবন দাতা ঈশ্বর হইতে আইসে; কারণ তিনিই সকল বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সকলকে জীবন ও নিশ্বাস দিয়াছেন।

মহারাজ দায়ুদ বলিয়াছেন, "হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর, তাঁহার সকল উপকার ভুলিয়া যাইও না। তিনি তোমার সমস্ত অধর্ম্ম ক্ষমা করেন, তোমার সমস্ত রোগের প্রতীকার করেন।" প্রথমে ইহা খুব আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, যে ঈশ্বর সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সর্ব্ব বিষয়ের নিয়ন্তা, তিনিই আমাদের রোগমুক্ত করেন; তবুও ইহা কেমন যুক্তি যুক্ত, কেননা তিনিই আমাদের এই দেহের একমাত্র নির্ম্মাতা, তিনি আমাদের দেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং ইহার পক্ষে কি প্রয়োজন ভাল জানেন। শরীরের কোন অংশ বিকল হইলে, কিরূপে উহা সারিতে হইবে, তিনি তাহাও জানেন। ঈশ্বর এরূপ করেন কেন, এই প্রশ্নের উত্তর এই যে তাঁহার প্রেম দেখাইতেই তিনি আমাদের উপর এইরূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

ঈশ্বর আমাদের দেহের ব্যাধি দূর করিয়া চাহেন, যেন অন্তঃকরণের ব্যাধি দূরীকরণেও আমরা তাঁহারই উপরে নির্ভর করি, অর্থাৎ আমাদের পাপক্ষমার জন্য ঈশ্বরের উপরেই নিভর করি। শরীরে কখন কোন যন্ত্রণা বা দুর্ব্বলতা হয় নাই, পৃথিবীতে যেমন এই প্রকার কোনও লোক নাই, সেইরূপ সদাই নিষ্পাপ হৃদয় এমন লোক জগতে একটীও নাই। আমাদের স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার নিমিত্ত যেরূপ আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতেছি, সেইরূপে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের কল্যাণের নিমিত্ত প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের উপরে আমাদের নির্ভর করিতে হইবে।

প্রভু যীশু যখন জগতে মানবগণের মধ্যে ছিলেন, তখন তাঁহার নিকটে একদিন একজন পক্ষাঘাতীকে আনা হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তির বিশ্বাস ছিল দেখিয়া প্রভু তাহাকে কহিলেন. "বৎস তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইল।" তাঁহার পাপ ক্ষমা করিবার ক্ষমতা আছে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য, প্রভু সেই পক্ষাঘাতীকে কহিলেন, "উঠ, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া তোমার ঘরে যাও।" এই কথা বলিবামাত্র পক্ষাঘাতী সুস্থ ও সবল হইয়া, পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল, এবং চলিয়া গেল। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে প্রভু আমাদের শারীরিক বা আধ্যাত্মিক সকল প্রকার দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে পারেন।

২০শ অধ্যায়

ফলদায়ক প্রতীকারসমূহ

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় বিবৃত বিষয়গুলি হইতে বুঝা যায়, মানুষের নিজের কোন ব্যাধি সুস্থ করিবার ক্ষমতা নাই। এই কথা সত্য হইলেও মানুষ অনেক প্রকারে স্বাভাবিক নিরাময়কারী শক্তিকে সাহায্য করিতে, বা বাধা দিতে পারে। যে সকল উপায় দ্বারা স্বাভাবিক নিরাময়কারী শক্তিকে সাহায্য করা যায়, সেই সকল বর্ণনা করাই এই গ্রন্থের একটী প্রধান উদ্দেশ্য।

স্বাভাবিক প্রতীকার

যে সকল পন্থা অবলম্বনে, প্রায় সকল ব্যাধি আরোগ্যের সহায়তা করে, এই অধ্যায়ে আমরা সেই সমুদয় পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। উহাদিগকে স্বাভাবিক প্রতীকার বলে, কারণ উহাতে কোন বিষাক্ত ঔষধের প্রয়োগ নাই, যে সকল বস্তু হইতে মানবদেহ স্বাভাবতঃ শক্তি ও স্বাস্থ্য লাভ করে, তাহারই প্রয়োগ মাত্র। তন্মধ্যে কতকগুলি অতিশয় সাধারণ ও সুলভ, অথচ খুবই ফলপ্রদ।

সূর্য্যকিরণ

সূর্য্যকিরণ না পাইলে, বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা দেখিলেই, স্বাস্থ্যের সহিত সূর্য্যকিরণের সম্পর্ক বুঝা যায়। একটী চারাগাছকে সূর্য্যালোক হইতে কোনও অন্ধকারময় স্থানে লইয়া গেলে, উহা পীতাভ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কোন প্রাণীকেও অন্ধকারে রাখিলে দুর্ব্বল ও পীড়িত হয়।

সূর্য্যকিরণ উদ্ভিদ্‌কে যেরূপ সতেজ করে, আমাদের দেহকেও সেইরূপ শ্রী-সম্পন্ন করিয়া তুলে। সূর্য্যকিরণে রোগ জীবাণু অত্যল্পকাল মধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়। দেহের যে সকল অঙ্গ সর্ব্বদা অনাবৃত থাকে, সেই সমুদয় অঙ্গে, কোন প্রকার চর্ম্মরোগ প্রায় প্রকাশ পায় না। হাসপাতালে বহুবার দেখা গিয়াছে যে, উন্মুক্ত বারান্দায় বা যে সকল কক্ষে সূর্য্যালোক অবাধে প্রবেশ করিতে পারে, সেই সমুদয় কক্ষে শায়িত রোগিগণ, ক্ষীণ আলোকিত কক্ষের রোগীদিগের তুলনায়, অল্প সময়ে সারিয়া উঠেন। ক্ষয় রোগের চিকিৎসায় সূর্য্যালোক অতিশয় প্রয়োজনীয়—ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। যে রোগেই হউক না কেন, রোগীকে প্রচুর আলো আছে এমন গৃহে রাখা কর্ত্তব্য; গৃহের বাহিরে চাঁদোয়া বা অন্য কোন আচ্ছাদনের নিম্নে রাখিতে পারিলে আরও ভাল হয়। সূর্য্যই জগতের উত্তাপ, আলোক ও শক্তির মূলাধার। ইহা জীবনদায়ী। বাড়ীর প্রতিকক্ষ যাহাতে উত্তমরূপে আলোকিত হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যাঁহারা অল্পালোক বিশিষ্ট গৃহে বাস করেন, তাঁহারা সহজেই রোগাক্রান্ত হন।

বিশ্ব-ব্যাপী স্বাস্থ্য-সংস্থাপন প্রণালী

1. ষ্টান্‌বোরাফ্ পার্ক স্বাস্থ্যনিবাস, ওয়াট্‌ফোর্ড, ইংলণ্ড।
2. স্কড্‌স্‌বার্গ স্বাস্থ্যনিবাস, স্কড্‌স্‌বার্গ, ডেন্‌মার্ক।
3. গিফোর্ড মিশন হাঁসপাতাল, হুজ্‌ভিড, দক্ষিণ ভারত।

বিশুদ্ধ বায়ু

কাহারও দেহে বাতাসের চলাচল বন্ধ হইলে, তিনি অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে মরিয়া যান। বাতাস না পাইলে আগুন জ্বলিতে পারে না। প্রতিনিয়ত নিশ্বাসের সহিত নির্ম্মল বায়ু গ্রহণ না করিলে, আমাদের শরীর স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক উত্তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে না। সুস্থ ব্যক্তি অপেক্ষা রুগ্ন ব্যক্তির বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন অধিক। এই গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিক্ষণ নির্ম্মল বায়ু গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে।

জল

পৃথিবীতে জল সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও সাধারণ। কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ্ জল ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। ওজন অনুসারে আমাদের দেহের দুই তৃতীয়াংশ জলীয় পদার্থ।

কোন লোক যদি খাদ্যে ও পানীয়ে প্রতিদিন যথোপযুক্ত জল গ্রহণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে, সত্বরই শক্তিক্ষয় হইতে থাকিবে। ৮ম ও ৯ম অধ্যায় দেখান হইয়াছে যে, দেহের সর্ব্বত্র প্রতিক্ষণ যে সমুদয় বিষ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে চর্ম্ম ও বৃক্কদ্বয়ের সাহায্যার্থে আমাদের প্রচুর পরিমাণ জল পান করা প্রয়োজন। স্নান দ্বারা যেরূপ আমাদের শরীরের বহির্ভাগ ধৌত হয়, জল পান দ্বারা সেইরূপ অভ্যন্তরভাগ ধৌত হইয়া থাকে।

মানুষের প্রায় প্রত্যেক ব্যাধির চিকিৎসায় জল প্রয়োজনীয়। ঔষধাদি আবিষ্কৃত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতে রোগের প্রতীকারের নিমিত্ত জল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এবং সকল ঔষধ অপেক্ষা ইহাই রোগে অত্যধিক প্রয়োজনীয়। বয়স্থ ব্যক্তির প্রতিদিন দুই হইতে তিন সের পরিমাণ জল পান করা কর্ত্তব্য। পান করিবার পূর্ব্বে জল সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। পানীয় জল অতিশয় শীতল হওয়া উচিত নহে; এই কারণে বরফ জল পান করিবেন না। পীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রচুর পরিমাণে জল পান করা উচিত। জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রচুর পরিমাণে ঠাণ্ডা জল পান করা বিশেষ আবশ্যক। পেটে বেদনা এবং অম্ল ঢেঁকুর হইতে থাকিলে, গরম জল (যেমন মুখে সহ্য হয়) পান করিলে, বেদনা কমিয়া যায়। প্রত্যেক শিশুকে একটু একটু করিয়া কয়েকবার উত্তমরূপে

স্বাভাবিক উপায়ে মানবের রোগ প্রতীকারের নিমিত্ত সেভেন্থ-ডে-এড্‌ভেন্‌টিষ্ট মিশন যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ বলা যাইতে পারে। নিম্নোক্ত উদাহরণগুলির দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ইহার কতিপয় প্রতিষ্ঠান প্রদর্শিত হইতেছে। খুব বেশী দিন নহে, ভারতের মধ্যে সিমলা স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রামদেশেও কতিপয় হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যথা—পাঞ্জাবের চিকাকী মেলিয়ানে, বিহারের কর্ম্মাটারে, পূর্ব্ববঙ্গের গোপালগঞ্জে, দক্ষিণভারতের গোদাবরী জিলার নার্সপুরে, এবং বেজোয়াডার নিকটবর্ত্তী নুজভিডে।

বিশ্ব-ব্যাপী স্বাস্থ্য-সংস্থাপন প্রণালী

১. ওয়াসংটন স্বাস্থ্যনিবাস, ওয়াসিংটন, কলোম্বিয়া, আমেরিকা।
২. সাংহাই স্বাস্থ্যনিবাস, সাংহাই, চীনদেশ।
৩. রিভার প্লেট স্বাস্থ্যনিবাস, আর্জেনটিনা, আমেরিকা।

সিদ্ধ জল উত্তপ্ত থাকিতে থাকিতে পান করাইবেন; শিশু কাঁদিলেই খাইবার জন্য কাঁদিতেছে বুঝিবেন না, উহারা জল পান করিবার জন্যও কাঁদিয়া থাকে।

রোগ চিকিৎসায় জলের ব্যবহার

রক্তই নিরাময় করে। ৭ম ও ১২শ অধ্যায়ে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। রক্তই শরীরের তাপরক্ষা, রোগের জীবাণু নাশ এবং রোগদুষ্ট বা আহত অঙ্গের জীর্ণ সংস্কার করে। এই জন্য রোগদুষ্ট কোন অঙ্গ নীরোগ করিতে, ঐ অঙ্গে দ্রুত রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। উষ্ণ ও শীতল জলের ব্যবহার দ্বারা, শরীরের যে কোন অঙ্গে রক্ত সঞ্চালন নিয়মিত করা যাইতে পারে। কোন অঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে উষ্ণ ও শীতল জল প্রয়োগ করিলে, সেই অঙ্গের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হয়। গরম জল প্রায় দুই মিনিট কাল প্রয়োগ করিবার পরে, উক্ত অঙ্গের রক্তবহানাড়ীগুলি তাপ পাইয়া প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, উহাদিগকে রক্তপূর্ণ করিবার জন্য অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে রক্ত ধাবিত হইবে; তখন যদি আবার দশ বা বিশ সেকেণ্ডকাল উক্ত স্থানে ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করা হয়, তবে প্রসারিত রক্তবহানাড়ীগুলি পুনরায় সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে, এবং উহাদের মধ্য হইতে রক্ত শরীরের অন্যান্য অংশের রক্তবহা-নাড়ীতে প্রবিষ্ট হইবে। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে উষ্ণ ও শীতল জল প্রয়োগ করিলে,—পাম্প করিয়া দিবার মত—রুগ্ন অঙ্গে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হয়।

সেঁক প্রদান

জল দ্বারা চিকিৎসায় সেঁক অতিশয় ফলপ্রদ। পুরু ফ্লানেল সেঁক দিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। একখানি ফ্লানেলের কম্বল কাটিয়া, দুই জোড়া সেঁক দিবার কাপড়, করা যাইতে পারে। ফ্লানেলের অভাবে যে কোন পশমী কাপড় দ্বারা সেঁকের কাজ চলে। সেঁক দিবার কাপড় যাহাতে সকল অবস্থায়ই ব্যবহার করা চলে, এই জন্য উহা তিন ফুট দীর্ঘ—এবং প্রায় ঐ পরিমাণ চওড়া হওয়া দরকার।

মেরুদণ্ডের উপরে সেঁক দিতে হইলে, সেঁক দিবার বস্ত্রখণ্ড সাত আট ইঞ্চি চওড়া এবং মেরুদণ্ডের মত লম্বা হওয়া দরকার। বক্ষঃস্থল, যকৃৎ, পাকস্থলী, তলপেট প্রভৃতি অঙ্গে সেঁক দিবার সময় কাপড় খানি চওড়া ও ছোট করিয়া ভাঁজ করিতে হইবে। খুব উত্তপ্ত বোধ হইলে, সেঁক দিবার বস্ত্রখণ্ড একটু তুলিয়া লইয়া, একখানি তোয়ালে দ্বারা চামড়ার উপরের জল মুছিয়া লইতে, পরে আবার ঘন ঘন সেঁক দিতে হইবে। রোগী একটু আরাম বোধ করিলে, বাহিরের শুষ্ক কাপড় খানির ভাঁজ খুলিয়া, ভিতরের ভিজা কাপড় বাহির করিয়া, বাহিরের কাপড় যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া পুনরায় পূর্ব্বমত ফুটন্ত জলে ভিতরের কাপড়খানি ভিজাইয়া ও নিংড়াইয়া শুষ্ক করিয়া সেঁক দিতে হইবে। সাধারণতঃ

কি প্রকারে সেঁক

প্রয়োজনীয় উপকরণ:—অগ্নি সংরক্ষণের স্থান (কয়লার উনান, ষ্টোভ্ প্রভৃতি)। একটী বৃহৎ পাত্র অথবা একটী কটাহ যাহাতে নিয়ত জল সিদ্ধ হইতে পারে। একটী বৃহৎ ঢাকুনি যেন উত্তাপ বাহির হইয়া যাইতে না পারে। অন্ততঃপক্ষে দুইটী সেঁক বস্ত্র (চারিটী হইলেই ভাল হয়)। পশম এবং
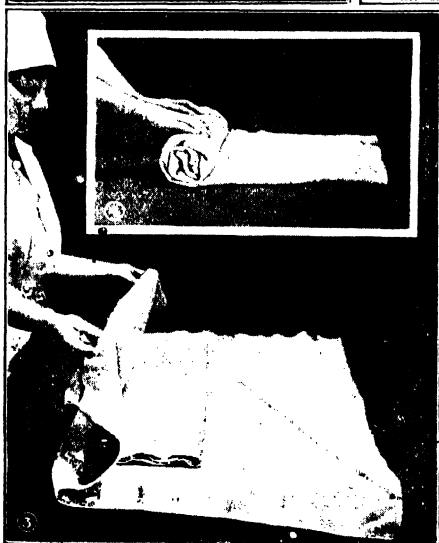
১। একখানি শুষ্ক বস্ত্র টেবিল বা বিছানার উপরে বিছাইতে হইবে; পরে সেঁক দিবার কাপড় খানি তিন ভাঁজ করিয়া দুইপ্রান্ত দুই হাতে ধরিয়া ফুটন্ত জলে ডুবাইয়া লইতে হইবে। যে পর্য্যন্ত না উত্তমরূপে সিক্ত হয়, সেই পর্য্যন্ত দুই প্রান্ত ধরিয়া ফুটন্ত জলে রাখিতে হইবে।

২। পরে কাপড় খানি ভালরূপে ভিজিলে উহার দুইপ্রান্ত সজোরে ধরিয়া কয়েকবার পরস্পর বিপরীত দিকে পাক দিতে অর্থাৎ মোচড়াইতে হইবে, এবং পাক দেওয়া শেষ হইলে, জোরে টানিতে হইবে। এই প্রকারে হাত পুড়াইয়া না ফেলিয়া কাপড়খানি নিংড়াইয়া লওয়া যায়।

৩। এই উষ্ণ বস্ত্র খানি টেবিল বা বিছানার উপরে বিছান শুষ্ক বস্ত্রের উপরে স্থাপন করিতে হইবে। উহা এরূপ বড় হওয়া প্রয়োজন যে

প্রদান করিতে হয়. ?

তুলা মিশ্রিত একখানি কম্বল ৩০" বা ৩৬" ইঞ্চি করিয়া কাটিয়া চতুষ্কোন চারিখানি সেঁকবস্ত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। একখানি বড় তোয়ালে, একখানি ছোট তোয়ালে, এবং এক গামলা শীতল জল বা বরফ জল আবশ্যক।

কয়েকটি ভাঁজ করিলেও কোন অসুবিধা না হয়।

৪। পীড়িত অঙ্গে ঐ বস্ত্র খানি প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা উহা এমনভাবে জড়াইতে হইবে যেন উত্তাপ বাহির হইয়া না যায়।

৫। যে অঙ্গে সেঁক প্রদান করিতে হইবে তাহা একখানি তোয়ালে

দ্বারা অতি উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিয়া সেঁক প্রদান করিবেন। বিছানা যেন ভিজিয়া না যায় তজ্জন্য আর একখানি তোয়ালে ব্যবহার করিবেন। মস্তকের উপরে বরফ সিক্ত একখানি বস্ত্র স্থাপন করিতে এবং উষ্ণ হওয়ামাত্র পুনরায় উহা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

৬। হস্তে একখানি শুষ্ক তোয়ালে জড়াইয়া ঐ তোয়ালের দ্বারা চামড়ার উপরের জল মুছিয়া লইতে হইবে, কারণ রোগী ইহাতে অধিকতর উত্তাপ সহ্য করিতে সমর্থ হন।

৭। সেঁক পরিবর্ত্তন করিবার সময়, অন্য একখণ্ড ভাঁজ করা বস্ত্র গরম জলে ডুবাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় উত্তমরূপে নিংড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত-স্থানে সেঁক দিতে হইবে। সেঁক দিবার পরে সকল সময়ই উক্ত স্থানে ঠাণ্ডাজলে ভিজান কাপড় দিয়া মুছিয়া দেওয়া ভাল। তারপরেই আবার তোয়ালে দ্বারা স্থানটী শুষ্ক করিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। সাধারণতঃ তিনবার সেঁক প্রদান করিতে হয়, কিন্তু যন্ত্রণার উপশমের নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে আরও দেওয়া যায়।

তিন হইতে পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তত সেঁক পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে। এবং পনের কি বিশ মিনিটকাল সেঁক দিতে হইবে। কোন বেদনা বা যন্ত্রণার উপশম করিতে, আধঘণ্টা বা একঘণ্টা কাল সেঁক প্রয়োজন হইতে পারে। সকল অবস্থাতেই সেঁক দেওয়ার বস্ত্রখণ্ড যেন বেশ গরম থাকে।

যে কোন প্রকার বেদনা সেঁক দ্বারা উপশম হইতে পারে, এবং উহাতে কোনই ভয়ের কারণ নাই। সকল রকম মালিস বা প্রলেপের চেয়ে, সেঁক অনেক ভাল। সেঁক পরিবর্ত্তন করিবার সময়, রুগ্নস্থান ঠাণ্ডাজলে ভিজান কাপড় দিয়া শীঘ্র শীঘ্র মুছিয়া লইলে, সেঁক প্রয়োগে অধিক ফল পাওয়া যায়। রুমাল বা তোয়ালের মত পাতলা কাপড় দুই ভাঁজ করিয়া ঠাণ্ডা জলে ভিজাইবেন, এবং পরে ভালরূপে নিংড়াইয়া লইয়া যে স্থানে সেঁক দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থানে কয়েক সেকেণ্ড প্রয়োগ করিবেন। ঠাণ্ডা জল দেওয়া মাত্র, অতি সত্বর ঐ স্থান মুছিয়া শুষ্ক করিয়া ফেলিবেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে সেঁক দিবেন।

সেঁক দিবার পরে সকল সময়েই উক্ত স্থান একটু ঠাণ্ডা জলের কাপড় দিয়া মুছিয়া দেওয়া ভাল। তারপরেই তোয়ালে দ্বারা স্থানটী শুষ্ক করিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

উষ্ণপাদমজ্জন

বিভিন্ন অধ্যায় নানা প্রকার ব্যাধির চিকিৎসা বিবরণে, যে যে রোগে তাপ, সেঁক উষ্ণপাদমজ্জন (Hot foot bath), আকণ্ঠ স্নান (Sitze bath), বস্তিক্রিয়া বা অন্তর্ধৌত (Enema) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, তাহা উল্লেখ করা হইবে।
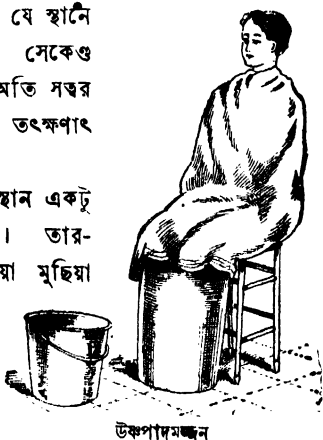
পাদমজ্জন

উষ্ণপাদমজ্জনের নিমিত্ত একটী বৃহৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত জলাধার, গামলা অথবা বাল্‌তি, ব্যবহার করা যাইতে পারে। পাদমজ্জনের জল পায়ের গোড়ালির উপর পর্য্যন্ত পৌঁছিবে, এবং জলের উত্তাপ প্রথমে ১০৫° ডিগ্রি ফারেন্‌হাইট্‌ হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। পায়ের উত্তাপ বেশী বোধ হয়, সেই জন্য এই জলে কিছুক্ষণ পা ভিজাইয়া রাখিবার পর, ক্রমশঃ সহনীয়রূপে একটু একটু গরম জল ঢালিয়া দিয়া গরমের মাত্রা অধিক বাড়াইয়া দিতে হইবে। এই প্রকার মজ্জন পাঁচ হইতে বিশ মিনিট কাল ধরিয়া চলা উচিত। উষ্ণপাদমজ্জনের কালে, এক টুক্‌রা কাপড় ঠাণ্ডা জলে ভিজাইযা ও নিংড়াইয়া, রোগীর

কপালের উপরে রাখিয়া দিতে হইবে, মাঝে মাঝে এই কাপড় বদলাইতে হইবে। উক্ত ঠাণ্ডা পটীর নিমিত্ত মাথা ধরা বা মাথা ঘোরা জন্মিতে পারে না।

পনের কি বিশ মিনিট কাল উষ্ণপাদমজ্জন ঘাম বাহির করিবার সুন্দর উপায়। এইরূপে ঘাম বাহির করিতে চাহিলে, রোগীকে কম্বল দ্বারা ঢাকিয়া দিতে ও যতক্ষণ তাহার পা গরম জলে থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে গরম জল পান করিতে দিতে হইবে, এবং পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপ ভাবে মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে হইবে। তারপরে তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া ভালরূপে বস্ত্রাবৃত করিতে এবং ঘাম বাহির হইতে দিতে হইবে।

মাথাধরার পক্ষে উষ্ণপাদমজ্জন খুব উপকারী। জ্বরের প্রারম্ভে, বস্তি-প্রদেশের কোন অঙ্গের প্রদাহে, শীত শীত বোধ হইলে, ঘর্ম্ম উৎপন্ন করিতে হইলে, ঘা বা বেদনা হইলে, অথবা পায়ে ঠাণ্ডা লাগিলে, উক্ত প্রক্রিয়া ফলপ্রদ।

উষ্ণজলে বড় চামচের দুই এক চাম্‌চে সরিষার গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দিলে, উহার ফল আরও ভাল হইবে। জ্বরাক্রান্ত রোগী এবং দুর্ব্বল রোগীদিগকে শায়িত অবস্থায় পাদ-মজ্জন দেওয়া কর্ত্তব্য।

আকটি স্নান

আকটি স্নানে একটী সাধারণ টব ব্যবহৃত হইতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় জল সাধারণতঃ ১০৫° ডিগ্রি হইতে ১২৫° ডিগ্রি ফারেন্‌হাইট্ উত্তপ্ত থাকে; উহা ফলপ্রদ। সাধারণতঃ ৫ হইতে ১৫ মিনিট কাল ইহা প্রয়োগ করা হয়।

আকটি স্নানের সময়ে পদদ্বয় একটী উষ্ণজলপূর্ণ ক্ষুদ্রতর টবে রাখিয়া, রোগীর দেহের উপরার্দ্ধ কোন পোষাক বা কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত রাখিতে হইবে, এবং তাহার কপালে ঠাণ্ডা জলের পটী দিতে হইবে।

জরায়ু, ডিম্বকোষ, মূত্রাশয় অথবা যোনি প্রদাহের নিমিত্ত, বস্তি প্রদেশে বেদনা হইলে, আকটি স্নান উপকারী, স্ত্রীলোকদিগের রজোস্রাব কালের পূর্ব্বে অথবা রজোস্রাব কালে বিষম যাতনা উপশম, অথবা রজোস্রাব করাইতে এইরূপ প্রক্রিয়া অতিশয় ফলপ্রদ। রজোস্রাব করাইতে ক্রমাগত কয়েকদিন দৈনিক দুই তিন বার ঐরূপ করা প্রয়োজন হইতে পারে; কটিতে কোন বেদনা উপস্থিত হইলেও, এই প্রক্রিয়া দ্বারা সুফল হইবে।

উষ্ণ আকটি স্নানের পরে, একখানি ঠাণ্ডা জলে ভিজান তোয়ালে দ্বারা সিক্ত অঙ্গ তাড়াতাড়ি ঘষিয়া পরে শুষ্ক তোয়ালে দ্বারা উত্তমরূপে মুছিতে হইবে

ঠাণ্ডাজলে গাত্রঘর্ষণ (Cold Mitten Friction)

মোটা আল্‌পাকা বা পুরু তোয়ালে দ্বারা একখানি হাত ঢোকে এরূপ একটী ছোট থলি করিয়া, একখানি হাত উহার মধ্যে ঢুকাইয়া, হাতের কাছে একভার জল লইতে হইবে। তারপর ঐ হাতখানি জলে ডুবাইয়া অন্য হাত দিয়া রোগীর হাত ধরিতে হইবে। পরে জল নিংড়াইয়া ফেলিয়া খুব তাড়াতাড়ি রোগীর অঙ্গুলি হইতে কাঁধ এবং পুনরায় কাঁধ হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত পুঁছিয়া রোগীর যাহাতে কষ্ট না হয়, সেইরূপ বেগে দ্রুত ঘর্ষণ করিতে হইবে। দুই তিন বার এরূপ করিতে হইবে। পরে মোটা তোয়ালে দ্বারা তাড়াতাড়ি ঘষিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপে অপর হস্ত, বক্ষঃস্থল, পদদ্বয় এবং পশ্চাদ্ভাগও ঘর্ষণ করিতে হইবে। প্রতি অঙ্গ এইপ্রকারে ঘর্ষণ করিবার পর, শুষ্ক করিয়া, কাপড় ঢাকা দিয়া রাখিতে হইবে। এই ভাবে শরীরের সমুদয় অঙ্গে ইহা প্রয়োগ করিতে যেন বার হইতে পনের মিনিটের অধিক সময় না লাগে উক্ত প্রক্রিয়ার সফলতা বেশীর ভাগ ইহার দ্রুত সম্পাদনের উপরে নির্ভর করে। টাইফয়েড্ জ্বর বা অন্ত্রোপাঙ্গ প্রদাহ (Appendicitis) প্রভৃতি রোগে উক্ত প্রক্রিয়া যেন তলপেটে প্রদান করা না হয়।

উষ্ণ সেঁক প্রভৃতি গরম কোন প্রক্রিয়ার পরে উপরি উক্ত প্রণালী দ্বারা অতিশয় উপকার পাওয়া যায়।

অনেক স্থলে বহুরোগীকে সেঁক প্রদানের পরে দৈনিক এক বা দুই তিন বার ঠাণ্ডাজল দ্বারা উক্ত প্রকারে ঘর্ষণ করিয়া নবজীবন দান করা যাইতে পারে।

শরীরে ব্রণ প্রভৃতি কোন চর্ম্মরোগ হইলে, কোন প্রকার ঘর্ষণ করা উচিত নহে।

যাহাদিগের ঠাণ্ডাজল ব্যবহার করিবার অভ্যাস নাই, এবং যাহারা বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল, প্রথমে তাহাদের সাধারণ অর্থাৎ ৮০° ডিগ্রি ফারেন্‌হাইট্ উষ্ণজল দ্বারা ঘর্ষণ করা কর্ত্তব্য, শেষে দুই এক ডিগ্রি করিয়া প্রতিদিন জলের উষ্ণতা কমান যাইতে পারে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের ডুস

জলধারণ করিবার জন্য পাঁচ ইঞ্চি ব্যাস ও দশ কি এগার ইঞ্চি লম্বা একটী টিন বা লোহার পাতের পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া উহার তলদেশে একটী চুঙ্গি ঝালাই করিয়া লউন। উক্ত চুঙ্গির সঙ্গে চারি ফুট বা ততধিক দীর্ঘ একটী রবারের নল

সংযুক্ত করিয়া দিবেন, এবং এই রবারের নলের শেষ প্রান্তে কাঁচ বা রবার নির্ম্মিত অপর একটী সচ্ছিদ্র নল (Vagina Douche Tube) যুক্ত করিবেন। [চিত্র দেখুন)।

রোগিণী চিৎ হইয়া শয়ন করিবেন, এবং তাঁহার কটির নীচে একটী বেড্‌প্যান রাখিয়া দিবেন। রবারের নলের শেষ প্রান্তভাগে প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা, কাঁচ অথবা রবার নির্ম্মিত একটী সচ্ছিদ্র নলমুখ থাকিবে। উক্ত নলমুখ যোনি মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, উহার নিম্ন প্রান্ত দিয়া, নলটী একবার ভিতরে পুনরায় বাহিরে চালিত করিবেন। জল পাত্রটী কটিদেশ হইতে প্রায় তিন ফুট উচ্চে স্থাপন করিবেন।

যোনিদেশ শুধু ধৌত করিবার উদ্দেশ্যে জল ১০০° ডিগ্রি ফারেন্‌হাইট্ উষ্ণ করিতে হইবে।

বস্তি প্রদেশের বেদনার নিমিত্ত ডুস্ দিতে হইলে, জল ১১০° ডিগ্রি হইতে ১১৫° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উষ্ণ এবং জলের পরিমাণ ৪ সের হওয়া উচিত।

রজোনির্গমন নিয়মিত করিবার জন্য ১০৩° ডিগ্রি উষ্ণ কয়েক সের জল দৈনিক দুই তিন বার প্রয়োগ করিতে হইবে।

পর্য্যায়ক্রমে উষ্ণ ও শীতল জলে নিমজ্জন

হস্ত বা পদে কোন প্রকার বিষাক্ত ক্ষত বা ঘা হইলে, একই সময়ে পর পর উষ্ণ ও শীতল জলে ক্ষত স্থান নিমজ্জিত করা উৎকৃষ্ট। এক বাল্‌তি অতি উষ্ণ, এবং এক বাল্‌তি শীতল জল লইতে হইবে। হাত বা পায়ের ক্ষত স্থান প্রথমে এক মিনিটকাল গরমজলে ডুবাইয়া পরে গরম জল হইতে উহা উঠাইয়া, তৎক্ষণাৎ কেবল এক সেকেণ্ডকাল ঠাণ্ডাজলে রাখিতে হইবে। আধ ঘণ্টা কাল এইরূপ করিতে হইবে। প্রতিবারে আধ ঘণ্টা করিয়া দৈনিক তিনবার এই প্রক্রিয়া করিতে, যে কোন প্রকার বিষাক্ত ক্ষত এবং কাটা ঘায়ে চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে। গরম জলের প্রতি দুইশত ভাগে, একভাগ লাইসল্ (Lysol) মিশাইয়া লইলে ফল আরও ভাল হয়।

ছেঁচিয়া গেলে বা মচ্‌কাইয়া গেলে, জলে লাইসল না দিয়া, উক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা সুফল লাভ হইবে।
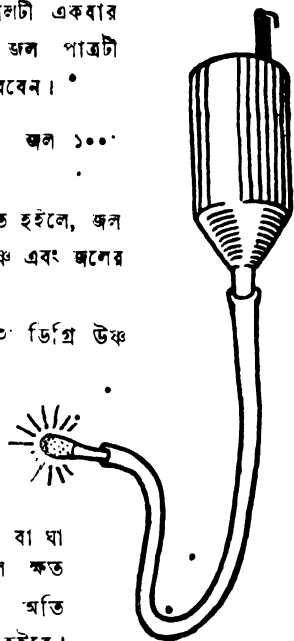
বস্তিক্রিয়া বা অন্ত্রধৌত (The Enema)

পেট পরিষ্কার করিবার জন্য বস্তিক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। বস্তিক্রিয়ার নিমিত্ত, স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের জন্য বর্ণিত ডুস্‌ক্যানের ন্যায় একটী ডুস্‌ক্যান এবং কাঁচের মুখনল বিশিষ্ট একটী ডুস্‌টিউব প্রয়োজনীয়। ছোট বালকবালিকাদিগের জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মুখনল ব্যবহার করিতে হইবে। বস্তিক্রিয়ায় গরমজল

শিশুকে ডুস্ দেওয়া
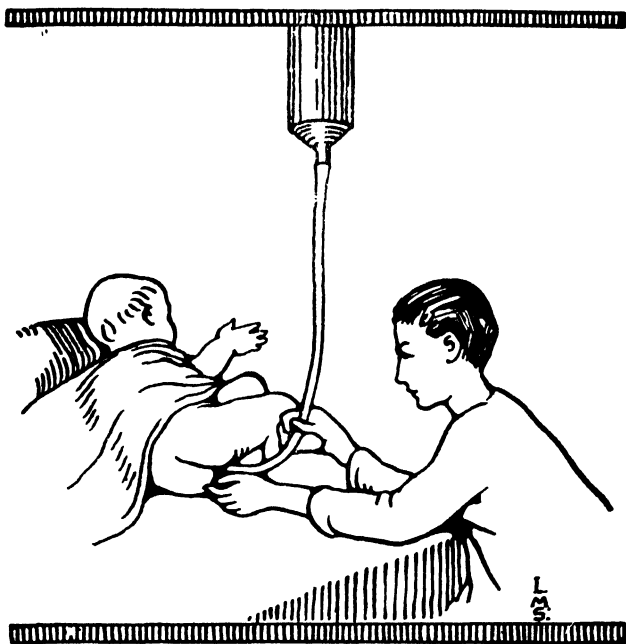
পূর্ব্ব হইতেই ফুটাইয়া সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে, এবং রোগীকে চিৎ বা কাৎ করিয়া শয়ন করাইতে হইবে।

শুধু মলত্যাগের উদ্দেশ্যে বস্তিক্রিয়ায় বয়স্কদিগের নিমিত্ত ১০০° ডিগ্রি ফারেন্‌হাইট্ উষ্ণ দুই তিন সের পরিমাণ জল ব্যবহার করিতে হইবে। ডুস্‌ক্যানের (জলাধারে) গরম জল ঢালিয়া দিয়া উহা বিছানা হইতে তিন ফুট উচ্চে স্থাপন করুন। জল বাহির হইয়া না যায়, এই জন্য স্রবারের নলটী টিপিয়া রাখিবেন। মুখনলে একটু ভেস্‌লিন্ অথবা পরিষ্কার নারিকেল তৈল

মাখাইয়া উহা মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবেন; নলটী পিছন দিকে ঘেঁষিয়া উপরের দিকে ঠেলিয়া দিতে হইবে। দুই তিন ইঞ্চি প্রবেশ করাইয়া দিয়া, টিপিয়া রাখা নলটী ছাড়িয়া দিউন, জল মল দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে থাকুক। রোগীর অতিশয় যন্ত্রণা বোধ হইলে, কিছুকাল নল টিপিয়া জলস্রোত বন্ধ রাখিবেন, পরে কমিলে পুনরায় প্রয়োগ করিতে থাকিবেন। পেটে সম্পূর্ণ জল, অন্ততঃ অধিকাংশ প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত রোগীর মল ত্যাগ করিবার ইচ্ছা রোধ করিতে হইবে। জল প্রবিষ্ট হওয়ার পরে, তলপেটে হাত দিয়া ডলিবার প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপ করিলে জল সহজে উপর পেটের দিকে যাইতে পারিবে ও উত্তমরূপে পেট পরিষ্কার হইবে।

পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, অথবা কোন কারণে কয়েক দিন ধরিয়া প্রত্যহ বস্তিক্রিয়ার আবশ্যক হইলে, ৭০° ডিগ্রি ফারেন্‌হাইট্ উষ্ণজল প্রয়োগ করা উত্তম।

নিউমোনিয়া অথবা টাইফয়েড্ জ্বরে, জ্বরের মাত্রা অত্যধিক হইলে, ৭০° ডিগ্রি ফারেন্‌হাইট্ বস্তিক্রিয়া দ্বারা জ্বরের উত্তাপ হ্রাস করা যায়। প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর উহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। হামজ্বরে খুব বেশী জ্বর হইলে ৮০° বা ৯০° ডিগ্রি ফারেন্‌হাইট্ উষ্ণ বস্তিক্রিয়া দেওয়া উচিত। শিশুদিগের বস্তিক্রিয়ায় ঠাণ্ডাজল ব্যবহার করা উচিত নহে।

বিষম উদরাময়ে ১১০° ডিগ্রি হইতে ১১৫° ডিগ্রি ফারেন্‌হাইট্ উষ্ণ জল দ্বারা বস্তিক্রিয়া সম্পন্ন করা যাইতে পারে। টাইফয়েড্ জ্বরে কখনও এরূপ করিবেন না। টাইফয়েডে মলত্যাগের পরে, অথবা দিবসে কয়েকবার ৯০° ডিগ্রি উষ্ণজল দ্বারা বস্তিক্রিয়া সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। যিনি রোগীকে উক্ত যে কোন প্রকার ডুস্ দিবেন, ডুস্ দেওয়া হইয়া গেলে, তাহাকে উত্তমরূপে সাবান দিয়া হাত ধুইতে হইবে।

উষ্ণজল-পূর্ণ ব্যাগ

রবারের ব্যাগ উষ্ণজল দ্বারা পূর্ণ করিলে, অনেকক্ষণ গরম থাকে, এবং এক টুক্‌রা আর্দ্র ফ্লানেল দ্বারা মুড়িয়া লইয়া উহা দ্বারা সেঁক দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ শুষ্ক সেঁক অপেক্ষা আর্দ্র সেঁক অধিক উপকারী। পিঠে বেদনায়, দন্তশূলে, রজোস্রাবকালীন যন্ত্রণায়, তলপেটে বেদনায়, উষ্ণজল-পূর্ণ ব্যাগ দ্বারা সেঁক নিতান্ত আবশ্যক।

ব্যাগের এক তৃতীয়াংশ গরম জল দ্বারা পূর্ণ করুন, তারপর ব্যাগটির দুই দিক ধরিয়া একসঙ্গে জলের উপরে চাপুন, ইহাতে ভিতরের বাষ্প এবং বায়ু

বাহির হইয়া যাইবে। ইহার পরে ব্যাগের মুখ বন্ধ করিয়া দিউন, যেন জল বাহির হইতে না পারে। পায়ের উপরে সেঁক দিবার সময় ব্যাগটি ফ্লানেল দ্বারা জড়াইয়া লইতে হইবে। রোগী অচৈতন্য থাকিলে সেঁক দিবার সময় যেন তাহার শরীরের কোন অংশ পুড়িয়া না যায়, সে বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে।

বরফ ব্যতীত কিরূপে ঠাণ্ডা পটী দেওয়া যায়

এই অধ্যায়ে আমরা কয়েকবার ঠাণ্ডা পটীর কথা বলিয়াছি। অনেক স্থানে বরফ অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, এরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে; একখানি পাতলা কাপড় বা তোয়ালে জলে ভিজাইয়া এবং জল নিংড়াইয়া না ফেলিয়া উহার দুই কোন ধরিয়া আন্দোলিত করিতে থাকুন। বিশ পঁচিশ বার এইরূপ জোরে আন্দোলিত করিলে তোয়ালে খানি অতিশয় ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।

স্পঞ্জিং (Sponging) (মুছিয়া লওয়া)

স্পঞ্জ দ্বারা, বা কাপড় দ্বারা, বা কেবল হাত দ্বারা, জলীয় পদার্থ প্রয়োগকে স্পঞ্জিং বলে। ইহাতে উক্ত তরল পদার্থ হইতেই উপকার পাওয়া যায়, একটু ঘর্ষণও প্রয়োজন।

সাধারণ গরম বা ঠাণ্ডা জল, কিংবা লবণ বা খাবার সোডা মিশ্রিত শির্কা, অথবা সুরা এই কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। ঠাণ্ডা জলে গামছা দিয়া গাত্র ঘর্ষণের নিয়ম অনুসারে ইহাও শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রয়োগ করিতে হইবে [১১৭ পৃষ্ঠা দেখুন]।

জ্বর কমাইবার জন্য ঠাণ্ডাজল প্রয়োগ করিতে হইবে। পরে না ঘষিয়া প্রত্যেক অঙ্গ ধীরে ধীরে শুকাইয়া ফেলিতে হইবে। জ্বরের সহিত শীত বোধ হইলে, ঠাণ্ডা জলে গা মুছিবার প্রণালীতে গরমজলে গা মোছান যাইতে পারে। অল্প পরিমাণ লবণ মিশ্রিত জল, সোডার জল, লবণ মিশ্রিত শির্কা বা মদ প্রয়োগ করিতে খালি হাতই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত।

এইরূপ লবণ প্রয়োগ করিতে হইলে আধপোয়া লবণ মাঝারি গাম্‌লার এক গাম্‌লা ঈষদুষ্ণ জলে বা ঠাণ্ডাজলে মিশাইয়া লইতে হইবে। ইহা শক্তি-বর্দ্ধক এবং দুর্ব্বল রক্তহীন ব্যক্তির পক্ষে রক্তসঞ্চালনীর উদ্দীপক।

আল্‌কালি (ক্ষার বিশেষ) ঐরূপে ব্যবহার করিতে এক ছটাক খাইবার সোডা (Sodium bi-carbonate) এক গাম্‌লা ঠাণ্ডা জলে মিশাইয়া লইতে হয়।

চুলকণা বা পিত্তগোটায় কেবল যে স্থানে উহা হইয়াছে সেই স্থানে উহা প্রয়োগ করিতে হয়।

শির্কা (Vinegar) ও লবণ একত্রে ঐরূপে প্রয়োগ করিলে, ক্ষয়রোগে রাত্রিকালীন ঘাম বন্ধ হয়। সমান পরিমাণ জল ও শির্কা আধ পাইট লইয়া তাহাতে বড় চামচের এক বা দুই চামচে লবণ মিশাইয়া শরীরের যে অংশ বেশী ঘামায় তাহাতে প্রয়োগ করিতে হইবে।

ঘাম হইবার জন্য স্নানের পর, কিংবা রাত্রিতে রোগীকে সুস্থ রাখিতে সুরা ঘর্ষণ প্রযোজ্য। ঠাণ্ডাজলে ভিজান হাত বা গামছা দিয়া না ঘষিয়া, সুরা ঘষা যাইতে পারে। কিন্তু সুরায় ফল কম হয়। শস্য হইতে উৎপন্ন সুরা এবং জল সম পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে। অন্য প্রকার সুরা চর্ম্মের উপরে বিষক্রিয়া করে, কাজেই উহা ব্যবহার করা উচিত নহে।

২৭শ অধ্যায়

জীবাণু দ্বারাই রোগ উৎপন্ন হয়

যে সব শত্রু আকারে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, তাহারাই মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু। গ্রামের মধ্যে একটী নরখাদক ব্যাঘ্র প্রবেশ করিয়াছে, এই সংবাদে সকলেই ত্রস্ত হয়। তখন যাহাদের বন্দুক বা তরবারি আছে তাহারা বাঘটাকে হত্যা করিতে ছুটিয়া যান, এবং যাহাদের কোন প্রকার অস্ত্র নাই, তাহারা গৃহ মধ্যে দৌড়িয়া গিয়া দরজা বন্ধ করেন। কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে ব্যাঘ্র অপেক্ষাও ভীষণ অসংখ্য শত্রু রহিয়াছে। একটী বাঘ হয়ত দুই তিন জন লোক মারিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু এই শত্রুগণ প্রত্যেক গ্রামে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে, এবং ইহারাই গ্রামের শত করা ৭৮ জনের মৃত্যুর কারণ। রোগোৎপাদক জীবাণুই এই শত্রু।

রোগজীবাণু কি ?

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আমরা রোগোৎপাদক জীবাণুর উল্লেখ করিয়াছি। উহারা এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত উহাদিগকে দেখা যায় না। চোখে দেখা যায়, এমন অনেক ছোট ছোট উদ্ভিদ্ ও প্রাণী আছে। একটী পুকুরের পানা, ঐ পুকুরের ধারেরই একটী তালগাছের তুলনায় কত ছোট। যে সকল ছোট ছোট পোকা এক জন ছয় ফুট লম্বা লোকের বিরক্তি উৎপাদন করে, উহারা ঐ ব্যক্তির তুলনায় কত ছোট? কিন্তু তালগাছের তুলনায় একটী পানা, একজন ছয় ফুট লম্বা

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার

লোকের তুলনায় একটী পোকা যে পরিমাণে ছোট, পান্না ও পোকার তুলনায় সেই পরিমাণে ছোট উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীও বহুপ্রকারের আছে। রোগোৎপাদক জীবাণু এই প্রকার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর অন্তর্ভূত। উহাদের অধিকাংশ এত ক্ষুদ্র যে, এক হাজার জীবাণু এক স্থানে জড় করিলে, একটী সরিষার দানা অপেক্ষা বড় হইবে না; অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোন কোন জীবাণুকে সহস্রগুণ বাড়াইয়া তুলিলে কিরূপ দেখা যায়, তাহাই চিত্রে দেখান হইল। কতকগুলি জীবাণু দীর্ঘ এবং কতকগুলি গোলাকার।

জীবাণু খুব দ্রুত বাড়িয়া থাকে। শস্যের একটী বীজ পুঁতিলে, উহা অঙ্কুরিত হইয়া চারা গাছে পরিণত হইতে, এবং পরে পুনরায় শস্য বহন করিয়া উহা হইতে বীজ উৎপাদন করিতে কয়েক মাস সময় আবশ্যক হয়। কিন্তু কোন উপযুক্ত স্থানে থাকিয়া, একটী জীবাণু আধ ঘণ্টার মধ্যেই দুইটীতে

আমাশয়-জীবাণু কলেরা-জীবাণু
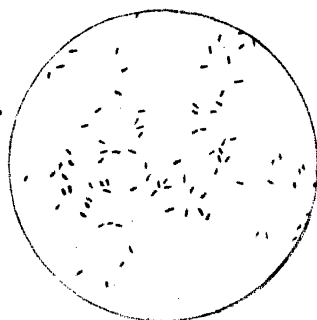
পরিণত হয়; পরবর্ত্তী আধ ঘণ্টায় উক্ত জীবাণুদ্বয় চারিটিতে বিভক্ত হইবে; এবং পুনরায় আধ ঘণ্টা পরে দ্বিগুণ হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ আটটী হইবে। এই অনুপাতে বাড়িতে থাকিলে, একটী জীবাণু হইতে দশ ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ জীবাণু সৃষ্টি হইতে পারে।

একটু উষ্ণ অথচ স্যাঁৎসেঁতে স্থানেই জীবাণু বৃদ্ধি পায়। অল্প উষ্ণ, স্যাঁৎসেঁতে ও অন্ধকারময় স্থানে জীবাণু বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। প্রায় সকল উদ্ভিদ্ ও প্রাণীই সূর্য্যকিরণে পরিপুষ্টি লাভ করে; কিন্তু উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে জীবাণু বিনষ্ট হয়। যে স্থানে পচা শাকসব্জি অথবা কোন প্রাণীর মৃত দেহ পড়িয়া থাকে, সেই স্থানে রোগজীবাণু বৃদ্ধি পাইবার বিশেষ সুবিধা হয়। সাধারণতঃ স্থান যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং রৌদ্র পূর্ণ হয়, জীবাণুর সংখ্যাও তত অল্প দেখা যায়।

জীবাণুগুলি খুব ছোট, ও হাল্কা বলিয়া, এবং যে কোন স্থানে প্রায় সকল জিনিষের উপরেই ইহা বাড়িতে পারে এই জন্য উহারা সর্ব্বত্রই ছড়ান রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে জীবাণু শূন্য কোন স্থান দেখান সম্ভব নহে। আমাদের নাসারন্ধ্রে, মুখবিবরে ও চর্ম্মের উপরে, আমাদের নানা দ্রব্যে, খাদ্যে ও পানীয় জলে, আমাদের গৃহের মেজে ও প্রাচীরে, গৃহপ্রাঙ্গণে, পুকুরে, পাতকুয়ায়, ও নদীরজলে এবং আমাদের শ্বাস বায়ুতে সর্ব্বত্রই উহারা বিদ্যমান। উচ্চ পর্ব্বতোপরিস্থ বায়ুতে বা টিউব ওয়েলের জলে, কোন প্রকার রোগজীবাণু থাকে না। যে স্থানে মানুষের বসতি খুব ঘন, সেই স্থানেই অধিক মাত্রায় জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়।

সকল প্রকার জীবাণুই অনিষ্টকর নহে; কিন্তু অনিষ্টকর জীবাণুর সংখ্যা এত অধিক যে, সকল প্রকার জীবাণুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ।
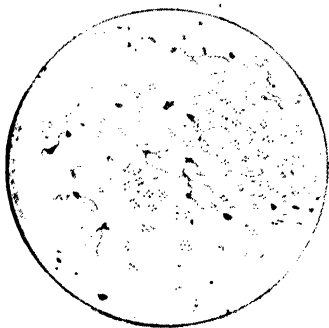
বৃহদন্ত্রাড়ী সংলগ্ন জীবাণু—ইহাতে উদরাময় উৎপন্ন করে টাইফয়েড্-জীবাণু
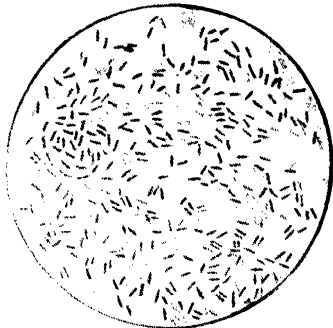
জীবাণু দ্বারা কিরূপে ব্যাধি উৎপন্ন হয়?

কলেরা, টাইফয়েড্, কণ্ঠক্ষত (Diptheria), ক্ষয়রোগ, প্লেগ, দুষ্টব্রণ, হাম, উপদংশ, গণোরিয়া, প্রভৃতি ব্যাধি জীবাণু দ্বারা নিম্নলিখিতরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। লাক্ষাগাছ ও বিষাক্ত আইভিলতার ন্যায়, কতকগুলি গাছ আছে, ঐ সকল গাছ হইতে এক প্রকার বিষ বাহির হয়; যে কেহ উহার সংস্পর্শে আইসে, তাহার শরীর বিষাক্ত হইয়া, শরীরে গোটা গোটা বাহির হয় ও জ্বর হয়। শরীরে জীবাণু প্রবেশ করিলে, উহারা তথায় বৃদ্ধি পাইতে, ও আইভি-গাছের মত বিষ বাহির করিতে থাকে। জীবাণু দ্বারা আমাদের যে সকল রোগ হয় সেই সকল রোগে, জ্বর, মাথাধরা, বেদনা ও উদরাময়, প্রভৃতি উপসর্গ ঐ বিষ হইতে হইয়া থাকে।

রোগজীবাণু কোথা হইতে আইসে ?

রোগোৎপাদক জীবাণু আমাদের দেহের মধ্যে জন্মে না। উহারা বাহির হইতে শরীরে প্রবেশ করে। পীড়িত ব্যক্তি ও রুগ্ন পশু হইতে রোগ-জীবাণু বিস্তৃত হয়। যেমন কলেরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহে কালেরা—জীবাণু আছে। ঐ ব্যক্তির খাইবার থালায়, অপর কোন খাদ্য পাত্রে, উহা ব্যবহার করিবার সময় তাহার হাত ও মুখ হইতে কলেরা রোগের জীবাণু পড়ে; অপর কোন ব্যক্তি যদি ফুটন্ত জলে ধৌত না করিয়া ঐ সমুদয় থালা বা পাত্র ব্যবহার করেন, নিশ্চয়ই তিনি কয়েকটী কলেরা রোগের জীবাণু গিলিয়া ফেলিবেন। ঐ সকল জীবাণু অন্ননালীতে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে; এবং অল্প সময় মধ্যে দেহে জ্বর উদরাময় প্রভৃতি কলেরার উপসর্গ সৃষ্টি করিতে যথেষ্ট বিষ উৎপন্ন করিবে। কলেরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মল হইতেও, কলেরা রোগের জীবাণু বিস্তৃত হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তির মল কলেরার জীবাণু দ্বারা পরিপূর্ণ। যদি ঐ মল কোন নদী বা পুকুরের জলে, অথবা কোন পাতকুয়ার পার্শ্বে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে সেই সেই স্থানে জীবাণুগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে; সুতরাং ঐ সমুদয় জলাশয়ের জল পান করিলে সুস্থ ব্যক্তির অন্ননালীতে জীবাণু প্রবেশ করিয়া কলেরা ব্যাধির সৃষ্টি করিবে।

ক্ষয় রোগীর থুথুতে বহু সংখ্যক রোগ জীবাণু থাকে। ঐ রোগী ঘরের মেজে বা মাটিতে থুথু ফেলিলে, উহা শীঘ্রই শুকাইয়া, ধূলিকণার সহিত মিশ্রিত হয়। ঐ ধূলিকণা বায়ুতে প্রবেশ করে, এবং মানুষ শ্বাসের সহিত উক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া ক্ষয় রোগের জীবাণু টানিয়া লয়। সবল ও স্বাস্থ্যবান না হইলে ঐ জীবাণুর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া, শীঘ্রই ক্ষয়রোগ উৎপন্ন করে। উপরি উক্ত দৃষ্টান্ত দুইটীর দ্বারা, রোগ জীবাণু কোথা হইতে আইসে, এবং কিরূপে বিস্তৃত হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

এতদ্ব্যতীত কতিপয় ব্যাধির বীজ ইতর প্রাণী দ্বারাও মানবদেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে। এইরূপে আমরা কুকুর হইতে জলাতঙ্ক, ইঁদুর হইতে প্লেগ, শূকর হইতে ট্রিকাইনা ক্রিমি, এবং গরু হইতে ক্ষয় রোগের বীজ দেহে গ্রহণ করি। কোন কোন চর্ম্মরোগ যেমন দাদ, কখন কখন কুকুর ও বিড়াল হইতে আসিয়া থাকে।

কিরূপে রোগ জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে ?

মুখবিবর, নাসিকা, এবং চর্ম্মের কোন ক্ষত স্থান, এই তিনটী শরীরে রোগ জীবাণু প্রবেশ করিবার দ্বার। রোগোৎপাদক জীবাণু আমাদের খাদ্য

ও পানীয়ের সহিত মুখবিবরের মধ্য দিয়া শরীরে প্রবেশ করে। অপরিষ্কৃত হস্তে আহার করিলে, মুখের মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিলে, মুখে টাকা পয়সা রাখিলে, এইরূপে বহুপ্রকারে রোগ জীবাণু মুখ দিয়া প্রবেশ করিতে পারে। শ্বাস গ্রহণের সময় ধূলি মিশ্রিত বায়ু, নাসিকার মধ্য দিয়া দেহে প্রবেশ করে, এবং উক্ত বায়ু রোগ জীবাণু পরিপূর্ণ।

অচ্ছিন্ন চর্ম্ম শরীরের আবরণী, উহার মধ্য দিয়া কখনও রোগ জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না; কিন্তু চর্ম্মের কোন অংশ ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া গেলে, যেরূপে ছাতের ফাটাল দিয়া, গৃহ মধ্যে বৃষ্টির জল প্রবেশ করে, ঠিক সেইরূপে রোগ জীবাণুও ছিন্ন অংশের মধ্য দিয়া দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। কেহ যদি সহসা ছুরি দ্বারা গায়ের চামড়া কাটিয়া ফেলেন, অথবা আঁচড়াইয়া যায়, অথবা উহার মধ্যে কোন সূচ বা কাঠের টুক্‌রা বিদ্ধ হয়, তবে চর্ম্মে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ফাঁক হইয়া থাকে, ছুরি বা কাঠের টুক্‌রায় সর্ব্বদাই যে রোগ জীবাণু থাকে, উহারা তখনই চর্ম্মের নীচে চলিয়া যায়, তথায় বাড়িতে থাকে, এবং অল্পকাল মধ্যে ক্ষতস্থান ফুলিয়া উঠে, ও লাল হয়, এবং দুই এক দিনের মধ্যে উক্ত ক্ষত স্থানে পূঁজ হয়। চর্ম্মের ক্ষতস্থানে জীবাণু প্রবেশ করিবার ফলেই, এইরূপ হইয়া থাকে।

রোগ জীবাণু চর্ম্মের মধ্য দিয়া আর এক উপায়ে শরীরে প্রবেশ করে, মশা, মাছি, উকুণ, ছারপোকা, এঁটুলি প্রভৃতি কীটের দংশন দ্বারা। এই সকল কীট দংশন করিবার সময় দেহ হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ রক্ত টানিয়া লয়। ম্যালেরিয়া বা টাইফাস্ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দংশন করিয়া রক্তের সহিত ম্যালেরিয়া ও টাইফাস্ বীজ গ্রহণ করে। পরে উহারা কোন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন্ করিলে তাহার শরীরে উক্ত রোগের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইরূপে কতিপয় সাংঘাতিক ব্যাধি সংক্রমিত হইয়া থাকে।

কিরূপে রোগ জীবাণুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা সম্ভব

রোগ জীবাণু কোথা হইতে আইসে, কিরূপ অবস্থায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং কিরূপে শরীরে প্রবেশ করে, এই সমুদয় বিষয় বিবৃত করা হইয়াছে; আমরা এক্ষণে কিরূপে উহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা যায়, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

রোগোৎপাদক প্রায় সকল জীবাণুই রুগ্ন লোকদিগের মধ্য হইতে আইসে। এই নিমিত্ত রুগ্ন দেহ ছাড়িয়া আসা মাত্র জীবাণুগুলি ধ্বংস করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন্। এইরূপ করিলে রোগ জীবাণু, অন্য লোকের ব্যবহৃত খাদ্য, পানীয়

ও বাসনাদিতে বিস্তৃত হইতে পারে না। কলেরা, টাইফয়েড্, প্লেগ, ডিফ্থিরিয়া প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে, পৃথক ঘরে রাখা উচিত। ঐ সমুদয় রোগের কোন পৃথক হাঁসপাতাল থাকিলে, রোগীকে সেই স্থানে স্থানান্তরিত করা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। কিন্তু রোগী যেখানেই থাকুক না কেন, তাহার পৃথক কক্ষে থাকা উচিত এবং রোগীর শুশ্রূষাকারী ব্যতীত অপর কাহারও সেই কক্ষে প্রবেশ করা উচিত নহে। রোগীর ব্যবহার্য্য থালা বাসন রোগীর কক্ষে রাখিবেন, এবং প্রতিবার ব্যবহারের পর ফুটন্ত জলে ধৌত করিবেন। শুশ্রূষাকারী পুনঃ পুনঃ হস্ত ধৌত করিবেন, এবং কখনও রোগীর কক্ষে বসিয়া কোন খাদ্য গ্রহণ করিবেন না (মল ও থুথু সম্বন্ধে ৪৭শ অধ্যায় দেখুন)।

রোগজীবাণুর আক্রমণ হইতে শরীর রক্ষা করিতে হইলে, অপরিষ্কৃত খাদ্য গ্রহণ একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। কাঁচা শাকসব্জি রীতিমত ভাবে ফুটন্ত জলে না ধুইয়া, ভোজন করা উচিত নহে, কারণ উহা অপরিষ্কৃত ভূমিতে জন্মে। নদী, পুকুর, ও অধিকাংশ কূপের জল রোগ জীবাণু দ্বারা দূষিত, তাই জল ফুটাইয়া না লইয়া পান করা উচিত নহে। নিজ হাতে ফল গাছ হইতে পাড়েন নাই, সে ফল কখন ফুটন্ত জলে না ধুইয়া ও পরে খোসা না ছাড়াইয়া খাইবেন না।

শরীরের চামড়া যাহাতে কোনরূপে আহত বা ছিন্ন না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। ঐরূপ হইলে আহত স্থানে তৎক্ষণাৎ কিছু টিংচার আইওডিন্ প্রয়োগ করিবেন। যাহাতে ছারপোকা, উকুণ প্রভৃতি না হয়, তজ্জন্য বিছানা ও কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখিবেন, ও মাঝে মাঝে ধৌত করিয়া দিবেন। মশা থাকিলে মশারী খাটাইয়া শুইতে হইবে।

সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিলেও অলক্ষিতে অনেক সময় দেহে রোগ জীবাণু প্রবেশ করিবেই। কিন্তু পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য বিধান, তিনি আমাদের দেহে এরূপ এক স্বাভাবিক শক্তি নিহিত করিয়াছেন যে, রোগ জীবাণু অতিরিক্ত বিষাক্ত ও সংখ্যায় অত্যধিক না হইলে, ঐ শক্তি দ্বারা আমরা উহা বিনষ্ট করিতে পারি। রোগ প্রতিরোধ ও বিষাক্ত জীবাণু নষ্ট করিবার এই শক্তি আমাদের শোণিতে বর্ত্তমান। যে ব্যক্তি সুখাদ্য ভোজন ও নির্ম্মল বায়ু সেবন করেন না, অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য যে সর্ব্বদা অবসাদগ্রস্ত, যে মদ্যপ বা ধূম্রপায়ী অথবা যে ব্যক্তি অতিশয় ইন্দ্রিয় পরায়ণ, সেই ব্যক্তির শোণিত ঐ শক্তি হারাইয়া ফেলে। এই জন্য রোগ জীবাণুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে আমাদের উত্তম খাদ্য ভোজন, নির্ম্মল বায়ুগ্রহণ, প্রতিরাত্রে সাত বা আট ঘণ্টা নিদ্রা, মদ্য ও তাম্রকূট সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ, এবং পবিত্র জীবন যাপন করা কর্ত্তব্য। এইরূপে আমাদের দেহ বলিষ্ঠ ও সতেজ হইবে এবং রক্ত রোগজীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিবে।

২২শ অধ্যায়

শতবর্ষজীবী হইবার উপায়

একজন প্রাচীন ঋষি বলিয়াছেন, "মানুষ মরে না, নিজেকে মারে।" অধিকাংশ স্থলেই এই বাক্যটী সত্য। সকলেরই কোন না কোন সময়ে মরিতে হইবে বটে, কিন্তু কম লোকেই স্বাভাবিক পরমায়ু লাভ করিতে পারে। মৃত ব্যক্তিদিগের পরমায়ু অনুসারে দেখা গিয়াছে যে, পাশ্চাত্য দেশে পরমায়ুর গড় ত্রিশ হইতে চল্লিশ এবং এশিয়া মহাদেশে পঁচিশ বৎসরের অধিক নহে। বহু বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, মানুষের স্বাভাবিক পরমায়ু প্রায় একশত বৎসর। অতএব দেখা যাইতেছে যে অধিকাংশ লোকেই স্বাভাবিক পরমায়ু কালের মাত্র এক তৃতীয়াংশ কালও বাঁচিতে পারেন না। এই জন্যই বলা হইয়াছে মানুষ মরে না, নিজেকে মারিয়া ফেলে। তাহা না হইলে শতবৎসর কিংবা উহার অধিককাল বাঁচিয়া থাকা মানুষের সম্ভব হইত।

প্রত্যেক সম্প্রদায়েই কেহ কেহ শতবৎসরেরও অধিককাল বাঁচিয়া ছিলেন। এইরূপ শতবর্ষজীবী ব্যক্তিগণের সকলেই জীবনের প্রারম্ভকাল হইতে স্বাস্থ্যের নিমিত্ত যত্নবান ছিলেন।

মানুষের জীবনকে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মিতব্যয়ী হইলে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা তুলিবার কোন প্রয়োজন হয় না, কিন্তু অমিতব্যয়ী হইলে কিছু কিছু করিয়া তুলিতে তুলিতে গচ্ছিত টাকা ফুরাইয়া যায় ও দরিদ্র হইতে হয়। এই প্রকারে আমাদের স্বাস্থ্যকেও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত মূলধনের ন্যায় মনে করা যাইতে পারে। উহা রক্ষা করিয়া চলিলে, উহা যে কেবল কমিবে না, তাহা নহে, ক্রমশঃই বাড়িতে থাকিবে। দেহের কোন অঙ্গের যত্ন লইতে অবহেলা করিলে, আজ একটু কাল একটু করিয়া স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে থাকে, এবং পরিণামে মানুষ একেবারে স্বাস্থ্যবিহীন হইয়া পড়ে। ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিই দরিদ্র হয়।

অধিকাংশ নরনারী যৌবনকালে বেশ স্বাস্থ্য সম্পন্ন থাকে। তখন স্বাস্থ্যের হানিকর কোন কু-অভ্যাস সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিলে, তাহাদের কেহ কেহ উপহাস করিয়া বলেন, আমি যুবক ও বলিষ্ঠ, উহাতে আমার অপকার হইবে না। বিশ্বের নিয়ন্তা পরমেশ্বর প্রবর্ত্তিত একটি বিধি দ্বারা সমুদয় নরনারীর কার্য্যাবলি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, "মনুষ্য যাহা কিছু বুনে, তাহাই কাটিবে।"

জেরো আগা—দি "মোস্লেম মেথুসালেহ,"

নিরামিষাশী—ইনি ১৫৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালেও শারীরিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন।

১৯৩০ সালে জেরো আগার বয়স যখন ১৫৬ বৎসর, তখন এই চিত্রটী তোলা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবনের সুদীর্ঘকাল নিরামিষ ভোজনে কাটাইয়াছেন। তিনি নেপোলিয়ানি—যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। এই প্রকার তুরস্কে দেড় শতাব্দীরও অধিক সময় জীবনব্যাপী নানা দুঃখ ও ক্লেশের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার পরেও তিনি যখন আমেরিকা পর্য্যটন করেন তখন লোকে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া অবাক হইয়াছিল, এবং পরে নিউইয়র্কে এক ভয়ানক আকস্মিক মটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও তিনি আরও কতিপয় বৎসর জীবিত ছিলেন। অতঃপর ১৯৩৪ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। (১৩১)

আমরা ১৪শ ও ১৭শ অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা ও অমিতাচার জনিত ব্যাধিসমূহ দ্বারা, পরমায়ু হ্রাস পায়। আফিং, তাম্রকূট, প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ব্যবহার দ্বারাও দেহে ভগ্ন স্বাস্থ্যের বীজ বপন করা, ও পরমায়ু হ্রাস করা হয়।

এই গ্রন্থের পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই যৌবনকাল অতিক্রম করিয়াছেন, এবং কেহ কেহ হয়ত কোন প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। স্বাভাবতঃই তাহাদের মনে এই প্রশ্ন জাগরূক হইতে পারে, "আমি এত বৎসর ধরিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে অবহেলা করিয়াছি, আমার কি দীর্ঘজীবন লাভ করিবার আশা আছে?" শরীরের কিরূপ হানি হইয়াছে তাহার উপর ইহা নির্ভর করে। কিন্তু এরূপ কেহ নাই, যিনি স্বাস্থ্যের হানিকর কু-অভ্যাসগুলি এই মুহূর্ত্তে পরিত্যাগ করিয়া, দীর্ঘজীবন লাভের উপায় সমূহ অবলম্বন করতঃ বহু পরিমাণে পরমায়ু বৃদ্ধি করিতে পারেন না। চল্লিশ বা তদধিক বৎসর বয়স্ক বহু রুগ্ন ব্যক্তি কু-অভ্যাস ত্যাগ করিয়া পচাত্তর বা আশি বৎসর বাঁচিয়াছেন, এরূপ উদাহরণ বিরল নহে।

মিতাচার ব্যতীত দীর্ঘায়ুলাভ অসম্ভব

মিতাচার দীর্ঘজীবন লাভের একটী প্রধান অঙ্গ। যে সকল নরনারী শত বৎসর জীবন ধারণ করিয়াছেন, তাহারা সর্ব্ব বিষয়ে মিতাচারী ছিলেন। ইন্দ্রিয় সংযম ও ক্ষুৎপিপাসা সম্বন্ধেও মিতাচার আবশ্যক। ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, প্রভৃতি দেহের উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, এবং পরমায়ু হ্রাস করিয়া দেয়। পরিতৃপ্ত মন, এবং সদ্‌বিষয় চিন্তারাশি পরমায়ু বাড়াইয়া তোলে। বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের নিদেশ মত যে ব্যক্তির চিন্তা ও কার্য্যরাশি নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই ব্যক্তির জীবন অনন্ত জীবনের সহিত যুক্ত। এইরূপে তিনি তাহার পরমায়ু বৃদ্ধি করিতে পারেন।

দীর্ঘজীবী ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ খুব সাদাসিধা আহার করেন। আমেরিকার একজন একশত বৎসরেরও অধিক বয়স্কা স্ত্রীলোককে, তাঁহার নিয়মিত খাদ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "রুটি ও আলু আমার খাদ্য।" সিরিয়া দেশে এক ব্যক্তি, একশত তের বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রধানতঃ রুটি ও ডুমুর জাতীয় ফল আহার করিতেন, এবং জল ও দুগ্ধ ব্যতীত অপর কোনও পানীয় পান করিতেন না।

কোন কোন লোক মনে করেন, বার্দ্ধক্যে প্রচুর পরিমাণ মদ্য, মাংস ও গরম মসলা দেওয়া খাদ্য ভোজন করা উচিত। ইহা অতি সাংঘাতিক ভ্রম,

দীর্ঘজীবন লাভের উপায়

[দীর্ঘজীবন ও স্বাস্থ্যলাভের নিমিত্ত আমেরিকার কতিপয় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিম্নলিখিত নিয়মগুলি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।]

১। আপনার গৃহে যেন বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হয়।

২। ঘরের বাহিরে কার্য্য ও বিশ্রাম করিতে চেষ্টা করিবেন।

৩। ঘরের বাহিরে শয়ন করিতে পারিলে ভাল হয়।

৪। গভীর নিশ্বাস লইবেন।

৫। অতিরিক্ত খাইবেন না।

৬। অধিক মাংস ও গরম মসলা দেওয়া খাদ্য খাইবেন না।*

৭। আস্তে আস্তে এবং ভালরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইবেন।

৮। প্রতিদিন কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবেন।

৯। সোজা হইয়া দাঁড়াইবেন, বসিবেন, ও চলিবেন।

১০। দাঁত, দাঁতের মাড়ী ও জিহ্বা সর্ব্বদা ব্রুসদ্বারা মাজিয়া পরিষ্কার রাখিবেন।

১১। কোন বিষাক্ত পদার্থ বা রোগ জীবাণু, শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবেন না।

১২। অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবেন না। ক্লান্ত হইলেই বিশ্রাম করিবেন। প্রয়োজন মত রাত্রিতে সাত হইতে নয় ঘণ্টা ঘুমাইবেন।

১৩। ক্রোধ ও উৎকণ্ঠা পোষণ করিবেন না—সর্ব্বদা শান্তভাব ধারণ করুন।

*যেহেতু এই বৈজ্ঞানিকেরা অধিক মাংস খাইতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মাংস একেবারে না খাওয়াই ভাল।

কারণ ঐ প্রকার খাদ্য কেবল যে পরিপাক যন্ত্রাদির অনিষ্ট করে তাহা নহে, দেহে প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত পদার্থও জমাইয়া তোলে, ঐ বিষে জীবন হ্রাস করিয়া দেয়।

খাদ্য ও ব্যায়াম

অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদিগের ভাত, অর্দ্ধ ডিম, দ্বিতীয় বার সেঁকা (Toast) পাউরুটী খাওয়া উচিত। দাঁত যদি সবল না থাকে তবে টোষ্টরুটী গরম জলে ভিজাইয়া নরম করিয়া লইবেন। মাংস একেবারে না খাওয়াই ভাল। প্রায়ই ফল খাওয়া উচিত; উপযুক্ত দামে পাকা ফল পাইলে ফল না রাঁধিয়াই খাওয়া যাইতে পারে; রান্না করা ফলও উত্তম খাদ্য। পিঠা বা অন্য কোন প্রকার মিষ্টান্ন খাওয়া উচিত নহে।

দীর্ঘায়ু হইতে হইলে প্রতিদিন ব্যায়াম করা প্রয়োজন। আমাদের দেহ একটী যন্ত্রের ন্যায়; কোনও যন্ত্র অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়া থাকিলে, উহাতে মরিচা ধরে। সকলেই জানেন মরিচা পড়া যন্ত্র সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। ব্যায়াম না করিলে শরীর আড়ষ্ট হইয়া থাকে, ব্যায়ামের অভাবে বৃদ্ধ লোকদিগের শরীর কখন কখন এরূপ আড়ষ্ট হইয়া যায় যে, অনেক সময়ে তাহারা পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারেন না। অনেক দীর্ঘায়ু সুবিখ্যাত ব্যক্তি সারা জীবন নিয়মিত ব্যায়াম করিতেন, এবং বৃদ্ধ হইবার পরেও তাঁহারা প্রতিদিন নির্ম্মল বায়ুতে ভ্রমণ করিতেন।

দেহের ন্যায় মনেরও ব্যায়াম হওয়া উচিত; বৃদ্ধগণ রীতিমত মানসিক ব্যায়াম করিলে, বার্দ্ধক্যে বালকের ন্যায় আচরণ করেন না। অর্থাৎ দুর্ব্বল ও অক্ষম হন না।

ঠাণ্ডা না লাগান

বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেরই যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে, তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। শীতকালে যুবকদিগের অপেক্ষা বৃদ্ধদিগের অধিক কাপড় চোপড় আবশ্যক, কারণ যুবকদিগের তুলনায় বৃদ্ধদিগের সহজে ঠাণ্ডা লাগে। বৃদ্ধ ব্যক্তি-গণের প্রত্যহ স্নান করা কর্ত্তব্য। স্নানের পর শুষ্ক তোয়ালে দ্বারা উত্তমরূপে গায়ের ত্বক মার্জ্জনা করিলে সহজে ঠাণ্ডা লাগিবে না।

২৩শ অধ্যায়

গর্ভাবস্থা ও প্রসবাবস্থা

মানবজাতির প্রথম উৎপত্তি সম্বন্ধীয় যত বিবরণ আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলের প্রথম গ্রন্থ "আদি পুস্তকে" বর্ণিত বিবরণই বিশ্বাসযোগ্য। উক্ত বিবরণ লিখিত হইয়াছে, "ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্ত্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।......... আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে [অর্থাৎ মনুষ্যকে] নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণ বায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল।"

উক্ত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদকে, পৃথিবীতে উহাদের বংশ রক্ষা করিতে, পুনরুৎপাদন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। মানুষ সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়াছেন, "তোমরা প্রজাবন্ত ও বহু বংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ........কর।" সৃষ্টিকর্ত্তা ইচ্ছা করিলে মাত্র একজন পুরুষ ও একজন নারী সৃষ্টি না করিয়া একেবারে সমস্ত জগতপূর্ণ নরনারী সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি যেন মানুষের সহিত এই সৃষ্টি কার্য্যের ব্যাপারটা ইচ্ছা করিয়াই ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছেন। অতএব নরনারীগণের প্রজনন ক্রিয়াকে তাহাদের কাম লালসা পরিতৃপ্তির উপায় স্বরূপ মনে না করিয়া, উহাকে ঐশ্বরিক একটী পবিত্র বিধান মনে করা উচিত।

গর্ভ সঞ্চার

১৪শ অধ্যায়ে আমরা বিবাহিত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সংযমের আবশ্যকতা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। স্বামী স্ত্রীর যৌন সম্বন্ধ স্বাভাবিক ও ন্যায় সঙ্গত সত্য, কিন্তু জ্ঞান ও বিধি দ্বারা সংযত হইলেই উহাকে স্বাভাবিক ও ন্যায় সঙ্গত বলা যাইতে পারে। কাম লালসা সংযত করিবার প্রয়োজনীয়তা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সহিত তুলনা করিলে, সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উভয়ই আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, এবং উহাদিগকে পরিমিত ভাবে পরিতৃপ্ত রাখাই আমাদের কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রত্যেকেই জানেন যে পান ভোজনের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া

ঔদরিক ও সুরামত্ত হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। এইরূপে মানুষ ইচ্ছা করিলেই কাম লালসা তৃপ্ত করিতে পারে বলিয়া, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরায়ণ হওয়া কখনও যুক্তি সঙ্গত নহে।

ঘন ঘন গর্ভ সঞ্চার হইলে, সাধারণতঃই সন্তানগণ বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারে না। ইহাতে মাতার স্বাস্থ্যও একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই কারণেও স্ত্রী-সঙ্গমে মিতাচারী হওয়া উচিত। এইক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে বিবাহিত নরনারী কি করিলে ইন্দ্রিয় সেবায় মিতাচারী হইবে। ইহার একটী স্বাভাবিক পন্থা রহিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের মাসিক রজোস্রাব হইয়া থাকে, তখন পরিমিত রজোডিম্ব গর্ভাশয়ে চালিত হয়; এই প্রকারে প্রকৃতি গর্ভ ধারণের জন্য তাহা-দিগকে প্রস্তুত করে। দেখা গিয়াছে যে মাসিক রজোস্রাবের পূর্ব্বে, এক সপ্তাহ কাল মধ্যে, এবং উহা বন্ধ হইবার পর দশ দিবসের মধ্যে স্ত্রী-সঙ্গম করিলে, গর্ভসঞ্চারের যত অধিক সম্ভাবনা, অপর কোন সময়ে সেইরূপ নহে। অতএব উক্ত সময় বাদ দিলে, নিয়মিত রজোস্রাবের মধ্যে এক সপ্তাহ কাল থাকিয়া যায়, এবং এই সময়ে স্ত্রী-সঙ্গমে গর্ভসঞ্চারের আশঙ্কা খুব কম। সন্তান প্রসবের পরে কিছুকাল ইন্দ্রিয় সেবা এইরূপে পরিমিত করিয়া দিলে, পুনরায় গর্ভসঞ্চারের মধ্যে নবজাত শিশুর পুষ্টিসাধন সম্ভব হইতে পারে। যে কোন নরনারী ইচ্ছা করিলেই উক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন। এই স্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক; ইন্দ্রিয় সেবা অসম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিলে, অথবা গর্ভ নিরোধ করি-বার অপর কোন অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করিলে, কামেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধিত হয় না, এবং এরূপ এক বিতৃষ্ণার সঞ্চার হয়, যন্নিমিত্ত শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক বহু দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

গর্ভাশয়ে ভ্রূণের ক্রম বিকাশ

স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার হইবার পরই, সরিষা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র ডিম্বাণু (ইহার ব্যাস ১ ইঞ্চির ১২৫ ভাগের এক ভাগ), ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। কয়েক দিবসের মধ্যে উহা আকারে ও সাদৃশ্যে একটী তুঁত ফলের মত হয়; এবং চারি সপ্তাহের মধ্যে একটী কপোতের ডিম্বের মত দেখা যায়। দ্বিতীয় মাসের শেষে ইহার আকার একটী মুরগীর ডিমের মত হয় এবং মানব দেহের লক্ষণ প্রকাশ পায়। গর্ভাশয়ের অভ্যন্তর ভাগে ভ্রূণ রক্ত বহা নাড়ীর সহিত সংযুক্ত থাকে, এবং মাতা যে খাদ্য ভোজন করেন, তাহাই উক্ত নাড়ীর সাহায্যে ভ্রূণে পৌঁছাইয়া ভ্রূণের বৃদ্ধি সাধন করে। [গর্ভাশয়ে ভ্রূণের অবস্থান চিত্রে দ্রষ্টব্য।]

ক্ষুদ্র মাংস পিণ্ডটুকু, ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যে শেষে কিরূপে ২০৬ খানি হাড়, ৫০০, শতাধিক পেশী, চক্ষু, কর্ণ, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক প্রভৃতি অঙ্গ বিশিষ্ট পূর্ণ

মানবদেহে পরিণত হয়, তাহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। অসীম শক্তি সম্পন্ন পরমেশ্বর যে মানুষ সৃষ্টি করেন, এবং ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ডকে পূর্ণাবয়ব মানবদেহে পরিণত করেন, ইহা তাহার আর একটী প্রমাণ। দায়ূদ নামে এক জ্ঞানী রাজা ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, "আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়াবহরূপে নির্ম্মিত,…………আমার দেহ তোমা হইতে লুক্কায়িত ছিল না, যখন আমি গোপনে নির্ম্মিত হইতেছিলাম,………তুমিই আমার মর্ম্ম রচনা করিয়াছ; তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে বুনিয়াছিলে।"

চতুর্থ মাসের শেষে শিশু পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হয়। ষষ্ঠ মাসের শেষে উহার ওজন প্রায় সোয়া সের হয়। ছয় মাসে জন্মিলে শিশু দুই চারিদিনের অধিক বাঁচিতে পারে না। নবম মাসের শেষে শিশু দুই তিন সের ভারী হয়, এবং উহা দৈর্ঘ্যে আঠার ইঞ্চি লম্বা হয়। শিশু এই সময়ে জন্মিলে যদি ভালরূপ যত্ন পায় তবে বাঁচিতে পারে। দশম মাসের (২৮০ দিনের) শেষে শিশুর পূর্ণ বিকাশ সাধন হয়। তখন উহার ওজন ৩ হইতে ৫ সের এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় বিশ ইঞ্চি হয়।
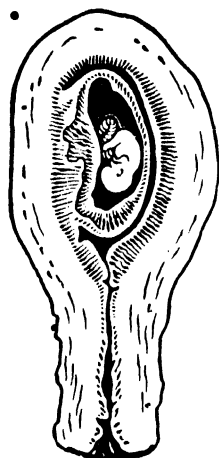
গর্ভাবস্থার কাল

গর্ভাবস্থার কাল প্রায় ২৮০ দিন। শিশুর জন্মকাল নির্দ্ধারণের নিমিত্ত এইরূপ পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। শেষ রজোস্রাব যে দিন আরম্ভ হয়, সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া নয় মাস গণনা করুন, এবং উহার সহিত সাত দিন যোগ করুন; যেমন ১লা বৈশাখ শেষ ঋতু আরম্ভ হইলে ৮ই মাঘ তারিখে সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা।

নয় মাস গণনা না করিয়া শেষ রজোস্রাব যে দিন আরম্ভ হয়, সেই দিন হইতে বরাবর ২৮০ দিন একে একে গণনা করা যাইতে পারে। তবে কোনরূপেই সঠিক দিন ধার্য্য করা সম্ভব নহে। শিশু হয়ত নির্দ্দিষ্ট দিনের দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে বা পরে জন্মিতে পারে।

গর্ভ সঞ্চারের লক্ষণ

কিরূপ লক্ষণ দ্বারা গর্ভসঞ্চার হইয়াছে বুঝিতে পারা যাইবে? বিবাহিতা কোন স্ত্রীলোকের নিয়মিত ঋতু হইতে হইতে সহসা ঋতু বন্ধ হইলে, খুব সম্ভব গর্ভসঞ্চার হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও হয়; একবার

January	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
OCTOBER	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	NOVEMBER
February	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
NOVEMBER	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5				DECEMBER
March	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
DECEMBER	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	JANUARY
April	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
JANUARY	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4		FEBRUARY
May	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
FEBRUARY	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	MARCH
June	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
MARCH	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6		APRIL
July	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
APRIL	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	MAY
August	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MAY	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	JUNE
September	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
JUNE	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7		JULY
October	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
JULY	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	AUGUST
November	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
AUGUST	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6		SEPTEMBER
December	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
SEPTEMBER	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	OCTOBER

গর্ভাবস্থার কাল নিরুপণ-প্রণালী

উপরের লাইনে রজোস্রাবের তারিখ লিখিত হইয়াছে; নীচের লাইনে যে তারিখে সন্তান হইবার সম্ভাবনা সেই তারিখ প্রদর্শিত হইয়াছে। মনে করুন, ১লা মার্চ্চ যদি শেষ রজোস্রাব হয়, তবে ৬ই ডিসেম্বর সন্তান হইবার সম্ভাবনা।

সন্তান জন্মিবার পরে পুনরায় ঋতুমতি না হইয়াও অথবা কোলের সন্তানকে স্তন দিতেছেন এরূপ সময়েও, মাতার হয়ত গর্ভসঞ্চার হইতে পারে।

গর্ভ হইবার কয়েক সপ্তাহ পরেই স্ত্রীলোকদিগের প্রাতঃকালে গা বমি বমি করিতে আরম্ভ করে। সকালে শয্যাত্যাগ করিবার পরে শরীর অসুস্থ বোধ করে, ক্রমাগত বমনোদ্বেগ হয়, এবং হিক্কা তুলিতে ও বমন করিতে থাকে। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া হয়তো প্রতিদিনই এইরূপ হইতে পারে। এই লক্ষণ দ্বারা অনেকাংশে গর্ভ হইয়াছে নির্ণয় করা যায়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে, স্তনযুগল ক্রমশঃ দৃঢ়তর ও বৃহৎ হইতে থাকে। স্তনের বোঁটা স্থূলতর হয়। তৃতীয় মাসের পর হইতে তলপেট ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে।

সাধারণতঃ গর্ভের সাড়ে চারি মাস পর হইতেই, মাতা গর্ভাশয় ভ্রূণের সঞ্চালন অনুভব করিতে পারেন।

গর্ভিণীর যত্ন

গর্ভাবতী নারীকে পুষ্টিকর খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া প্রয়োজন, কারণ তাহার নিজের এবং গর্ভস্থ সন্তানের—এই দুইটী প্রাণীর আহার যোগাইতে হইবে। গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। কোষ্ঠ-কাঠিন্য হইলে ২৯শ অধ্যায়ে বর্ণিত উপদেশ পালন করা কর্ত্তব্য।

যে কক্ষে নির্ম্মল বায়ু সঞ্চালিত হয়, গর্ভিণীর সেই কক্ষে শয়ন করা উচিত।

গর্ভিণী নারীর প্রতিদিন নিয়মিত অঙ্গ সঞ্চালন করা কর্ত্তব্য; নতুবা তাহার অঙ্গের পেশীগুলি দুর্ব্বল ও শিথিল হইয়া পড়িবে, ফলে গর্ভস্থ শিশু দুর্ব্বল হইয়া যাইবে, এবং শিশুর মাতাকে প্রসবের সময় বিস্তর ক্লেশ পাইতে হইবে।

গর্ভিণী প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণ নির্ম্মল জল পান করিবেন। পান, তামাক বা অপর কোন উগ্র পদার্থ গ্রহণ করিবেন না; প্রায় প্রতিদিনই নিয়মিত স্নান করিবেন। গর্ভাবস্থায় সহবাস করা একেবারে পরিত্যাজ্য।

প্রসবাবস্থার পূর্ব্বে কর্ত্তব্য

প্রসবের কাল সন্নিহিত হইতে থাকিলে, সূতিকাগৃহ পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে। গৃহের সমুদয় দেওয়ালগুলি পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া, চূণকাম করিয়া দিবেন। মেঝে ধুইয়া পরিষ্কার করিবেন; কাঁচা গৃহ হইলে উত্তমরূপে ঝাঁট দিবেন ও পরিষ্কার করিবেন। ঘরের চারি কোণে চৌকি প্রভৃতি আসবাবের নিম্নে চূণ ছড়াইয়া দিবেন। বিছানা ও একটী টেবিল ব্যতীত সূতিকা গৃহে

অপর কোন দ্রব্যাদি রাখিবেন না। বাড়াতে যদি কেবল একটী ঘর থাকে, তবে ঘরের এক পার্শ্বে পরিচ্ছন্ন মাদুর বা অন্য কিছু টাঙ্গাইয়া দিয়া, প্রসূতির জন্য একটী পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

প্রসবের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রস্তুত রাখিবেন ঃ—

১। আধ সের বা তার চেয়েও বেশী পরিমাণ পরিষ্কার (বোরিক কটনের মত) তুলা প্রসবের পরে রক্ত প্রভৃতি মুছিবার জন্য এবং যোনিরন্ধ্রের উপরিভাগে দিবার জন্য উহা ব্যবহৃত হইবে।

২। চারি ফিট দীর্ঘ এবং দশ ইঞ্চি প্রশস্ত, দুই বা তিন টুক্‌রা শক্ত বস্ত্রখণ্ড ফুটন্ত জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। উহা সন্তান জন্মিবার পরে মায়ের তলপেটে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে আবশ্যক হইবে।

৩। কাঁচা ও সিদ্ধ করা পুরাণ কয়েকখানা কাপড় : রক্ত বা অপর কোন স্রাব শোষণ করিতে প্রসূতি শরীরের নীচে উহা পাতিয়া দিতে হইবে।

৪। এক খণ্ড ফ্লানেল বা অপর কোন রকম নরম ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করা পরিষ্কার কাপড় : নবজাত শিশুকে জড়াইয়া রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইবে।

৫। দুই ফিট লম্বা সাড়ে চারি ইঞ্চি চওড়া ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করা দুই টুক্‌রা পরিষ্কার কাপড় : শিশুর তলপেটে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার জন্য আবশ্যক হইবে।

৬। একখানি সান্‌লাইট্ বা কার্ব্বলিক সাবান এবং ক্ষুদ্র একটী ব্রুস্ : ধাত্রীর হস্ত ধৌত করিবার জন্য প্রয়োজন হইবে।

৭। কয়েক আউন্স লাইসোল : প্রায় দেড় পোয়া জলের সহিত ছোট চামচের আধ চামচে লাইসোল মিশ্রিত করিয়া ধাত্রির হস্ত ধৌত করিতে হইবে।

৮। একটী পরিষ্কার পাত্রে দুই আউন্স বোরিক এ্যাসিড্ পাউডার : নাড়ী কাটিবার পরে নাভিমূলে ছড়াইয়া দিবার জন্য ব্যবহৃত হইবে।

৯। তিন ইঞ্চি লম্বা ও তিন ইঞ্চি চওড়া, নাভিমূল প্রবেশ করিতে পারে মধ্যস্থলে এরূপ একটী ছিদ্র বিশিষ্ট, কয়েক টুক্‌রা ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করা পরিষ্কার কাপড় প্রয়োজন।

১০। চারি বা ছয় আউন্স পরিমাণ এক বোতল বোরিক এ্যাসিড্ সলিউসন্ (৫০ অধ্যায়ে ১নং ব্যবস্থা পত্র দ্রষ্টব্য) : শিশুর চক্ষু এবং মাতার স্তনের বোঁটা ধৌত করিবার জন্য ইহা আবশ্যক।

১১। আধ আউন্স কি এক আউন্স পরিমাণ শতকরা দশ ভাগ আর্জিরল্ সলিউসন্ (৩নং ব্যবস্থা পত্র দ্রষ্টব্য) : শিশুর চক্ষু ধৌত করিতে উহা প্রয়োজন হইবে।

১২। কয়েক আউন্স পরিষ্কার ভ্যাসেলিন্ঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই উহার গাত্র মার্জ্জনার নিমিত্ত আবশ্যক।

১৩। কয়েকটী সেপ্টিপিন্ঃ মাতার ও শিশুর তলপেটে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে আবশ্যক।

১৪। কয়েক খণ্ড পরিষ্কার বস্ত্রঃ উহা দ্বারা শিশুকে এরূপ ভাবে জড়াইয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে শিশুর মলমূত্র ঐ বস্ত্রখণ্ডেই পড়ে।

১৫। সাত আট ইঞ্চি লম্বা দুইগাছি দড়ি বা ফিতাঃ দশ বার গাছ সূতা শক্ত করিয়া পাকাইয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হইবে, উহা ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করা দরকার, উহা দ্বারা শিশুর গর্ভ নাড়ী বন্ধন করিতে হইবে। গর্ভনাড়ী কাটিবার জন্য এক জোড়া ধারাল কাঁচি, ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

উপরিউক্ত জিনিষগুলি পূর্ব্ব হইতেই হাতের কাছে রাখিতে হইবে। যে সকল বস্ত্র ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে, উহা অপর একখানি পরিষ্কার ও সিদ্ধ করা বস্ত্রে জড়াইয়া রাখিতে হইবে। হস্ত ধৌত না করিয়া উপরিলিখিত কাপড়, কাঁচি প্রভৃতি কেহ যেন স্পর্শ না করেন।

মাতা ও শিশুর পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং বিছানার চাদর প্রভৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। পরিষ্কার করিবার পরে যেন ঐগুলি পুনরায় ধূলিমলিন হইতে না পারে।

সকল জিনিষই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। এক বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বে যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহাদের অধিকাংশই দুই সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেবল শিশুর জন্মকালে সর্ব্ববিষয়ে পরিচ্ছন্ন না থাকিবার ফলেই এইরূপ হইয়া থাকে। প্রসবের পরে অনেক প্রসূতি অসুস্থ হইয়া পড়েন, এবং বহুদিন ধরিয়া জ্বরে ভোগেন। সন্তান ভূমিষ্ট হইবার সময়ে সর্ব্ববিষয়ে পরিচ্ছন্ন না থাকাই এই সকল সূতিকা রোগের কারণ।

প্রসবকাল সন্নিকট জানিতে পারিলেই শয্যাদি প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। তোষকের উপরে একখানি অয়েল ক্লথ বা কয়েক খানা খবরের কাগজ পাতিয়া তাহার উপরে পরিষ্কার বিছানার চাদর পাতিবেন, নতুবা তোষক ভিজিয়া যাইবে। রক্তস্রাব ধরিবার নিমিত্ত কখনও নোংড়া বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করিবেন না।

একটী পরিষ্কার পাত্রে প্রায় আধ মণ জল সিদ্ধ করিবেন। উহার কিয়দংশ শীতল করিতে একটী পরিষ্কার কলসী বা অপর কোন পাত্রে ঢালিয়া পরিষ্কার নেকড়া দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবেন। কিয়দংশ গরম রাখিতে হইবে। ঘরের মধ্যে একটী ছোট টেবিল রাখিয়া, গরম জলদ্বারা উহার উপরিভাগ ধুইয়া

ফেলিবেন, এবং তদুপরি আবশ্যক জিনিষ পত্রাদি সজ্জিত রাখিবেন। এতদ্ব্যতীত দুইটী গামলা সাবান ও গরম জল দ্বারা ধুইয়া প্রস্তুত রাখিবেন।

প্রসবাবস্থা

দুইটী লক্ষণ দ্বারা প্রসব কাল ঠিক করা যায়। একটী যোনি দ্বার হইতে রক্তাভ স্রাব, অপরটী বেদনা। প্রকৃত প্রসব বেদনা প্রথমে ১৫ মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর হইতে আরম্ভ হয়, এবং প্রসবকাল যতই সন্নিকট হয়, উহা তত ঘন ঘন হইতে থাকে।

উপযুক্ত চিকিৎসক পাওয়া গেলে, প্রসবকালে তাহাকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসকের অভাবে একজন সুশিক্ষিতা ধাত্রী নিযুক্ত করা সম্ভব হইতে পারে। উপযুক্ত চিকিৎসক নিকটে থাকিলে কখন্ কি করিতে হইবে তিনি বুঝিবেন। যে সকল স্থানে উপযুক্ত চিকিৎসক তত্ত্বাবধান করিবেন না, তাহাদের নিমিত্ত নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদত্ত হইল।

সূতিকা গৃহে অন্য কোনও লোককে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। ধাত্রী ব্যতীত দুইজন লোকের বেশী সূতিকা গৃহে থাকা ভাল নহে।

প্রসূতির গরমজলে স্নান করা কর্ত্তব্য। সাবান ও উষ্ণ জল দ্বারা তাহার যোনি প্রদেশ উত্তমরূপে ধৌত করিতে হইবে। প্রসব বেদনা আরম্ভ হইবার পরে পুনঃ পুনঃ মূত্র ত্যাগ করা উচিত। গত সাত আট ঘণ্টার মধ্যে মলত্যাগ করিয়া না থাকিলে উষ্ণ জলে বস্তিক্রিয়া করান আবশ্যক (২০শ অধ্যায়ে বস্তিক্রিয়ার প্রণালী লিখিত হইয়াছে।

প্রসব বেদনার গর্ভাবস্থায় প্রসূতি ইচ্ছামত বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকিতে পারেন। বেদনা তীব্র হইলে প্রসূতি পদদ্বয় পেটের দিকে টানিয়া বিছানায় শুইবেন। এই সময়ে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিবার রীতি প্রসূতির পক্ষে বিষম অনিষ্টকর, এবং এরূপ রীতি অবলম্বন করিলে নবজাত শিশুকে পরিচ্ছন্ন রাখা অসম্ভব।

ধাত্রী বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহার হাত কনুই পর্য্যন্ত ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইবেন। কনুই পর্য্যন্ত তাঁহার হাত খোলা থাকিবে। হাতের নখগুলি ভালরূপে কাটিয়া লইয়া নখের ময়লা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবেন। সাবান এবং গরম জলে হাত ধুইলেই যথেষ্ট হয় না। হাত বেশ করিয়া মাজিবার জন্য একখানি ক্ষুদ্র ব্রুস্ ব্যবহার করা উচিত। ধাত্রী অবশ্যই পরিষ্কৃত বসন পরিধান করিবেন। ধাত্রীর একখণ্ড পরিষ্কৃত বস্ত্র সম্মুখভাগে জড়াইয়া লওয়া ভাল।

প্রসব বেদনা আরম্ভ হইবার পরে, প্রসবের সহায়তা করিবে, এইরূপ আশা করিয়া প্রসূতিকে কোন ঔষধ দেওয়া উচিত নহে। তাহার ঔষধের কোনই

আবশ্যকতা নাই, ঔষধ ব্যবহার না করাই অধিকতর মঙ্গল। প্রসূতির তলপেটে দড়ি বা বিছানার চাদর বাঁধিবেন না, ইহাতে সাহায্য করা দূরে থাকুক আরও বাধা জন্মায়। ধাত্রী কখনও যোনি মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিবেন না। এইরূপ করিলে প্রসূতির সূতিকা রোগ সংক্রমিত হইবে এবং পরিণামে জ্বর প্রকাশ পাইবে।

জল ভাঙ্গিবার পরে যোনির দ্বার হইতে শিশুর মস্তক বাহির হইতে দেখা যাইবে। শিশুর অবস্থান স্বাভাবিক হইলে, উহার মুখ নীচের দিকে অর্থাৎ মায়ের পশ্চাদ্দিকে থাকিবে, এবং প্রথমে উহার মস্তকের উপরিভাগ দৃষ্ট হইবে। মস্তক খুব তাড়াতাড়ি বাহির হইলে, প্রসূতির প্রসবদ্বার সাংঘাতিকরূপে ছিঁড়িয়া যাইবে। তাই মস্তক দেখা গেলেই উহার উপরে অঙ্গুলি স্থাপন করিবেন, এবং এক এক বার বেদনা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা নীচের দিকে সজোরে চাপিবেন। এইরূপে শিশুর মস্তক উহার বক্ষের দিকে নত হইবে এবং তাহা হইলে সহজে শিশুর দেহ যোনি পথে নির্গত হইতে পারিবে। উক্ত প্রকারে কয়েক মিনিটের জন্য মস্তক বাহির হইয়া আসিতে বাধা পাইবে। একবার বেদনা হইয়া পুনরায় উহা আসিবার মধ্যে যে অবকাশ থাকে, তন্মধ্যে প্রসূতির আভ্যন্তরীণ পেশীগুলি শিথিল হয়। এই প্রকার শিথিলতার অবকাশে মস্তক বাহির হইতে দিবেন। উক্ত পন্থা অবলম্বন করিলে প্রসবদ্বার ছিঁড়িয়া যাইবার কোন আশঙ্কা থাকে না।

শিশুর মস্তক বাহির হইবার কিছুকাল পরে, উহার সর্ব্বাঙ্গ বাহির হয়। মস্তক বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর কণ্ঠদেশের বরাবর অঙ্গুলি দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, নাভীনাড়ী গলার চারিদিকে জড়িত আছে কি না। নাভিনাড়ী গলার চারিদিকে জড়িত থাকিয়া যদি স্পন্দিত না হইতে থাকে, তবে শিশুকে তাড়াতাড়ি প্রসব করান উচিত। যদি উহা গলার চারিদিকে জড়িত না থাকে, তাহা হইলে ধাত্রী এক টুক্‌রা পরিষ্কার নেকড়া অথবা তুলার দ্বারা শিশুর চক্ষু এবং মুখের অভ্যন্তর ভাগ মুছিয়া দিবেন।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র একখানি ফ্লানেল বা পাতলা কাপড়ে উহাকে জড়াইয়া রাখিবেন।

শতকরা দশভাগ (১০%) আর্জ্জিরল এক এক ফোঁটা দুই চক্ষে দিয়া, ধাত্রী শিশুর চক্ষু দুইটী তাড়াতাড়ি ধুইয়া দিবেন। উক্ত ঔষধ দুর্ঘট হইলে, কয়েক ফোঁটা বোরাসিক এ্যাসিড্ সলিউসন্ দ্বারা শিশুর উভয় চক্ষু ধৌত করিবেন। জন্ম-কালে এইরূপে শিশুর চক্ষু ধৌত না করিবার জন্য সহস্র সহস্র শিশু অন্ধ হইয়া যায়।

সন্তান প্রসব হইবামাত্র ধাত্রীর সহকার্য্যকারিণী প্রসূতির তলপেটে হাত রাখিয়া, তাহার গর্ভাশয় চাপিয়া ধরিবেন। তলপেটের উপরে হাত দিলে গর্ভাশয় শক্ত মাংস পিণ্ডের মত বোধ হইবে। উহা ধীরে ধীরে চাপিতে হইবে। এক মিনিটের জন্যও থামিবেন না, কারণ এইরূপে চাপিলে শূন্য গর্ভাশয় সঙ্কুচিত হয় এবং রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

নাভিনাড়ীর স্পন্দন থামিয়া গেলেই উহা বাঁধিতে ও কাটিতে হইবে। পূর্ব্বে এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত সূতা দুইগাছ এক্ষণে ব্যবহৃত হইবে। উক্ত সূতা দুইগাছি এবং নাড়ী কাটিবার জন্য কাঁচি, কয়েক মিনিট ধরিয়া গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লউন। উহাদের ব্যবহার করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যেন উহারা গরম জলেই ভিজান থাকে। নাড়ীটিকে বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিতে হইবে। ব্যবহারের
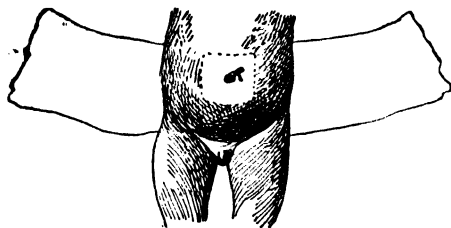
এইরূপে নাভিরজ্জু বাঁধিতে হইবে

পূর্ব্বে গরম জলে ফুটান হয় নাই, এইরূপ কোন সূতা দ্বারা নাড়ীটিকে বাঁধিবেন না, বা এরূপ কোন কাঁচি দ্বারা উহা কাটিবেন না। নাড়ী কাটিবার ও বাঁধিবার জিনিষপত্র সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার না করিবার ফলে, অনেক সময়ে শিশুদিগের দেহ বিষাক্ত জীবাণু প্রবেশ করে ও তাহাদিগের ধনুষ্টংকার হইয়া থাকে।

নাড়ী কাটা হইবার পরেই ছিন্নাবশিষ্ট অংশে কিছু বোরাসিক্ এ্যাসিডের গুড়া ছিটাইয়া দিবেন, এবং পূর্ব্ব হইতেই ফুটন্ত জলে উত্তমরূপে ধৌত ও পরে শুষ্ক করা একখণ্ড বস্ত্রের মধ্যভাগ ছিদ্র করিয়া নাভিমূল তন্মধ্যে রাখিবেন (৫০শ অধ্যায়ে ৪নং ব্যবস্থা পত্র দেখুন)। পরে উক্ত বস্ত্রখণ্ড যথাস্থানে রাখিবার জন্য একটী ব্যাণ্ডেজ দ্বারা শিশুর সম্পূর্ণ দেহ বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া দিবেন। পরে প্রসূতির জন্য যাহা করিবার সেই সকল যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ শিশুকে বেশ উষ্ণস্থানে ডান কাতে শোয়াইয়া রাখিবেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার কিছু-কাল পরেই গর্ভের ফুল বাহির হইয়া আসিবে। নাভিনাড়ীর প্রান্ত ধরিয়া টানাটানি করিবেন না, বা নাড়ীর সহিত কিছু বাঁধিয়া রাখিবেন না। অনেকের এইরূপ ভুল ধারণা আছে যে, গর্ভের ফুল প্রসূতির দেহাভ্যন্তরে

পুনরায় প্রবিষ্ট হইলে, তাহার অনিষ্ট হয়। যিনি গর্ভাশয় চাপিয়া ধরিয়াছেন তিনি উহা বেশ জোরে চাপিতে থাকিবেন, জোরের মাত্রা যেন আবার অতিরিক্ত না হইয়া পড়ে। এইরূপ করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হইবে এবং গর্ভের ফুল নির্গত হওয়া সহজ হইবে।

ফুল বাহির হইবার পরক্ষণেই পনের ইঞ্চি চওড়া একখানা পুরু কাপড় লইয়া, তলপেটের চারিদিকে, আরাম বোধ হয় এরূপভাবে, বাঁধিয়া দিবেন, এবং উহার দুই প্রান্ত সেফ্‌টিপিন্ দ্বারা আট্‌কাইয়া অথবা সূতা দ্বারা সেলাই করিয়া দিবেন। উক্ত বন্ধনী দ্বারা তলপেটে আপনা হইতেই চাপ পড়িবে।

শিশুকে উপযুক্ত মত ধৌত ও বস্ত্র পরিহিত করিয়া, মাতৃস্তনে তাহার মুখ লাগাইয়া দিবেন। কারণ শিশু স্তন্য চুষিবার সঙ্গে সঙ্গে মাতার গর্ভাশয় সঙ্কুচিত এবং ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর ও কঠিনতর হইতে থাকিবে। ইহা দ্বারা গর্ভাশয় হইতে রক্তস্রাবও বন্ধ হইয়া যাইবে। তলপেটে বন্ধনী দিবার পূর্ব্বে, সমুদয় নোংরা কাপড় চোপড় ও বিছানা পত্র গৃহ হইতে সরাইয়া ফেলিবেন। এবং প্রসূতির রক্তলিপ্ত অঙ্গসমূহ ফুটান জল দ্বারা ধৌত করিবেন ও ভালরূপে মুছিয়া শুষ্ক করিয়া ফেলিবেন। ইহার পরে শোষক তুলা অথবা কয়েক ভাঁজ পুরু কাপড় দ্বারা (যাহা পূর্ব্বে ফুটন্ত জলে ধৌত করা হইয়াছে) একটী কোমল গদি বা পটি প্রস্তুত করিয়া প্রসূতির জননেন্দ্রিয়ের উপরে স্থাপন করিবেন। উক্ত পটির চারি কোণ এক একটী ফিতার সাহায্যে, তলপেটের বন্ধনার সহিত পিছনে ও সম্মুখে সেফ্‌টিপিন্ দ্বারা বাঁধিয়া দিবেন।

প্রসূতি কয়েক দিন ধরিয়া শান্ত ভাবে বিছানায় শুইয়া থাকিবেন। প্রসব-দ্বারের উপরে স্থাপিত পটি বারংবার পরিবর্ত্তন করিতে এবং উক্ত অঙ্গ পুনঃ পুনঃ ধুইয়া ফেলিতে হইবে।

সন্তান প্রসবের ছয় কি সাত ঘণ্টা পরে, প্রসূতির প্রস্রাব করা কর্ত্তব্য, এই সময় পরেও যদি তিনি মূত্র ত্যাগ করিতে অসমর্থ হন, তবে কয়েক ভাঁজ পুরু কাপড় উষ্ণজলে ডুবাইয়া নিংড়াইয়া লইয়া প্রসূতির বস্তি প্রদেশে এবং প্রসব-দ্বারে সেক দিতে থাকিবেন। এইরূপে মূত্র ত্যাগ করান সহজ হইবে।

সন্তান প্রসবের পরে ঐ দিনই একবার মলত্যাগ করা আবশ্যক। যদি মলত্যাগ না হয় তবে কোষ্ঠ পরিষ্কারক কোন ঔষধ প্রদান করিতে হইবে।

সন্তান জন্মিবার পরে মাতা সাধারণ খাদ্য ভক্ষণ করিতে পারেন। দুই এক দিন শীতল জল পান বা ঠাণ্ডা খাদ্য ভোজন না করাই উচিত। প্রসূতিকে সুপক্ব ও পুষ্টিকর খাদ্য, যথা—ভাতের মণ্ড, ডিম, দুধ, রুটি, আলু, মাছ ও পাকা ফল প্রভৃতি খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

২৪শ অধ্যায়

প্রসবকালীন দুর্ঘটনা ঃ সূতিকা জ্বর

শিশু শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ না করিলে কি করিতে হইবে

স্বভাবতঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই কাঁদিয়া উঠে, এবং শ্বাস গ্রহণ করিতে থাকে। শিশু যদি কাঁদিয়া না উঠে এবং শ্বাস গ্রহণ না করিয়া মৃত প্রায় পড়িয়া থাকে, অথবা অতি ক্ষীণ ভাবে শ্বাস টানে, তবে তাহার নিশ্বাস সঞ্চারণের জন্য যাহা করা প্রয়োজন তাহা সত্বরই করিতে হইবে। প্রথমে, একখণ্ড পরিষ্কার কাপড় দ্বারা একটী অঙ্গুলি আবৃত্ত করিয়া শিশুর মুখ ও গলার মধ্যে পরিষ্কার করিয়া দিবেন। তারপর এক টুক্‌রা পাতলা কাপড় দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী মুড়িয়া লইয়া শিশুর জিহ্বাটী ধরিবেন এবং মিনিটে দশবার করিয়া ধীরে ধীরে উহা টানিতে থাকিবেন। এইরূপ করিবার সময় অপর একজন একখানি কাপড় দ্বারা শিশুর পাছার উপরে চাপড় দিতে থাকিবেন, অথবা ঠাণ্ডা জলে কাপড় ভিজাইয়া উহা দ্বারা শিশুর বক্ষের উপরে ধীরে ধীরে আঘাত করিতে থাকিবেন। এই ভাবে প্রায়ই নিশ্বাস প্রশ্বাস চলাচল করান যায়। একখানি কাপড় পূর্ব্বেই আগুনে গরম করিয়া রাখিতে হইবে; শিশু শ্বাস গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেই, উহা দ্বারা তাহাকে জড়াইয়া দিবেন।

উপরি উক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে দুই মিনিট চেষ্টা করিয়াও ফল না পাইলে, সত্বর শিশুর নাড়ী কাটিয়া উহা বাঁধিয়া কৃত্রিম উপায়ে নিশ্বাস সঞ্চার করিতে হইবে। কৃত্রিম উপায় কিরূপে নিশ্বাস সঞ্চার করিতে হয়, তাহা পরবর্ত্তী পৃষ্ঠার চিত্রগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। প্রক্রিয়াগুলি যেন অতি দ্রুত সম্পাদিত না হয়, প্রতি মিনিটে দশ কি বার বারের অধিক নহে। শিশু শয়ন করিতে পারে এরূপ একটী পাত্র অন্যূন ১০৫° ডিগ্রি ফারেন্‌হাইট্ পরিমাণ উষ্ণ-জল পূর্ণ করিয়া নিকটে রাখিয়া দিবেন। কৃত্রিম উপায়ে নিশ্বাস সঞ্চার করিবার সময় শিশুর যতটা অঙ্গ জলে নিমজ্জিত রাখা যাইতে পারে তাহা রাখিবেন। সহজে আশা ছাড়িবেন না। শিশুর জীবনের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইলে, আধ ঘণ্টা বা তদধিক কাল উক্ত প্রক্রিয়া চালাইতে থাকিবেন।

প্রসবকালীন রক্তস্রাব

সন্তান প্রসবকালে, এবং প্রসবান্তে ও গর্ভের ফুল বাহির হইবার সময়ে রক্তস্রাব হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু অস্বাভাবিক না হইলে উহা কেবল অল্পকাল স্থায়ী

হয়। অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে, প্রসূতি শীত শীত বোধ করিতে থাকেন এবং ক্রমশঃ বিবর্ণ হইয়া তাঁহার মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হয়।
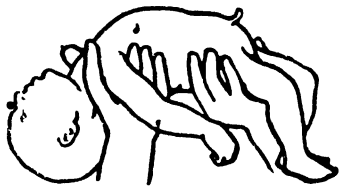
প্রতীকার

প্রসূতির কটীদেশ উচু করিবার জন্য কিছু বিছানা পত্র গোল করিয়া গুটাইয়া, তাঁহার কটির নিম্নে দিবেন। তলপেটের উপরে হাত দিয়া গর্ভাশয়টী ধরিয়া উহা হাতের মধ্যে জোরে চাপিয়া সঙ্কুচিত করিবেন। রক্তস্রাব বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত, হস্ত মুষ্টি শিথিল করিবেন না। খুব শীতল জলে একখণ্ড কাপড় ভিজাইয়া বস্তি প্রদেশে ও জননেন্দ্রিয়ের বহির্ভাগে প্রয়োগ করিতে থাকিবেন। উহা পুন পুন ভিজাইয়া লইয়া ঐ স্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে। ঠাণ্ডায় রক্ত কোষগুলি সঙ্কুচিত হওয়ায়, ইহা রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার অনুকূল হইবে। দুই কি তিন ফিট উচ্চ হইতে তল-পেটের উপরে, কিছু ঠাণ্ডা জল ধারাণী করা যাইতে পারে। মাতার স্তনবৃন্তে

শিশুর মুখ লাগাইয়া দিবেন, কারণ শিশু স্তন্য পান করিতে আরম্ভ করিলেই গর্ভাশয় সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। যদি আর্গটের তরল নির্য্যাস (Fluid extract of Ergot) সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, তবে প্রসূতিকে ছোট চামচের এক চামচে সেবন করিতে দিয়া তিন ঘণ্টা পরে আবার এক চামচে দিবেন। এইরূপ রক্তস্রাবের পরে প্রসূতি অন্ততঃ দুই দিন শান্তভাবে বিছানায় শুইয়া থাকিবেন। কোন কারণেই যেন তাঁহাকে উঠিয়া বসিতে বা শয্যাত্যাগ করিতে দেওয়া না হয়।
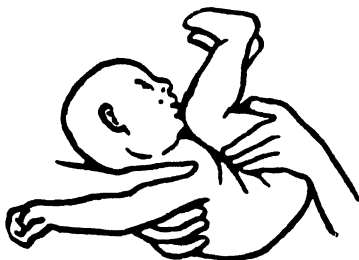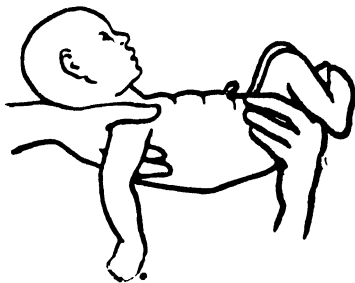
সূতিকা জ্বর

সন্তান প্রসবের পরেই সাধারণতঃ প্রসূতির কয়েক দিন ধরিয়া একটু একটু জ্বর হইয়া থাকে। এই প্রকার জ্বর আশঙ্কাজনক নহে, এবং উহা তিন

চারি দিবসের অধিক স্থায়ী হয় না। কিন্তু তিন চারি দিন পরে যদি জ্বর আরম্ভ হয়, তবে তাহা বড়ই সাংঘাতিক হইতে পারে। উক্ত জ্বরের সময়ে নাড়ীর গতি বা স্পন্দন বিশেষভাবে বাড়িয়া যায় (নাড়ীর স্বাভাবিক গতি মিনিটে ৭২ বার)। জ্বরের প্রারম্ভে হয়ত শীত ও কম্প হইতে পারে। তল-পেটের নিম্নভাগে তখন বেদনা অনুভূত হয়, এবং পেটে কোন প্রকার চাপ লাগিলে, তীব্র বেদনা বোধ হইয়া থাকে। মাথা কামড়াইতে থাকে। জ্বর আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দুই এক দিন গর্ভাশয় হইতে নিঃসৃত স্রাবের মাত্রা কমিতে আরম্ভ করে। এইরূপ জ্বরকে সাধারণতঃ সূতিকা জ্বর বলে।

প্রসবকালে সকল বিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে, সূতিকা জ্বর হইতে পারে না। কারণ, ধাত্রীর হাত অথবা প্রসূতির ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি ময়লা থাকিলে উহা হইতে গর্ভাশয়ে রোগজীবাণু প্রবেশ করে ও তাহাতে সূতিকা জ্বরের সৃষ্টি হয়। অনেক সময়ে প্রসূতির যোনি গহ্বরে ধাত্রী হস্ত বা অপর কোন যন্ত্র প্রবেশ করাইয়া দিয়া গর্ভাশয় রোগ দুষ্ট করিয়া ফেলে, এবং সেই নিমিত্ত সূতিকা জ্বর হইয়া থাকে।

এইরূপ অবস্থায় সর্ব্বপ্রথমে ম্যাগ্‌নেসিয়াম্ সাল্‌ফেট্ (Epsom salts) বা ঐরূপ কোন ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা উচিত। তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর তলপেটে সেঁক দিবেন (২০শ অধ্যায়ে সেঁক দিবার প্রণালী দ্রষ্টব্য)। প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর অন্তর উষ্ণ জল দ্বারা যোনি মধ্যে ডুস্ প্রয়োগ করিবেন। ১১০° ফারেন্‌হাইট্ উষ্ণ, প্রায় তিন সের জলে চায়ের চামচের পাচ চাম্‌চে লাইসল্ (Lysol) মিশ্রিত করিয়া ডুস্ প্রস্তুত করিতে হইবে (আভ্যন্তরীণ ডুস্ দিবার প্রণালী ২০ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

উপযুক্ত চিকিৎসক পাওয়া সম্ভব হইলে, যে কোন উপায়ে তাঁহার হস্তে এইরূপ রোগিণীর ভার অর্পণ করা অতিশয় কর্ত্তব্য; নতুবা ভাল হাঁসপাতালে রোগিণীকে প্রেরণ করা উচিত।

২৫শ অধ্যায়

শিশুগণের লালন পালন

কোন এক সমাজে যত শিশু জন্মায় তন্মধ্যে শতকরা একাত্তরটী শিশু এক বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু তৎসন্নিহিত অপর এক সমাজে ঐ বয়সের মধ্যে শতকরা মাত্র পাঁচটী শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে। উক্ত দুই সমাজের শিশু-মৃত্যুর হারের এইরূপ বিষম পার্থক্যের কারণ এই যে, এক সম্প্রদায় শিশুদিগকে উপযুক্ত মত লালন পালন করে না, ও অপর সম্প্রদায় উপযুক্তরূপে লালন পালন করে। আমাদের এই ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক শিশু জন্মিবার পরে বৎসর কাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ভয়াবহ জীবনহানি প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করা যাইতে পারে। প্রসবকালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব, কয়েক মাস মাত্র বয়স্ক শিশুকে যে খাদ্য তরল নহে, বিশেষতঃ মাংস, কাঁচা ফল, গুরুপাক শাকসব্জি প্রভৃতি খাইতে দেওয়া, মক্ষিকাদ্বারা রোগজীবাণু-দূষিত খাদ্য খাওয়ান, যে কোন সময় কাঁদিবা-মাত্রই খাওয়ান, শিশুদিগকে যে কোন নোংরা জিনিষ মুখে দিতে দেওয়া,—এই সমুদয় শিশু-মৃত্যুর সাধারণ কারণ, কিন্তু ঐগুলি নিবারণ করা অধিক কষ্টকর নহে। এইরূপে বহুসংখ্যক শিশু-মৃত্যু যখন অনেকাংশে হ্রাস করা যাইতে পারে, তখন প্রত্যেক মাতাপিতারই কি উপযুক্তভাবে সন্তান পালন করিতে শিক্ষা করা উচিত নহে?

স্বাভাবিক অবস্থার শিশু
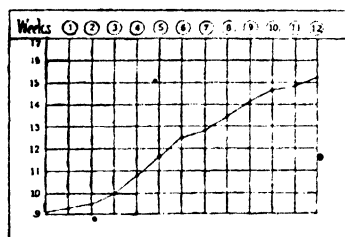
টুলির লিখিত "পেডিয়াট্রিকস্" হইতে উদ্ধৃত
শিশুর জীবনের প্রথম দ্বাদশ সপ্তাহের
স্বাভাবিক ওজনের তালিকা।

জন্মিবার পরে শিশুর স্বাভাবিক ওজন তিন হইতে চারি সের। কখন কখন চারি সেরেরও অধিক ওজন হইয়া থাকে। জন্মিবার পরে প্রথম সপ্তাহে শিশুর ওজন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। প্রথম ছয় মাস প্রতি সপ্তাহে গড়ে দুই ছটাক করিয়া শিশুর ওজন বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। তৎপরবর্ত্তী ছয় মাসে প্রতি সপ্তাহে শিশুর বৃদ্ধির গড় ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম হয়। দ্বিতীয় বৎসরে শিশুর ওজন প্রায় তিন সের বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে শিশুর দন্তোদ্গম সময়ের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

দশ মাস বয়সে শিশুর পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে এবং এক বৎসর বয়সে একটু একটু হাঁটিতে পারা উচিত।

জন্মিবার পরে শিশুর দুইটী স্থান কোমল থাকে; একটী তালুতে অপরটী মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে। পশ্চাদ্ভাগের কোমল অংশ প্রায় দ্বিতীয় মাসের শেষে শক্ত হইয়া যায়; আর তালুর কোমল অংশটী প্রায় আঠার মাসে কঠিন হইয়া থাকে। শিশুর দুই বৎসর বয়স হইবার পরেও যদি উক্ত দুই অংশের কোন অংশ কোমল থাকিয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে যথেষ্ট পরিমাণ উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে অথবা অস্থি-বিকৃতি রোগের নিমিত্তই তদ্রূপ রহিয়াছে।
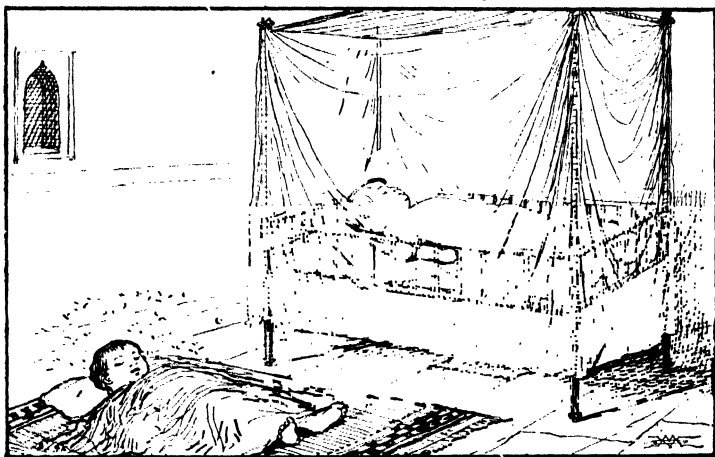
মশারী টাঙ্গাইয়া শোয়াইলে শিশু সুস্থ ও প্রফুল্লিত থাকে

শিশু স্বভাবতঃই দিনের মধ্যে কয়েকবার কাঁদে। ক্ষুধার্ত্ত না হইলেও বা কাঁদিবার কোন কারণ না থাকিলেও শিশুগণ কাঁদিয়া থাকে, মাঝে মাঝে ঐরূপ না কাঁদিলে শিশু নিশ্চয়ই অসুস্থ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শিশুগণ কাঁদিয়া পেশীর চালনা বা ব্যায়াম করিয়া থাকে। মাঝে মাঝে ক্রন্দন করা যখন শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক, তখন ক্রন্দন শুনিলেই অমনি শিশুকে স্তন্য দানের জন্য মাতার ব্যস্ত হওয়ার কারণ নাই।

শিশুপালন

প্রতিবৎসর বসন্ত রোগে হাজার হাজার শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই জন্য তিন মাস বয়স হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক শিশুকেই টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য।

পাড়ায় বসন্ত রোগ হইতে আরম্ভ করিলে জন্মের দুই এক সপ্তাহ পরেই শিশুকে টীকা দেওয়া যাইতে পারে (৪০ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

জন্মিবার পরে কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত—শিশু সুস্থ থাকিলে, প্রায় সকল সময়ই ঘুমাইবে। শিশুর বিছানা যেন বেশ আরামপ্রদ হয়। বাঁশের বা বেতের বোনান চুপড়িতে বা দোলনায় শিশুগণের চমৎকার বিছানা হইতে পারে। শিশুদিগের চোখে মুখে যাহাতে মাছি বসিতে না পারে, এই জন্য ইহার উপরে মশারী টাঙ্গাইয়া দিতে হইবে। চক্ষে ও মুখের উপরে মাছি বসিলে চক্ষে ঘা ও মুখের উপরে ফুস্কুড়ি হইয়া থাকে। উহাতে পেটের অসুখও হয়। নিদ্রা-কালে শিশুগণের নাক মুখ ঢাকিয়া রাখিবেন না, কেননা তাহাদের নির্ম্মল বায়ুর প্রয়োজন। তাই শিশুর শয়ন স্থানে যাহাতে বাতাস রুদ্ধ না থাকে এরূপ ভাবে
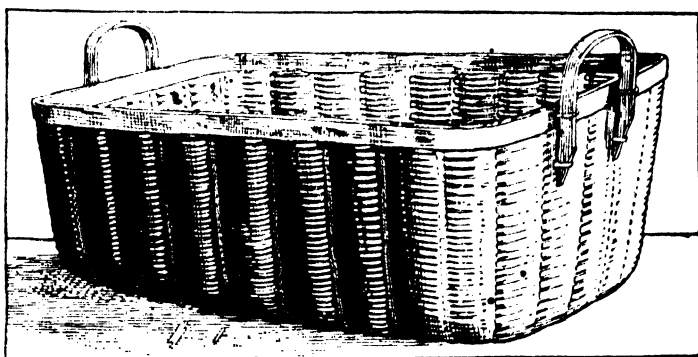
কাপড় চোপড় রাখিবার সাধারণ চুপড়িই শিশুর আদর্শ বিছানা

জানালা খুলিয়া রাখিবেন, অথবা গৃহের বাহিরে উন্মুক্ত বাতাসে রৌদ্র না লাগিতে পারে এরূপ ভাবে কোন আবরণের নীচে শিশুকে শয়ন করাইবেন।

ছোট ছোট শিশুকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। উহাদিগকে প্রায় প্রত্যহ স্নান করান কর্ত্তব্য। যে সকল জননী সন্তানগণের লালন পালনে বিশেষ যত্নবতী তাঁহারা প্রতিদিন তাহাদিগকে স্নান করাইয়া থাকেন। প্রতি-দিন সর্ব্বাঙ্গ স্নান করান সম্ভব না হইলে, অন্ততঃ যে যে অঙ্গে মল মূত্রাদি লাগে, সেই সেই অঙ্গ ধৌত করা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

শিশুকে কখনও ঘরের মেজে বসিতে বা শয়ন করিতে দিবেন না। ঘরের মেজে সর্ব্বদা ধূলি পরিপূর্ণ থাকে। মেজেতে বসাইলে বা শোয়াইলে শিশুগণ প্রথমে মেজে হাত দিয়া, হাত ধূলিমলিন করে, এবং পরে ঐ হাত মুখের ভিতরে দেয়। শুধু ইহাই নহে, অনেক সময়ে তাহারা ধূলি মাটি বা নোংরা জিনিষ

তুলিয়া মুখে দেয়। শিশুগণের পেটে অসুখ ও ক্রিমি হইবার ইহাই একটী বিশেষ কারণ। মেজেতে পরিষ্কার মাদুর বা হোগলা পাতিয়া তদুপরি শিশুকে বসাইবেন। সাত আট মাস বয়স্ক শিশু হামাগুড়ি দিবে, এই জন্য তখন একটী খোঁয়াড় প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে মাদুর পাতিয়া শিশুকে বসাইয়া রাখিবেন।

শিশুকে রবারের চুষনী চুষিতে দিবেন না। শিশুর বয়স যখন পাঁচ কি ছয় মাস, তখন দাঁত উঠিবার সময়, এই সময়ে কামড়াইবার জন্য উহার হাতে একখানি পরিষ্কার চামচে অথবা অপর কোন কঠিন দ্রব্য দিবেন। কামড়াই-বার জন্য হাতে যাহাই দিবেন না কেন, তাহা যেন মধ্যে মধ্যে ফুটাইয়া লইয়া পরিষ্কৃত রাখা হয়।

শিশুর স্নান করান
শিশুকে ধরিবার প্রণালী লক্ষ্য করুন

শিশুর নাভির নিম্নাংশ জড়াইবার নিমিত্ত বস্ত্রখণ্ড সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে। নোংরা বস্ত্র খণ্ড হইতে শুধু যে দুর্গন্ধ আইসে তাহা নহে, উহা ব্যবহারের ফলে শিশুর মলমূত্র ত্যাগের স্থান চুলকাইতে থাকে।

ছোট ছোট বালকদিগের শিশ্নের অগ্রত্বক টানিয়া লইয়া মাঝে মাঝে শিশ্ন মুণ্ড ধৌত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অগ্রত্বক কুঞ্চিত করা সম্ভব না হইলে, চিকিৎসক দ্বারা অস্ত্রোপচার করা উচিত। এইরূপে ছোট ছোট বালিকাদিগের বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের ভাঁজ করা অংশের অভ্যন্তর ভাগও নিয়মিত পরিষ্কৃত রাখিতে হইবে।

শিশুদিগকে কখনও উলঙ্গ রাখিবেন না। কোন সভ্যদেশেই বালক-বালিকাদিগকে উলঙ্গ রাখিবার রীতি নাই। অনেক সময়ে মাতাপিতা সন্তান গণের শুধু বুক পিঠ ঢাকিয়া জামা পরাইয়া দেন, কিন্তু নাভির নিম্নাংশ সম্পূর্ণ নগ্ন রাখেন। এইরূপ ধরণে বস্ত্র পরিধানে ঠাণ্ডা লাগিবার এবং নৈতিক অব-নতির বিশেষ আশঙ্কা আছে।

শিশুর খাদ্য

সুস্থ থাকিতে এবং দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে শিশুর প্রচুর খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন। মাতা যাহাতে সন্তানের প্রয়োজন মত স্তন্য দান করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহার যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া উচিত।

প্রথম দুই তিন মাস কাল শিশুকে নিয়মিত প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর মাতৃস্তন্য খাওয়াইতে হইবে ; পুনঃ পুনঃ শিশুকে স্তন্য দেওয়া উচিত নহে। রাত্রি ১০টার সময়ে শেষবার খাওয়াইয়া প্রভাত পর্য্যন্ত শিশুকে আর খাওয়াইবার একেবারেই আবশ্যকতা নাই। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়াইবার সময়ের ব্যবধানও বাড়াইয়া দিতে হইবে। শিশুর বয়স যখন তিন কি চারি মাস তখন হইতে প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হইবে, রাত্রিকালে খাওয়াইবেন না। খাওয়াইবার নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া, অন্য সময়ে ক্রন্দন করিলে ফুটান হইয়াছে এরূপ একটু গরম জল পান করাইবেন। শিশুকে দিনের মধ্যে কয়েকবার জল পান করান উচিত। শিশুদিগকে জল পান না করাইলে প্রায়ই তাহাদের মুখে ঘা হইয়া থাকে।

মাতা সর্ব্বদা তাঁহার স্তনের বোঁটা নির্ম্মল জলে ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত রাখিবেন।

সাত আট মাস বয়সের পূর্ব্বে শিশুকে মাতৃস্তন্য ব্যতীত অপর কিছু খাইতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ তখনও শিশুর পরিপাক যন্ত্রসমূহ মাছ ভাত বা ঐরূপ কোন খাদ্য পরিপাক করিতে পারে না।

ছয় সাত মাস বয়সে মাতার স্তন্য শিশুর পক্ষে যথেষ্ট না হইলে, মাতা শিশুকে একটু একটু মণ্ড খাওয়াইতে পারেন। ক্রমে পাকস্থলীতে যখন এই ভিন্ন প্রকারের খাদ্য সহ্য হইয়া যাইবে, তখন দুই একবার বাদামী রং এর ময়দার মণ্ড এবং একটী আধ সিদ্ধ ডিম দেওয়া যাইতে পারে। একটী কাঁচা ডিম ভাঙ্গিয়া, গরম গরম ভাতের মণ্ডে দিয়া, নাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। ভাতের মণ্ড দুই ঘণ্টা কাল ধরিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে।

ময়দা রন্ধন পাত্রে দিয়া, আগুনের উপরে রাখিয়া যতক্ষণ না বাদামী রং হয় ততক্ষণ নাড়িতে হইবে, পরে ইহা চালিয়া আধ ঘণ্টা বা তদূর্দ্ধকাল সিদ্ধ করিয়া বাদামী রংয়ের ময়দার মণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে। ছাগলের বা গরুর গরম দুধ বা কোন প্রকার টিনের দুধ মণ্ডের সহিত মিশান যাইতে পারে। শিশু বড় হইতে থাকিলে তাহার খাদ্যে একটু ঝলসান বা সিদ্ধ করা আলু দেওয়া যাইতে পারে।

কচি শিশুকে কখনও মাছ, মাংস, কাঁচা ফলমূল, শাকসব্জি প্রভৃতি খাইতে দিবেন না। দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে শিশুকে চর্ব্বণোপযোগী কোন কঠিন খাদ্য দেওয়া উচিত নহে।

মাতা বা অপর কেহ কোন খাদ্য দ্রব্য চিবাইয়া পরে উহা শিশুকে খাইতে দিবেন না। কারণ, ইহাতে শিশুর মুখে ঘা অথবা অন্য কোন প্রকার পীড়া হইবেই ; এমন কি অন্য কোন অঙ্গের কোন প্রকার সাংঘাতিক ব্যাধিও হইতে পারে। সুতরাং এইরূপে কখনও শিশুদিগকে খাওয়াইবেন না।

শিশুদিগের পক্ষে পাকাফলের রস চমৎকার। ইহা শুধু পুষ্টিকর নহে, ইহা পেটে অসুখ ও কোষ্ঠকাঠিন্যও নিবারণ করে। পাকা মিষ্ট কমলালেবুর

রস সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং উহা প্রতিদিনও দেওয়া যাইতে পারে। ফল হইতে রস নিংড়াইয়া বাহির করিবার পূর্ব্বে, উহা কয়েক মুহূর্ত্ত ফুটন্ত জলে ফেলিয়া রাখিবেন। দুধ খাওয়াইবার সময়ে কখনও ফলের রস খাইতে দিবেন না, অন্ততঃ একঘণ্টা পরে দিবেন।

মাতা কোষ্ঠ পরিষ্কারক কোন ঔষধ গ্রহণ করিলে তাহা স্তন্যে সঞ্চারিত হইয়া কোলের শিশুরও জোলাপের কাজ করে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শিশুর যাহাতে অপকার হয় এরূপ কোন বস্তু মাতার ব্যবহার করা উচিত নহে। মাতা যদি তামাক বা অপর কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন, তবে সন্তানের বিষম অপকার সাধন করা হইবে। ক্রোধেও মাতৃস্তন্য বিকৃত হয়, অনেক সময়ে কেবল মাতার ক্রোধের জন্য তাঁহার স্তন অনিষ্টকর হইয়া শিশুর পীড়া উৎপন্ন করে।

স্তন্যদায়িনী ধাত্রী

সন্তান জন্মিবার পরে মাতা পীড়িতা এবং স্তন্য দানে অসমর্থা হইলে, শিশুকে স্তন্য দান করিতে একজন ধাত্রী নিযুক্ত করা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এই ধাত্রী নিযুক্ত করিবার সময় সে যাহাতে ক্ষয় বা উপদংশ রোগাক্রান্তা না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ধাত্রীর দুগ্ধে শিশু পুষ্টিলাভ না করিলে ধাত্রী পরিবর্ত্তন করিয়া অপর ধাত্রী নিয়োগ করিতে হইবে।

কৃত্রিম উপায়ে দুগ্ধ দান

যদি কোন কারণে মাতা স্তন্যদানে অসমর্থা হন, এবং দুগ্ধদান করিতে পারে এরূপ কোন ধাত্রী যদি না পাওয়া যায়, তবে শিশুদিগকে মাইপোষে দুগ্ধ পান করাইতে হইবে। নারী স্তন্যের অভাবে গরু বা ছাগলের বিশুদ্ধ টাট্‌কা দুধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অধিকাংশ গরম দেশে অসুবিধা এই যে ভাল দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা খুবই কম। দুধও পরিষ্কার নহে, এবং পরিষ্কার হইলেও গরমের জন্য শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার গরুর দুগ্ধের গুণেরও যথেষ্ট তারতম্য আছে। গরুর খাদ্য অনুসারে উহার দুগ্ধের তারতম্য হয়। যে সকল স্থানে সর্ব্বদাই গরম থাকে, তথায় দুগ্ধ দোহনের পর তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে উহা সংগ্রহ করা নিতান্ত প্রয়োজন। দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া একটী ঢাকনী দেওয়া পরিষ্কার রন্ধন পাত্রে রাখিতে হইবে; এই পাত্রটী ইহা অপেক্ষা বড় আর একটী জলপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া উননের উপরে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিতে হইবে। ছোট পাত্রটীর দুধ ফুটে না, কিন্তু উহার মধ্যের রোগ জীবাণু নষ্ট করিবার মত যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়। এইরূপে আধ ঘণ্টা গরম করিয়া শীঘ্র শীঘ্র ঠাণ্ডা করিতে হইবে। যদি কোন কারণে এইরূপে দুধ জাল দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কয়েক মিনিট ধরিয়া দুধ জাল দিতে হইবে।* পরে এক

*বিশেষ দ্রষ্টব্য—পিতলের বা তামার পাত্রে একটু কালের জন্যও দুধ রাখিতে নাই; ঐ ধাতুদ্বয়ের উপরে দুধের ক্রিয়ায় এক প্রকার বিষ উৎপন্ন হয়, উহা স্বাস্থ্যহানিকর—প্রকাশক

পক্ক কমলালেবু কিংবা বিলাতি বেগুনের ভাইটামিন্ সংযুক্ত রসই বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের উপযোগী খাদ্য

সপ্তাহেরও কম বয়স্ক শিশুর জন্য এক পোয়া দুধ লইয়া তাহাতে আধ পোয়া ফুটান জল ও ঝিকি ছটাক চূণের জল মিশাইতে হইবে। পরে ইহাতে আধ ছটাকেরও কিছু কম দুগ্ধ শর্করা (Sugar of milk) দিয়া নাড়িয়া লউন। ইহা শিশুর এক দিনের পক্ষে যথেষ্ট। কয়েক মিনিট উহা ভাল করিয়া ফুটাইয়া লইয়া একটী বড় পরিষ্কার বোতলে করিয়া কোন শীতল জায়গায় রাখিয়া দিবেন।

শিশুকে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর প্রতি বারে তিন কাঁচ্চা করিয়া পান করাইবেন। খুব গরমের সময় বৈকালে খাওয়াইবার দুধ মধ্যাহ্নকালে কেবল একবার মাত্র ফুটাইয়া লইতে হইবে। দুধ না ফুটাইলে উহা অপরাহ্নে বিকৃত হইয়া যাইবে ও উহা পান করাইলে শিশু পীড়িত হইয়া পড়িবে।

মিল্ক সুগার (Milk sugar) পাওয়া না গেলে উহার পরিবর্ত্তে অর্দ্ধ পরিমাণ সাধারণ ইক্ষু চিনি ব্যবহার করা যাইতে পারে। কখন কখন ইক্ষু চিনি ছোট ছোট শিশুর সহ্য হয় না।

তিন চারি সপ্তাহ বয়স পর্য্যন্ত প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর শিশুর এক ছটাক পরিমাণ দুধ পান করা প্রয়োজন। অতএব নিম্নলিখিত ভাবে একদিনের আধ-সের খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইবে :—

এক পোয়া তিন কাঁচ্চা দুধ, তিন ছটাক এক কাঁচ্চা ফুটান জল, ছোট চামচের দুই চামচে চূণের জল ও আধ ছটাক মিল্ক সুগার বা এক কাঁচ্চা ইক্ষু চিনি। (৫০শ অধ্যায়ে ২৬নং ব্যবস্থা পত্রে চূণের জলের বিষয় দেখুন।)

শিশুর বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হইবে, যেন তিন মাস বয়স হইলে উহার দৈনিক প্রায় এক সের খাদ্য প্রয়োজন হয়। এই খাদ্য প্রস্তুত করিতে পূর্ব্বোল্লিখিত পরিমাণ দ্বিগুণ করিয়া লইতে হইবে।

তিন হইতে ছয় মাস বয়স্ক শিশুদিগের প্রতি বারে আড়াই ছটাক হইতে সাড়ে তিন ছটাক পরিমাণ দুধ খাওয়াইতে হইবে। দৈনিক সাত বার শিশুকে সোয়া সের হইতে দেড় সের খাদ্য খাওয়ান আবশ্যক। ১৫ ছটাক গরুর দুধ, ১০ ছটাক অন্নমণ্ড, দেড় ছটাক মিল্ক সুগার বা তিন কাঁচ্চা ইক্ষু চিনি মিশাইয়া প্রায় দেড় সের পরিমাণ খাদ্য প্রস্তুত হয়। ছয় মাস হইতে এক বৎসর বয়স্ক শিশুর দিনে ২৫ ছটাক হইতে ৩০ ছটাক খাদ্যের প্রয়োজন। ত্রিশ ছটাক খাদ্য প্রস্তুত করিতে ১৮ ছটাক গরুর দুধ, ১২ ছটাক অন্নমণ্ড, ১ ছটাক ৩ কাঁচ্চা মিল্ক সুগার বা দেড় কাঁচ্চা ইক্ষু চিনির প্রয়োজন।

উপরে শিশুর উপযুক্ত গরুর দুধ প্রস্তুত করিবার প্রণালীর বিষয় কেবল সাধারণ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিন মাস বয়স হইতে খাদ্যে জলের পরিমাণ যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, সবল শিশুর খাদ্যে তাহা অপেক্ষা জল কম মিশাইতে হইবে। পাতলা দুধ হইলে জল না মিশানও যাইতে পারে। কোন শিশুর পুষ্টি না হইলে, সম্ভব হইলে, একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে ঐ শিশুর খাদ্য প্রস্তুত করা ভাল।

দুধের টিন খুলিবার পূর্ব্বে, উহার উপরে ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিতে হইবে; এবং প্রয়োজন মত দুধ ঢালিয়া লইয়া উহাতে যাহাতে ধূলি প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য একটী পরিষ্কার বাটী উপুড় করিয়া টিনটী ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। যে দুধ মিষ্ট নহে গরমকালে টিন খুলিবার পর তাহা এক দিনের বেশী রাখা যায় না। টিনের দুধ সর্ব্বদা ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার যায়গায় রাখিতে হইবে।

টিনের দুগ্ধ ও জল মিশাইবার পরিমাণের তালিকা

গরুর বা ছাগলের দুধ সংগ্রহ করা অসম্ভব হইলে টিনের জমান দুধ ব্যবহার করা প্রয়োজন হইতে পারে। টিনের দুই রকম, মিষ্ট দুধ, যেমন,—

বয়স	২ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৫ দিন	৬ দিন	৭ দিন	১ম হইতে ৪র্থ সপ্তাহ	৪র্থ সপ্তাহ হইতে ৩য় মাস	৩য় হইতে ৬ষ্ঠ মাস	৬ষ্ঠ হইতে ৯ম মাস	৯ম মাস হইতে ১ বৎসর
মিষ্ট দুধ	১ ভাগ	১ ভাগ	১ ভাগ	১ ভাগ	১ ভাগ	১ ভাগ	১ ভাগ	১ ভাগ	১ ভাগ	১ ভাগ	১ ভাগ
সাদা দুধ	৩ ভাগ	৩ ভাগ	৩ ভাগ	৩ ভাগ	৩ ভাগ	৩ ভাগ	৩ ভাগ	৩ ভাগ	৩ ভাগ	৩ ভাগ	৩ ভাগ
ফুটান জল	৬০ ভাগ	৫০ ভাগ	৪০ ভাগ	৩০ ভাগ	২৪ ভাগ	২০ ভাগ	১৬ ভাগ	১২ ভাগ			
অন্নমণ্ড (২৫নং ব্যবস্থা পত্র)									১২ ভাগ	১২ ভাগ	১২ ভাগ
প্রতিবারের খাদ্যের পরিমাণ	১ কাঁচ্চা হইতে আধ ছটাক	১ কাঁচ্চা হইতে আধ ছটাক	আধ ছটাক	আধ ছটাক	১ কাঁচ্চা	১ কাঁচ্চা	১ ছটাক	দেড় ছটাক হইতে ২ ছটাক	আড়াই ছটাক হইতে সাড়ে তিন ছটাক	সাড়ে তিন ছটাক হইতে ৪॥০ ছটাক	৪ ছটাক হইতে ৫ ছটাক
যে পরিমাণ সময় অন্তর অন্তর খাওয়াইতে হইবে	২ ঘণ্টা	২ ঘণ্টা	২ ঘণ্টা	২ ঘণ্টা	২ ঘণ্টা	২ ঘণ্টা	২ ঘণ্টা	২॥০ ঘণ্টা	৩ ঘণ্টা	৩॥০ ঘণ্টা	৪ ঘণ্টা
যতবার খাওয়াইতে হইবে	৬ বা ৮ বার	৮ বার	১০ বার	১০ বার	৮ বা ১০ বার	৮ বা ১০ বার	৮ বার	৭ বা ৮ বার	৭ বার	৬ বার	৫ বার

নেসল্ মার্কা, ঈগল মার্কা, গোয়ালিনী মার্কা; আর সাদা দুধ। শিশুর ব্যবহারের জন্য মিষ্ট ও সাদা দুধ নিম্নের তালিকা অনুসারে মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। এই তালিকা খানি ডাক্তার হল্ট সাহেব কৃত The care and feeding of children নামক পুস্তক চীনা ভাষায় প্রকাশিত সংস্করণ হইতে লওয়া হইয়াছে।

শিশুকে দুগ্ধ পান করাইবার উপযুক্ত মাইপোষের চিত্র দেওয়া হইয়াছে। মাইপোষ অবশ্যই পরিষ্কার রাখিতে হইবে। প্রত্যেকবার ব্যবহারের পূর্ব্বে উহার রবারের বোঁটাটী খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে এবং বাহিরে ভাল করিয়া ধৌত
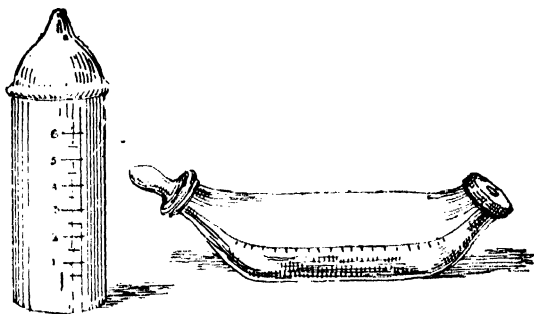
দুই প্রকার আদর্শ মাইপোষ

করিতে হইবে; যতক্ষণ একটুও দুধের দাগ দেখা যাইবে ততক্ষণ ধুইতে হইবে। রবারের বোঁটাটীও ভাল করিয়া ধুইতে হইবে। তারপর রবারের বোঁটাটী ও মাইপোষটী একখানি পরিষ্কার পাতলা কাপড়ে জড়াইয়া, একটী পাত্রে মাইপোষটী ডুবিয়া যায় এই পরিমাণ ঠাণ্ডাজলের মধ্যে রাখিয়া, কয়েক মিনিট ধরিয়া ঐ জলটা ফুটাইতে হইবে। যদি প্রত্যেকবার দুধ পান করাইবার পরে, ফুটান জল দিয়া মাইপোষের ভিতর এবং উহার বোঁটা ভাল করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার কাপড়ে জড়াইয়া রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দিনে কেবল একবার জলে ফুটাইয়া লইলেই চলিবে। অনেক ছেলে মেয়ের এগার, বার মাস বয়সেই চামচে দ্বারা খাওয়ান প্রয়োজন হয়, কিন্তু চামচে ব্যবহার করিতে হইলে, যাহাতে খাদ্য, বাটী ও চামচে পরিষ্কার থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য

সুস্থদেহ নবজাত শিশুর সাধারণতঃ দৈনিক একবার হইতে চারিবার পর্য্যন্ত মলত্যাগ হইয়া থাকে। দুই কি তিন মাস বয়সের পরে, দৈনিক দুইবার

মলত্যাগ হওয়া আবশ্যক। দৈনিক একবার কি দুইবার মলত্যাগ না হইলে কোষ্ঠকাঠিন্যের চিকিৎসা করা উচিত। শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্যের চিকিৎসা অনতিবিলম্বে করা উচিত, তাহা না হইলে ইহার ফলে শিশু সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হইতে পারে। কোষ্ঠ পরিষ্কার করিতে নিম্নলিখিত প্রণালীগুলির মধ্যে একটী বা তদধিক অবলম্বন করা যাইতে পারে।

১। খাদ্যে স্নেহ পদার্থের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবেন।

২। শিশুকে প্রচুর জল পান করিতে দিবেন। জল যেন ঈষদুষ্ণ থাকে এবং ফুটান হয়।

৩। প্রতিদিন পাকা মিষ্ট কমলালেবুর রস অথবা অন্য কোন পক্ক ফলের রস পান করাইবেন।

৪। এক টুকরা শক্ত শ্বেতবর্ণ সাবান মোচার ডগার মত করিয়া কাটিতে হইবে। উহা লম্বায় হইবে দুই ইঞ্চি, সরু দিক একটী পেন্সিলের মত মোটা হইবে এবং মোটা দিকের ব্যাস আধ ইঞ্চি অপেক্ষা একটু বেশী হইবে। প্রতিদিন সকাল বেলা যথা সময়ে মলত্যাগ না হইলে, উক্ত সাবান খণ্ডে সামান্য "ভ্যাসেলিন" মাখাইয়া, উহার অৰ্দ্ধেক মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবেন, এবং কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া রাখিয়া পরে আপনা আপনি বাহির হইতে দিবেন। অনেক সময়ে উহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায়।

উদরাময়

শিশুগণ ঘন ঘন দুর্গন্ধ জলবৎ মলত্যাগ করিলে উদরাময় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অনেকস্থলে এরূপ অবস্থায় একদিনের জন্য সাধারণ খাদ্য বন্ধ করিয়া, শিশুকে উষ্ণজল বা অন্নমণ্ড ব্যতীত কিছুই না দেওয়া প্রয়োজন। অধিক পরিমাণ জলে অল্প পরিমাণ চাউল—দানাগুলি না ভাঙ্গা পর্য্যন্ত—সিদ্ধ করিয়া, একখানি পরিষ্কার নেকড়ায় জল ছাড়া অন্য কিছু না পড়িতে পারে, এইরূপ ভাবে ছাঁকিয়া অন্নমণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। শিশুর খাদ্য ও পাণীয় যেন সর্ব্বদাই নির্ম্মল থাকে। ইহাতে পেটের অসুখ নিবারিত না হইলে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লিখিত প্রণালী মত চিকিৎসা করিতে হইবে।

২৬শ অধ্যায়

ছোট ছোট বালকবালিকা ও শিশুদিগের উদরাময়

কতিপয় ব্যাধির উদরাময়ই প্রধান লক্ষণ, যেমন—সাধারণ উদরাময়, পুরাতন অজীর্ণরোগ এবং শিশু বিসূচিকা। কিন্তু সকল রোগের উদরাময়েরই কারণ ও চিকিৎসা প্রায় একই প্রকার বলিয়া, আমরা এক অধ্যায়ে এক সঙ্গেই উহার আলোচনা করিব।

এক প্রকার উদরাময়ে সহস্র সহস্র শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীবাণু দ্বারা উদরাময়ের সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্র শিশুর পরিপাক যন্ত্রাদি এত দুর্ব্বল যে উহারা ঐ রোগ জীবাণু বিনষ্ট করিতে অসমর্থ। সকলেই জানেন যে একজন বয়স্ক ব্যক্তির জীবন নাশ করিতে যে পরিমাণ বিষ আবশ্যক, একটী শিশুর জীবন নাশের জন্য তদপেক্ষা খুব অল্প মাত্রাই যথেষ্ট। তাই যে দূষিত, অপরিষ্কৃত, ও দুষ্পাচ্য খাদ্যের অল্প পরিমাণ খাইলে বয়স্ক লোকদিগের সামান্য উদরাময় হয়, তাহা খাইয়া শিশুগণের সাংঘাতিক অসুখ হয়, এমন কি, জীবন সংশয়ও হইতে পারে। অনেকে এই বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করেন না, তাই বয়স্কগণ যাহা খায় শিশুগণও তাহা খাইতে পারে মনে করিয়া, তাহাদের সকল প্রকার খাদ্যই দিয়া থাকেন।

ছোট শিশুদিগকে দুধ বা কোন প্রকার মণ্ড খাওয়ান হয়, উহাতে রোগ জীবাণু খুব দ্রুত বর্দ্ধিত হয়। শিশুদিগের বেশী উদরাময় হওয়ার ইহাও একটী কারণ।

শিশুদিগের বেশী উদরাময় হইবার তৃতীয় কারণ এই যে উহাদের সহজেই খুব শীত বোধ হয়, ও তাহারই ফলে অনেক সময়ে উহাদের উদরাময় হয়। খুব গরমের সময়েও শিশুদিগের অল্পেই শীত বোধ হয়, এই জন্য রাত্রিকালে তাহাদের তলপেট ঢাকিয়া রাখিবার জন্য কোন কাপড় রাখিয়া দিবেন।

শিশুদিগের জীবনীশক্তি খুব কম বলিয়া উহারা উদরাময় রোগে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উদরাময় হইলে ভক্ষিত খাদ্যের পরিপাক হয় না; উহা শুধু অন্নবহানাড়ী দিয়া বাহির হইয়া যায়, দেহের পুষ্টিসাধনের বা শক্তি সঞ্চয়ের জন্য শোণিত বা উত্তাপ দান করিতে পারে না। উদরাময় হইলে খাদ্যদ্রব্য

হইতে শিশু যে কেবল পুষ্টিসাধন বস্তু আহরণ করিতে পারে না ইহাই নহে, অধিকন্তু উহার দেহ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ জলীয় পদার্থ বাহির হইয়া যায়। এই নিমিত্ত উদরাময়ে মল অতিশয় পাতলা ও জলের ন্যায় হইয়া থাকে।

এই সমুদয় কারণে শিশুদিগের পেটের পীড়া উপেক্ষা না করিয়া যখনই পাতলা ও জলের মত মল দেখিতে পাইবেন, তখনই প্রতিবিধান করিবেন।

নিবারণ

কি কি কারণে শিশুদিগের মধ্যে উদরাময়ের প্রকোপ এত অধিক তদ্বিষয়ে মাতাপিতা সম্যক্ অবগত হইলে, উহা নিবারণ করা সহজসাধ্য হইবে।

এইরূপে খাওয়াইতে হয় — এইরূপে খাওয়ান উচিত নহে

পারিপার্শ্বিক অপরিচ্ছন্নতা

প্রথমতঃ, শিশুকে কখনও অপরিচ্ছন্ন ঘরের মেঝেতে বা পথের উপরে বসিতে, বা শয়ন করিতে, বা হামাগুড়ি দিতে দিবেন না। মেঝে বিশেষতঃ মাটী বা ইটের মেঝে বড়ই নোংরা। সাধারণতঃ রাস্তা ও পায়খানা হইতে পায়ের সঙ্গে আনিত ধূলা ও ময়লায় ঘরের মেঝে নোংরা হয়। গৃহপালিত পশু পক্ষী এই ময়লা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করে। অপরিষ্কার গৃহে লালিত পালিত শিশুদিগের প্রায়শঃ উদরাময় রোগে ভুগিতে হইবেই। ঘরের সর্ব্বত্র প্রত্যেক কোণে এবং জিনিষ পত্রাদির নীচে ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার রাখিতে হইবে। মাটী অথবা ইটের মেঝে হইলে, বেড়ার বা দেওয়ালের ধারে ও আসবাবসমূহের

নীচে চূণ ছড়াইয়া দিবেন। মুরগী বা অপর কোন প্রাণীকে ঘরে প্রবেশ করিতে বা শিশুদিগকে গৃহের মেঝে মলমূত্র ত্যাগ করিতে দিবেন না। মাটী হইতে ঘরের মেঝে উচ্চ হইলে, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে ফাঁক থাকিলে, ঐ ফাঁক সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিবেন। এই স্থানে কখনও ঘরধোয়া জল অথবা অপর কোন নোংরা জল ফেলিবেন না। গৃহ প্রাঙ্গন সর্ব্বদাই ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিবেন। গোময়-স্তূপ, তরকারীর খোসা প্রভৃতি আবর্জ্জনারাশি, এবং দূষিত নোংরা জল গৃহপ্রাঙ্গনে জমিয়া থাকিলে, তথায় লক্ষ লক্ষ রোগ জীবাণু উৎপন্ন হয়। যে সকল শিশু প্রাঙ্গনে হামাগুড়ি দেয়, বা খেলা করে, তাহারা ঐ সমুদয় রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পীড়িত হইয়া থাকে।

মাছি উদরাময় বিস্তৃত করে

মাছি শিশু সংহার করে। উহারা গোময়স্তূপ, আবর্জ্জনারাশি ও সর্ব্বপ্রকার নোংরা স্থান হইতে রোগ জীবাণু বহন করিয়া শিশুর খাদ্যে মিশ্রিত করিয়া দেয়। শিশুর নিমিত্ত খাদ্য প্রস্তুত হইলেই উহা এইরূপে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে মাছি বসিতে না পারে। কারণ শিশুর খাদ্যে অথবা মাইপোষের রবারের চুষণীর উপরে মাছি বসিয়া ময়লা ও বিষাক্ত রোগ জীবাণু রাখিয়া যায়। শিশু উহা গলধঃকরণ করে, এবং কালে কঠিন উদরাময় দ্বারা আক্রান্ত হয়। মাছি কিরূপে বিনাশ করা যায়, এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য উপদেশ ৪৮শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

ময়লা দুগ্ধ ও অপরিষ্কার মাইপোষ

রোগ জীবাণু বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে দুধ গরম করিবার প্রয়োজনীয়তা ২৫শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। শিশুর খাদ্য ভালরূপে ফুটাইয়া লইয়া ঢাকিয়া রাখিলে এবং দুধের বোতল ও রবারের চুষনী নিয়মিত সিদ্ধ ও উত্তপ্ত জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিলে পেটের পীড়া ও অন্যান্য ব্যাধির আক্রমণ অধিকাংশস্থলে পরিহার করা যাইতে পারে।

অনুপযুক্ত খাদ্য ও অনিয়মিত ভোজন

শিশুকে মিঠাই বা পিষ্টক প্রভৃতি খাইতে দিয়া কয়েক মিনিটের জন্য তাহার ক্রন্দন থামান যায় বটে, কিন্তু ঐ সমুদয় খাদ্য খাইয়া পেটের অসুখে ও যন্ত্রণায় শিশু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া কাঁদিতে থাকে ও কখন কখন মরিয়াও যায়। মাছি মিষ্ট দ্রব্যে আকৃষ্ট হয়, এবং উহার উপরে পড়িয়া খাইবার সময়, তাহার শরীর ও পা হইতে ময়লা ও রোগ জীবাণু খাদ্যে লাগিয়া যায়। দোকানের

মিঠাই মণ্ডা এইরূপে শুধু মাছি দ্বারা নহে, রাস্তার ধূলি ও বিক্রেতার নোংরা হাতেও বিষাক্ত হয়। এই জন্য বাজারের খাদ্য গৃহে আনিয়া জলে ফুটাইয়া তবে শিশুকে খাইতে দেওয়া উচিত, এবং যে সকল দ্রব্য পুনরায় জলে ফুটাইয়া শোধন করা সম্ভব নহে, সেই সকল দ্রব্য কখনও শিশুকে খাইতে দিবেন না। এই সমুদয় খাদ্য শিশুদিগকে—আবার অনিয়মিত সময়ে খাইতে দিলে, দ্বিগুণ ক্ষতি সাধিত হয়। প্রত্যেক শিশুকেই নিয়মিত সময়ে খাইতে দিবেন, এবং নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ে এক কণা খাদ্যও খাইতে দেওয়া কোন মতে উচিত নহে।

যে শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে, তাহার মায়ের কোন অসুখ হইলে, বা তাহার মা, যে ঔষধ বা খাদ্যে দুগ্ধ বিকৃত হয় এরূপ কোন ঔষধ বা খাদ্য ব্যবহার করিলে, ঐ শিশুর খুব পেটে অসুখ হইতে পারে। মাতৃদুগ্ধপায়ী শিশুর উদরাময় উত্তমরূপে আরোগ্য করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে মাতার স্বাস্থ্য কিরূপ এবং যাহাতে শিশুর উদরাময় হইতে পারে, এরূপ কোন প্রকার দূষিত খাদ্য বা ঔষধ ব্যবহারের ফলে মাতৃদুগ্ধ খারাপ হইয়াছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে।

বালকবালিকা ও শিশুগণের উদরাময় চিকিৎসা

উদরাময় দূর করিতে তিনটী কার্য্য নিতান্ত আবশ্যক। যথা :—

১। উদরাময় আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সকল প্রকার দুগ্ধ বা দুগ্ধজ খাদ্য বন্ধ করিতে হইবে।

২। প্রচুর পরিমাণে জল পান করাইতে হইবে।

৩। কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইতে হইবে।

উপরি-উক্ত তিনটী উপায়ের সহিত আরও কয়েকটী উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে; কিন্তু এই তিনটীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

পেটের পীড়াগ্রস্ত শিশুকে দুগ্ধপান করান অন্ততঃ সম্পূর্ণ এক দিন একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় শিশুর পাকস্থলী ও অন্ত্র দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না। দুগ্ধ পরিপাক না হওয়াতে উহা অন্নবহানালীতেই থাকিয়া যায়, এবং উদরাময়ের জীবাণুগুলির খাদ্যস্বরূপ হয়। এইরূপে আরও অধিক বিষ উৎপন্ন হয়।

শিশুর দুগ্ধ বন্ধ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে শিশুকে "অন্নমণ্ড" (৫০শ অধ্যায়ে ২নং ব্যবস্থা পত্র দ্রষ্টব্য), ডিম্বের শ্বেতাংশ (৪৭শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) এবং অল্প পরিমাণে পাকা মিষ্ট কমলালেবুর রস প্রদান করিবেন। পেটের অসুখ সম্পূর্ণ নিরাময়

না হওয়া পর্য্যন্ত দুগ্ধ বন্ধ রাখিবেন, এবং রোগ নিরাময় হইবার পরেও প্রথম প্রথম পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম পরিমাণে দুধ দিতে আরম্ভ করিবেন।

তরল খাদ্য অধিক পরিমাণে দেওয়া উচিত, কারণ উদরাময়ে প্রতিবার দাস্ত হইবার সঙ্গে শরীর হইতে প্রচুর তরল পদার্থ বাহির হইয়া যায়। দেহের শোণিত হইতে উক্ত তরল পদার্থ বাহির হয়, তাই প্রচুর পরিমাণে গরম, সিদ্ধ জলপান করিতে দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। শুধু জলের পরিবর্ত্তে মাঝে মাঝে অন্নমণ্ড দেওয়া যাইতে পারে।

উদরাময় ও বমন হইতে থাকিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে যে দেহ অন্নবহানালীস্থ কোন অনিষ্ট-কারক পদার্থ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। চক্ষে মরিচ লাগিলে যেমন উহা হইতে জল বাহির হয়, এবং উহা বাহির করিয়া দিবার জন্ত চক্ষু যেমন দ্রুত মিট মিট করিতে থাকে, সেইরূপ শিশুর অন্নবহানালীতে সঞ্চিত দূষিত ও দুষ্পাচ্য খাদ্য দূর করিবার জন্ত উদরাময় ও বমনের সঞ্চার হয়। যাহাতে ঐ কার্য্যের সাহায্য হয়, এই জন্ত শিশুকে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর গরম সিদ্ধ জল যতটা পান করান যায়, করাইবেন। এই জল অন্নবহানালীর মধ্য দিয়া গমন করিয়া অনিষ্টকারক পদার্থ বাহির করিয়া দিবে। উক্ত জলের সহিত প্রতি পাইণ্টে ছোট চামচের আধ চামচে পরিমাণ লবণ মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। প্রত্যেক বার দাস্ত হইবার পরে, শিশুকে উক্ত লবণ মিশ্রিত জল দ্বারা ডুস্ দিবেন (২০ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। বস্তিক্রিয়ার জল ১০৫° ডিগ্রি ফারেন্‌হাইট্ উষ্ণ হওয়া উচিত। চিকিৎসার প্রারম্ভে শিশুকে ছোট এক চামচে বিশুদ্ধ রেড়ির তেল (ক্যাষ্টর অয়েল) দিবেন। শিশুর বয়স চারি কিংবা পাঁচ বৎসর হইলে ছোট দুই চামচে রেড়ির তেল দিবেন। প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর তলপেটে সেঁক প্রদান করিবেন। শিশুকে শান্তভাবে বিছানায় শুইয়া থাকিতে দিবেন, কোন কারণেই যেন সে বিছানা ত্যাগ না করে। কারণ, অঙ্গচালনা করিলে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইবে।

উপরি-উক্ত প্রণালীতে একদিন চিকিৎসা করিয়া পর দিবস প্রতি তিন কি চারি ঘণ্টা অন্তর, উষ্ণজল দ্বারা বস্তিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিলে এবং চারি কি পাঁচ ঘণ্টা অন্তর ৭ (খ) নং ব্যবস্থা পত্রের ঔষধ খাইতে দিলে, পেটের পীড়া কমিয়া আসিবে। শ্বেতসার বা মাড দ্বারা বস্তিক্রিয়া করাইতে হইলে, প্রথমে অল্প পরিমাণে ঠাণ্ডা জলে কয়েক চামচে চাউল বা গম বা অপর কোন শস্তের শ্বেতসার মিশ্রিত করিবেন; তারপর উহাতে এক গেলাস জল ঢালিয়া ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া লইবেন। বস্তিক্রিয়ার জন্ত শ্বেতসারের তরল পদার্থ যেন বেশ

পাতলা হয়। প্রথম দিবসের ন্যায় পর দিবসও সেঁক চলিতে থাকিবে। তবে পানীয় জল পূর্ব্বদিন অপেক্ষা কম দিতে হইবে।

ঠাণ্ডা লাগিয়া পেটের পীড়া বৃদ্ধি না পাইতে পারে তজ্জন্য শিশুর তলপেট কোন কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।

শিশুকে প্রায় প্রতিদিনই স্নান করাইয়া দিবেন, এবং তাহার শয্যাদি পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। শিশুর গায়ে মাছি না পড়ে তজ্জন্য সর্ব্বদা মশারী খাটাইয়া দিবেন। পীড়িত শিশুর খাবার বাসন, গেলাস, চাম্‌চে প্রভৃতি গৃহের অন্যান্য শিশুদিগকে কখনও ব্যবহার করিতে দিবেন না। পীড়িত শিশুর ব্যবহৃত বাসনাদি জলে ফুটাইয়া লইবেন।

অন্ত্রের প্রদাহ ও তন্মধ্যস্থ বিষাক্ত পদার্থের জন্য উদরাময় হয়। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপিত পেটেণ্ট ঔষধ কদাপি ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ, উহাতে শীঘ্র শীঘ্র দাস্ত বন্ধ হয় সত্য, কিন্তু উদরাময়ের কারণ দূর হয় না। যে বিষাক্ত পদার্থের জন্য উদরাময় হয়, উহা অন্ত্র মধ্যেই থাকিয়া যায়, ও পুনরায় আরও ভয়ানক উদরাময় সৃষ্টি করে। ঐ বিষাক্ত পদার্থ দূর করাই রোগ নিবারণের একমাত্র উপায়।

২৭শ অধ্যায়

শিশু ও বালকবালিকাদিগের কতিপয় সাধারণ ব্যাধি

মুখের ঘা

মাতার স্তনের বোঁটা, অথবা মাইপোষ বা উহার চুষনী পরিষ্কার না রাখার জন্য, স্তন্যপায়ী শিশুদিগেরই এই রোগ খুব বেশী। শিশুকে খাওয়াইবার পূর্ব্বে ও পরে অঙ্গুলিতে পাতলা নেকড়া বা কোন সূক্ষ্ম কাপড় জড়াইয়া বোরাসিক এ্যাসিড সলিউসন্ (১নং ব্যবস্থা পত্র দ্রষ্টব্য) দ্বারা ভিজাইয়া লইয়া শিশুর মুখ-গহ্বর পরিষ্কার করিয়া দিবেন। কখন কখন এক বৎসর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক শিশুর মুখের ঘা জল মিশান পোটাসিয়াম্ ক্লোরেট সলিউসন্ দ্বারা পরিষ্কার করিলে খুব উপকার পাওয়া যায়। মুখের মধ্যে ছোট ছোট সাদা গুটিকা দেখা গেলে ফিট্‌কিরি পোড়াইয়া প্রয়োগ করিবেন (৮ নং ব্যবস্থা পত্র দ্রষ্টব্য)। মুখের ঘা কিছুতেই না সারিলে একজন সুচিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত।

বায়ুশূল

শূলবেদনার আক্রমণ সহসা উপস্থিত হয়, এবং এইরূপ হইলে শিশু যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে থাকে, বেদনার হ্রাস ও বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, চীৎকারেরও হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়। পাকস্থলী ও পেট বায়ুপূর্ণ হওয়াতে, তলপেট স্ফীত ও শক্ত হইয়া যায়। বেদনার কালে শিশুর উরুদ্বয় তলপেটের দিকে টানিয়া লয়। যে সকল শিশুকে কৃত্রিম উপায়ে দুধ খাওয়ান হইয়া থাকে, যাহাদিগকে বারংবার খাওয়ান হয়, বা অত্যধিক মিষ্ট ও অবিশুদ্ধ খাদ্য খাওয়ান হয়, তাহাদের বায়ুশূল জন্মে। যে খাদ্য ভালরূপে সিদ্ধ হয় নাই, সেইরূপ খাদ্য খাওয়াইবার নিমিত্তও ছোট ছোট বালকবালিকাদিগের শূলবেদনার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

চিকিৎসা প্রণালী

চাম্‌চে বা মাইপোষে করিয়া গরম জল পান করিতে দিলে, শূল বেদনার উপশম হইতে পারে। কাপড় অধিক পরিমাণে গরম করিয়া, শিশুর তলপেটের

উপরে সেঁক দিবেন। ইহাতে বেদনার উপশম হইলে, ১০৫° ফারেনহাইট্ উষ্ণ, এক পাইট জলের সহিত ছোট এক চাম্‌চে লবণ এবং আধ ছটাক বা ছোট দুই চাম্‌চে গ্লিসারিন্ মিশাইয়া শিশুকে ডুস্ দিবেন। ইহাতে উপর পেটের সমস্ত মল বাহির না'ও হইতে পারে; এই জন্য ডুস্ দেওয়া হইলেও একমাত্রা "ক্যাষ্টর অয়েল" খাওয়াইয়া দিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ বেদনা হইতে থাকিলে, দুই তিন দিন ধরিয়া দিনে দুইবার ৭ (খ) নং ব্যবস্থা পত্রের ছোট এক চাম্‌চে ঔষধ খাইতে দিবেন।

অপরিচ্ছন্ন ও অনুপযুক্ত খাদ্য খাওয়াইলে শূল বেদনা জন্মিবার সম্ভাবনা, অন্যপক্ষে উপযুক্ত ও পরিষ্কার খাদ্য খাওয়াইলে উহার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

তড়কা (Convulsions)

নানা কারণে শিশুদিগের তড়কা হইতে পারে, যেমন,—অনুপযুক্ত বা দুষ্পাচ্য খাদ্যাহার, অস্থিবিকৃতি রোগ, কৃমি, ম্যালেরিয়া ও কলেরা প্রভৃতির জন্য। তড়কা আরম্ভ হইলে হাত, মুখ ও পায়ের মাংসপেশীসমূহ মোচড়াইতে বা সঙ্কুচিত হইতে থাকে, মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া যায়; চক্ষুর তারা স্থির ও উর্দ্ধ দৃষ্টি হয়, মাথা হেলিয়া পড়ে, হস্ত মুষ্টি বদ্ধ হয়, এবং পদদ্বয় যেন খিল ধরিয়া যায়।

প্রতীকার

যত সত্বর সম্ভব ১০৫° ডিগ্রি ফারেনহাইট্ উষ্ণ জল প্রস্তুত করুন। শিশুর মাথা ও মুখ বাদে সমস্ত শরীর ঐ জলে রাখুন, এই সময়ে উহার মাথার উপরে একখণ্ড শীতল জলে ভিজান নেকড়া নিংড়াইয়া রাখিয়া দিবেন। অনেক সময়ে পেটের মধ্যে দূষিত ও দুষ্পাচ্য খাদ্যদ্রব্য জমিয়া থাকিবার ফলে তড়কা হয়, এই জন্য শিশুকে কিছুক্ষণ ধরিয়া গরম জলে রাখিয়া দিবার পরে উহাকে একবার গরম জল দ্বারা বস্তিক্রিয়া করাইয়া ছোট এক চাম্‌চে বা তদধিক "ক্যাষ্টর অয়েল" দেওয়া কর্ত্তব্য। শিশুর খাদ্য খুব সাবধানে প্রস্তুত করিতে হইবে। কারণ অনেক সময়ে দূষিত খাদ্যের নিমিত্ত উক্ত রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। গরু বা ছাগলের দুধ বন্ধ করিয়া কোন প্রকার জমান দুধ বা অন্য প্রকার প্রস্তুত খাদ্য ক্রয় করা প্রয়োজন হইতে পারে, পেটের অবস্থার বিষয়ও খুব সতর্ক হইতে হইবে, কারণ যাহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য না আসিতে পারে তাহা করিতেই হইবে।

অস্থিবিকৃতি রোগ (Rickets)

কৃত্রিম উপায়ে অর্থাৎ মাতৃস্তন্য না দিয়া, যে সকল শিশুকে খাওয়ান হইয়া থাকে, তাহারা সাধারণতঃ উক্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্রায়ই ছয় হইতে

পনের মাস বয়সের মধ্যে শিশুদিগের এই রোগ হইয়া থাকে। তালুর অতি কোমল অংশ সময় উত্তীর্ণ হইবার পরেও স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয় না। পায়ের হাড়গুলি বক্র হইয়া যায়। তলপেট আয়তনে অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া থাকে। শিশু দুর্ব্বল অপূর্ণাঙ্গ হইয়া পড়ে।

প্রতীকার

দেহের অস্থি গঠনের নিমিত্ত যে উপাদানের প্রয়োজন, ভক্ষ্য বস্তুতে তাহার অভাব হইলেই শিশুর উক্ত রোগ হইয়া থাকে; এই জন্য প্রথমে শিশুকে উত্তম দুগ্ধ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দৈনিক কয়েকবার একটু একটু

বালকবালিকাদিগের ফুস্‌ফুস ও শ্বাসনালীর রোগসমূহ আরোগ্যের নিমিত্ত বক্ষ: উষ্ণ রাখিবার প্রণালী
বামে: সিক্ত বস্ত্রাবরণ দক্ষিণে: শুষ্ক বস্ত্রাবরণ

পাকা মিষ্ট ফলের রস খাইতে দিবেন। এক বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক বালকবালিকাদিগকে দুধ ব্যতীত ডিম্ব এবং ফলের রস খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিবেন।

সর্দ্দিকাশি

অধিকাংশ শিশুই সর্দ্দিকাশিতে কষ্ট পায়। অনেক কারণে কাশি হইতে পারে, কাজেই একই ঔষধে সকল প্রকার কাশি আরোগ্য হইবে, এরূপ ধারণা রাখা নির্ব্বোধের কাজ। খবরের কাগজে কাশি আরোগ্য করিবার যে সকল ঔষধের বিজ্ঞাপন দেখা যায়, ঐ সকল ঔষধে আফিং ও মরফিয়া আছে। সে গুলি বড়ই সাংঘাতিক এবং কখনও শিশুদিগকে দেওয়া উচিত নহে। কাশির

প্রকৃত চিকিৎসা উহার কারণসমূহ দূর করা। এ্যাডিনয়েডস্ (Adenoids) হইলে, গলার বীচি বড় হইলে অথবা তালুগ্রন্থি লম্বা ও নরম হইলে, কাশি হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় কোন চিকিৎসকের নিকট যাইয়া উহার চিকিৎসা করাইতে হইবে। সর্দির জন্য ও যক্ষ্মার জন্য কাশি হইতে পারে। সকল অবস্থাতেই রোগের কারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। যদি প্রকৃত কারণ ঠিক বুঝা না যায়, তবে ২০শ অধ্যায়ে বর্ণিত বাষ্প গ্রহণের প্রণালীর দ্বারা সুফল লাভ হইতে পারে।

সর্দি ও তাহার প্রতীকার

উষ্ণ জল দ্বারা অন্ত্রধৌত করিয়া (২০শ অধ্যায়ে "বস্তিক্রিয়া" দ্রষ্টব্য) প্রথমে পেট পরিষ্কার করিয়া ফেলিবেন। এতদ্ব্যতীত ছোট এক চামচে ক্যাষ্টর অয়েল খাইতে দিবেন। ক্যাষ্টর অয়েলের সহিত কিছু কমলালেবু বা অন্য কোন ফলের রস মিশাইয়া দিলে, শিশু উহা সহজে খাইবে। শিশুকে উষ্ণ কিছু খাইতে দিবেন; কোন ফলের রস, বিশেষ লেবুর রস গরম জলে দিয়া শিশুকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিবেন। শিশুকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখিবেন, যে ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করে, এইরূপ কোন ঘরে তাহাকে রাখিবেন। কয়েক দিন পর্য্যন্ত তাহাকে অল্প পরিমাণ আহার করাইবেন। শিশু ঘামিতে থাকিলে জলে কাপড় ভিজাইয়া তাহার গা মুছাইয়া দিয়া পরে একেবারে শুষ্ক করিয়া গা মুছাইয়া দিবেন। কাশি না থামিলে প্রতিদিন দুইবার পনের মিনিট করিয়া বুকে সেঁক দিবার প্রয়োজন হইবে (২০শ অধ্যায়ে)। কাশি আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত উহার চিকিৎসা ছাড়িয়া দিবেন না। কারণ, উহার প্রতীকার করিতে না পারিলে, অবশেষে ফুস্ফুসের কোন কঠিন ব্যাধিতে পরিণত হইতে পারে।

২৮শ অধ্যায়

কণ্ঠঝিল্লীর প্রদাহ বা ডিফ্‌থিরিয়া—হাম—গণ্ডস্ফীতি রোগ

ডিফ্‌থিরিয়া (Diphtheria)

ডিফ্‌থিরিয়া বালকবালিকাগণের অতিশয় সাংঘাতিক ব্যাধি। ডিফ্‌থিরিয়া জীবাণু দ্বারা উক্তরোগের সৃষ্টি হয়। নাকের ও গলার মধ্যে ঐ সকল জীবাণু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত স্থানের সৃষ্টি করে, এবং এরূপ এক বিষ উৎপন্ন করে, যদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডের বিষম অনিষ্ট হয়।

ডিফ্‌থিরিয়া সংক্রামক ব্যাধি। যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে, বা পূর্ব্বে, আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং এখনও রোগ জীবাণু কণ্ঠ দেশে বহন করিতেছে, তাহাদের কাশি এবং হাঁচিদ্বারা রোগ জীবাণু ছড়াইয়া পড়ে; এইরূপে অপর শিশু বা বালকবালিকাগণ উক্তরোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়।

অপর কোন ব্যক্তির ব্যবহৃত চাম্‌চে বা বাটি সিদ্ধজলে ধৌত না করিয়া ব্যবহার করিলে শিশুদিগের ডিফ্‌থিরিয়া হইতে পারে। তারপর অপর কোন শিশুর ব্যবহৃত খেলনা—বিশেষতঃ বাঁশি প্রভৃতি যে সকল খেলনা, উহারা মুখে দেয়,—তাহা ব্যবহার করিলেও এই ব্যাধি সহজে ছড়াইয়া পড়ে। মুখের মধ্যে আঙ্গুল অথবা পেন্সিল, টাকা পয়সা, দড়ি প্রভৃতি যা, তা, পূরিয়া দেওয়ার কু-অভ্যাসে শিশুদিগের ডিফ্‌থিরিয়া ব্যতীত অন্যান্য ব্যাধিও হইয়া থাকে। বালক-বালিকাদিগের যাহাতে এই কু-অভ্যাস না হয়, একেবারে শিশুকাল হইতেই অভিভাবকদিগের সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

ডিফ্‌থিরিয়া রোগাক্রান্ত শিশু কাশিলে বা হাঁচিলে অসংখ্য রোগ জীবাণু সেই স্থানের বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে। এই জন্য অপর কোন শিশু ঐ ঘরে প্রবেশ করিলে, উক্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। প্রতি-বেশীদিগের মধ্যে কাহারও এই রোগ থাকিলে গৃহের বালকবালিকাদিগের সেই সকল গৃহে যাইতে দিবেন না। ডিফ্‌থিরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব কালে শিশুদিগকে ঘর হইতে বাহিরে রাস্তায় আসিতে, বা অন্যান্য বালকবালিকাদিগের সহিত খেলা করিতে না দেওয়া ভাল।

রোগের লক্ষণ

ডিফ্‌থিরিয়া রোগের প্রধান লক্ষণ গলায় বেদনা। শরীরে এই জীবাণু প্রবেশ করিবার পরে, দুই হইতে সাতদিনের মধ্যে এই বেদনা অনুভূত হয়। নিকটে কোথাও ডিফ্‌থিরিয়া রোগী থাকিলে, শিশুগণ যদি কখনও গলায় কোন প্রকার বেদনা বা যন্ত্রণার কথাও বলে, তবে তৎপ্রতি অবিলম্বে দৃষ্টি প্রদান করিবেন। এক টুকরা পাতলা ও পরিষ্কার বাঁশের বা কাঠের টুকরা দ্বারা জিহ্বা চাপিয়া ধরিয়া গলার মধ্যভাগ দেখিতে হয়।

প্রথমে গলার মধ্যভাগ গাঢ় লাল দেখা যাইতে পারে, কিন্তু তৃতীয় দিনে তালুপার্শ্বগ্রন্থির (টন্‌সিলের) উপরে ও চতুর্দ্দিকে ধূসরবর্ণ পর্দ্দা পড়িতে থাকিবে (পার্শ্ববর্ত্তী চিত্র দ্রষ্টব্য)। এইরূপ অবস্থায় শিশুর কোন বস্তু গিলিতে কষ্ট হয়, এবং একটু জ্বর দেখা দেয়।

প্রতীকার

ডিফ্‌থিরিয়ার লক্ষণ দেখিলেই শিশুর চিকিৎসার জন্য সত্বর অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাকাইবেন। নিজে ভাল করিতে পারিবেন মনে করিয়া কখনও সময় নষ্ট করিবেন না। একটী মাত্র ঔষধ দ্বারা উহা আরোগ্য হইতে পারে; উহার নাম ডিফ্‌থিরিয়া এ্যান্‌টি-টক্‌সিন্। ঘোড়ার রক্ত হইতে এই ঔষধটী পাওয়া যায়, এবং উহা দ্বারা ডিফ্‌থিরিয়া রোগের বিষাক্ত জীবাণু বিনষ্ট হইয়া থাকে। যত সত্বর উহা ব্যবহৃত হইবে ততই ভাল। রোগের প্রথম দিনে ব্যবহৃত হইলে শতকরা ৯৯ জন রোগ মুক্ত হইতে পারে। তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসের পূর্ব্বে ব্যবহৃত না হইলে শতকরা ৭৫ হইতে ৮৫ জনের অধিক আরোগ্য লাভ করিতে পারে না। এই ঔষধটী মোটেই ব্যবহার করা না হইলে, উক্ত রোগাক্রান্ত শিশুগণের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকের অধিক সংখ্যক শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

উপরি-উক্ত ঔষধটী তরল পদার্থ, তাই চর্ম্ম ভেদ করিয়া হাইপোডার্ম্মিক্ নিডল্ (Hipodermic Needle) দ্বারা উহা দেহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। এই প্রকার ইন্‌জেক্‌সন্ বা দেহে ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, কেবল অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারাই সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। কোন স্থলে উপযুক্ত চিকিৎসকের একান্তই অভাব হইলে, শিশুটীর মৃত্যু অপেক্ষা বরং মাতাপিতার ঐরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা ভাল। হাইপোডর্ম্মিক্ নিডল্ অর্থাৎ চর্ম্মের অভ্যন্তরে ঔষধ প্রবিষ্ট করিবার সূচি এবং উপরিলিখিত এ্যান্‌টি-টক্‌সিন্ সাধারণ ঔষধের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত উপায় উহা ব্যবহার করিতে হইবে। কয়েক মিনিট ধরিয়া সূচিটী জলে ফুটাইয়া লইতে হইবে। তারপর এ্যান্‌টী-টক্‌সিনের ক্ষুদ্র শিশিটী অল্পক্ষণ সুরাসারের (Alcoho) মধ্যে ডুবাইয়া

রাখিয়া উহা তুলিয়া লইবেন, এবং শিশির অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সূচিদ্বারা তন্মধ্যস্থ ঔষধটী টানিয়া লইবেন। কাঁধের কয়েক ইঞ্চি নীচে বাহুর উপরিভাগে কোনস্থানে বেশ করিয়া সাবান ও গরম জল দ্বারা ধুইয়া ফেলিবেন। চামড়া শুকাইয়া গেলে উক্তস্থানে একটু টিংচার আইওডিন্ মাখিয়া দিবেন। পরে ঐ স্থানের চামড়া দুই আঙ্গুলের মধ্যে চাপিয়া কোঁচকাইয়া টানিয়া ধরিবেন। পরে স্চটী এক ইঞ্চি পরিমাণ সাবধানে এইরূপভাবে বসাইয়া দিবেন, যেন উহা চামড়া এবং তন্নিম্নস্থ মাংস এই উভয়ের মধ্যভাগে প্রবিষ্ট হয়। ৩০০০ হইতে ৫০০০ গুরুত্ব (unit) বিশিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিবেন। বার ঘণ্টার মধ্যে কোন বিশেষ সুফল দেখা না গেলে, পুনরায় ৩০০০ হইতে ৫০০০ গুরুত্ব (unit) বিশিষ্ট আর এক মাত্রা ঔষধ প্রবিষ্ট করাইয়া দিবেন। রোগ কঠিন হইলে তিন মাত্রাও প্রয়োজন হইতে পারে।

ডিফ্থিরিয়া হইয়াছে জানা মাত্র রোগাক্রান্ত শিশুকে পৃথক ঘরে রাখিয়া দিবেন। অপর কোন শিশুর ঐ ঘরে প্রবেশ একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন। শিশুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত, দুই তিন জন ব্যতীত অপর কেহ তথায় যাইবেন না। যিনি শিশুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত তিনি আপন পরিধেয় বস্ত্রাদির উপরে অপর কোন ঢিলা পোষাক পরিবেন; এবং উক্ত গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিবার সময়, উহা তথায় পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন রোগীর গৃহ ত্যাগ করিয়া অপর পরিজনের মধ্যে যাইবার ও অন্যান্য বস্তু স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে ভালরূপে হাত মুখ ধুইয়া ফেলিবেন। ঐ ঘরের কোন খেলনা বা বস্ত্রাদি অন্য ঘরে লইবেন না বা কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিবেন না।

পীড়িত শিশুর খাইবার বাসনাদি তাহার ঘরেই রাখিয়া দিবেন, এবং প্রত্যেকবার ব্যবহারের পরে ফুটন্ত জলে ধুইয়া ফেলিবেন। রোগীকে তরল খাদ্য খাইতে দিবেন।

রুগ্ন শিশু একখণ্ড কাগজে বা নেকড়ায়, সর্দ্দি, কাশি, বা থুথু ফেলিবে, এবং পরে উহা পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

শিশুকে বিছানার উপরে শান্তভাবে শোয়াইয়া রাখিতে হইবে। আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও তাহাকে চলাফিরা করিতে দিবেন না। কারণ, এই রোগের বিষ হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি করে, এই জন্য চলাফিরা করিলে সহসা মৃত্যুও ঘটিতে পারে।

৯ নং বা ১০ নং ব্যবস্থা পত্রের (৫০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ঔষধ প্রতি ঘণ্টায় গলায় লাগাইতে হইবে। ১০ নং ব্যবস্থা পত্রের ঔষধটী একটী ক্ষুদ্র রবারের পিচ্কারী দ্বারা নাসিকার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে।

শিশুর গলা ও মুখের অভ্যন্তর ধৌত করিবার সময় সেবক ও সেবিকাগণ কয়েক ভাঁজ পুরু পরিষ্কার কাপড় দ্বারা নিজের মুখ ও নাসিকা ঢাকিয়া লইবেন।

গলার সম্মুখ ভাগে ও চারিদিকে সেঁক প্রদান করিলে, বেদনার উপশম হইতে পারে। শিশুকে প্রতিদিন একবার গরম জলের ডুস্ দেওয়া কর্তব্য। শিশু যত জল ও ফলের রস খাইতে পারে, তাহাই তাহাকে খাইতে দিবেন।

পরিবারস্থ কোন শিশুর ডিফ্থিরিয়া হইলে, পরিবার ভুক্ত অন্য সমুদয় ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ "এ্যান্টি-টক্সিন্" ইন্জেকসন্ গ্রহণ করিবেন। কারণ, উক্ত ঔষধটী ডিফ্থিরিয়া রোগ নিবারণ ও প্রতীকার উভয়ই করিতে সমর্থ। শিশুদিগের ৫০০ হইতে ১০০০ এবং বয়স্কদিগের ১০০০ হইতে ২০০০ গুরুত্ব (unit) বিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। মাসাধিক কাল পরেও যদি ঐ অঞ্চলে উহার প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে পুনরায় উল্লিখিত প্রণালীতে উক্ত ইন্জেকসন্ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ডিফ্থিরিয়া রোগাক্রান্ত শিশুর রোগ সারিয়া গেলেই তাহার বিছানা, কাপড় চোপড় ও বাসগৃহ ঔষধ দ্বারা বিশোধিত করিতে হইবে, যেন অপর কেহ উক্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত না হয় (৪৭শ অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট প্রণালী দ্রষ্টব্য)।

অনেক সময় হয়তো ডিফ্থিরিয়ার প্রাদুর্ভাব কালে এ্যান্টি-টক্সিন্ দুষ্প্রাপ্য হইতে পারে। সেইরূপ অবস্থায়, রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য, এক পাইট জলের সহিত ছোট চামচের চারি চামচ লবণ মিশাইয়া দৈনিক তিন বার কুলি করিবেন। একটা কাঠি বা পেন্সিলের মাথায় তুলা জড়াইয়া উহা লবণ জলে ভিজাইয়া লইয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগের গলার মধ্যভাগ মাজিয়া দিবেন।

হাম (Measles)

হাম অতিশয় স্পর্শাক্রমক। অনেক সময় এই রোগকে তুচ্ছ করা হয়। কিন্তু কোন শিশুর হাম হইবামাত্র তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন উহা হইতে অপর কোন কঠিন ব্যাধি সৃষ্টি হইতে না পারে।

এই রোগ অতি দ্রুত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। হাম দ্বারা আক্রান্ত কোন শিশুর ঘরে অপর কোন শিশু প্রবেশ করিলে, বা তাহার নিকটে আসিলে, দশ বার দিনের মধ্যে সুস্থ শিশুও উক্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। আক্রমণের প্রারম্ভে সর্দ্দি হয়, নাক দিয়া জল পড়ে, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, এবং জ্বর আরম্ভ হইয়া থাকে। পরে তিন চারি দিন বাদে হাম বাহির হয়। প্রথম প্রথম মুখের উপরে মশার কামড়ের মত লাল দাগ উঠে তারপর উহারা দুই

তিন দিনের মধ্যে সমস্ত দেহে ছড়াইয়া পড়ে। মুখের উপরের দাগগুলি আকারে বড় হইতে থাকে এবং শেষে ফুস্কুড়িগুলি একত্র মিশিয়া দাগড়া দাগড়া হইয়া থাকে।

হামের পরে কাণের ব্যাধি ও ফুস্ফুসের কোন সাংঘাতিক রোগের আশঙ্কা করা যাইতে পারে।

প্রতীকার

হাম আরোগ্য করিবার কোন ঔষধ নাই। হাম প্রকাশ পাইবার পর শিশুর ভালরূপ শুশ্রূষা করিলে আপনি আপনি উহা সারিয়া যাইবে। শিশুকে পরিষ্কৃত কক্ষে পরিষ্কার বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতে হইবে। উহাকে সর্ব্বদা গরম রাখিতে হইবে, কেননা হাম রোগাক্রান্ত শিশুর ঠাণ্ডা লাগা বড় ভয়ের কথা, কারণ, উহাতে ফুস্ফুসের কঠিন ব্যাধি জন্মিতে পারে। অপর কোন শিশুকে ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে দিবেন না, কারণ, তাহা হইলে সেও আক্রান্ত হইবে।

অনেক সময়ে হাম বাহির হইবার পূর্ব্বে প্রকৃত রোগ নির্ণয় করা যায় না। এইরূপ অবস্থায় শিশুকে ছোট দুই চামচে ক্যাষ্টর অয়েল দিয়া ১০৮° ডিগ্রি ফারেন্‌হাইট্ উষ্ণজল দ্বারা অন্ত্রধৌত করিয়া দিবেন। ৫০শ অধ্যায়ের ৯নং ব্যবস্থা পত্রের ঔষধ প্রতিদিন কয়েকবার মুখে মাখাইয়া দিবেন। এক পাইট জলের সহিত ছোট এক চামচে লবণ মিশাইয়া দিবসে কয়েকবার নাকের মধ্যে ঐ জলের ঝাপ্‌টা দিয়া নাক পরিষ্কার রাখিবেন। এইরূপ করিতে "এ্যাটোমাইজার" (জল বা অন্য কোন তরল পদার্থ সূক্ষ্মকণিকারে পরিণত করিবার জন্য যন্ত্র বিশেষ) সংগ্রহ করিতে না পারিলে, ছোট একটী পিচ্‌কারী দ্বারা নাসিকা মধ্যে উক্ত লবণ জল ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া মুখ ও নাসিকা পরিষ্কৃত রাখিলে সাংঘাতিক ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। উহা একটী ফুস্ফুসের ভীষণ রোগ। ইহাতে বধিরতার হাত হইতেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। বেদনা বোধ হইলে, এবং কাশি দেখা দিলে, বুকে দৈনিক দুইবার গরম সেঁক দিতে হইবে।

হাম হইলে রোগীর চক্ষুর প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। চক্ষু ভাল রাখিতে ঘর অন্ধকার করিবেন। ১নং ব্যবস্থা পত্র অনুযায়ী বোরিক এ্যাসিড্ সলিউসন্ দ্বারা দৈনিক কয়েকবার চক্ষু ধুইয়া দিবেন। চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে এবং ফুলিয়া উঠিলে ৪৪শ অধ্যায়ে বর্ণিত উপদেশ মত চিকিৎসা করিবেন।
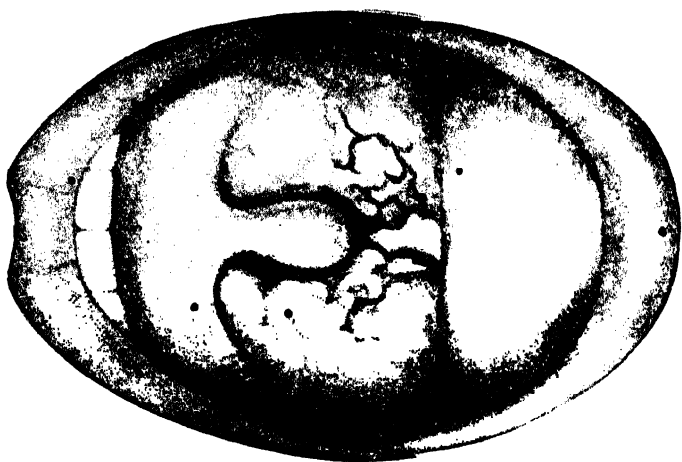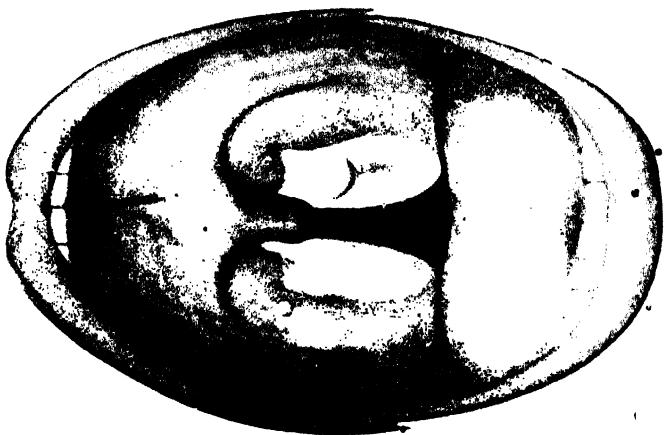
সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে হাম অতিশয় ভীষণ ব্যাধি এবং উহা দ্বারা বহুসংখ্যক শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। পাড়ায় হাম হইয়াছে জানিলে যেখানে গেলে শিশুদিগের হাম হইতে পারে, সেই স্থানে যাওয়া বন্ধ রাখিবেন। পরিবারস্থ কোন শিশুর হাম হইলে, অন্যান্য শিশুকে কোন মতে তাহাদের সহিত মেলা মিশা করিতে বা একই ঘরে থাকিতে দিবেন না। রোগীকে এক ভিন্ন গৃহে রাখিবেন।

কর্ণমূল স্ফীতি (Mumps)

কর্ণমূল স্ফীতি রোগের প্রথমে কাণের নীচে বেদনা হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু জ্বরও হইতে পারে। কিছু চিবাইবার বা গিলিবার সময় বেদনা বৃদ্ধি পায়। এক কাণ বা উভয় কাণের সম্মুখভাগে ও নীচের দিকে ফুলিয়া উঠে। ফুলা হয়ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া আকারে বড় হইতে পারে। অল্পদিনের মধ্যে ফুলা কমিতে আরম্ভ করে, এবং সপ্তাহ কাল মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

শিশুর যাহাতে কোনরূপ ঠাণ্ডা না লাগে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ১০নং ব্যবস্থা পত্রের ঔষধ দ্বারা বারংবার মুখ ধৌত করুন (৫০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ফুলা যায়গায় সেঁক প্রদান করিলে, বেদনার উপশম হইবে। রোগীকে অন্য সকলের নিকট হইতে দূরে রাখিবেন।

২৯শ অধ্যায়

অজীর্ণ রোগ—অগ্নিমান্দ্য—কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ

উল্লিখিত রোগসমূহে, অন্ততঃ উহাদের যে কোন একটীতে ভুগেন নাই, এরূপ লোক খুব কমই আছে। টাইফয়েড, ম্যালেরিয়ার মত এগুলি সাংঘাতিক না হইলেও ইহাদের যন্ত্রণা খুবই বেশী এবং বহু সাংঘাতিক ব্যাধি এই সকল ব্যাধি হইতে উৎপন্ন হয়।

অজীর্ণরোগের কারণ ও লক্ষণ

পাকস্থলীতে ভারবোধ বা বেদনা, বুকজ্বালা, জিহ্বায় ময়লা জমা, অম্লোদ্গার, ঢেকুর উঠা প্রভৃতি অজীর্ণ রোগের সাধারণ লক্ষণ। এতদ্ব্যতীত বমন ও মাথাধরাও থাকিতে পারে। কখনও কখনও দুই স্কন্ধের মধ্যভাগে ও পিঠে বেদনা হয়। সাধারণতঃ কিছু খাইবার পরে পেটবেদনা অল্পকালের নিমিত্ত ক্ষান্ত হইয়া পুনরায় অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। যকৃতের কার্য্য ভালরূপে হয় না বলিয়া, মলের রং ফিকে হইয়া থাকে।

অজীর্ণ রোগের কারণ এত অসংখ্য যে সমুদয় এই গ্রন্থে বিবৃত করা সম্ভব নহে, তন্মধ্যে দ্রুত আহার করা একটী সাধারণ কারণ। দ্রুত আহার করিলে খাদ্য বস্তু ভালরূপে চর্ব্বিত হয় না, কেবল বড় বড় পিণ্ডের আকারে উদর-গহ্বরে প্রেরিত হইয়া থাকে। ঐ বৃহৎ পিণ্ডগুলি পরিপাক করিতে পাকস্থলী প্রচুর পরিমাণ অম্ল পাচক রসের সৃষ্টি করে, ফলে বুক জ্বালা হয়, এবং অম্ল ঢেকুর উঠে। অনেকস্থলে খাদ্যদ্রব্যগুলি যথোচিত ভাবে পাক করা হয় না, ও এই প্রকার অৰ্দ্ধপাক খাদ্য আহার করিয়া অজীর্ণ রোগ হয়। অতি মাত্রায় আহার করা আর একটী সাধারণ কারণ। সুখাদ্যও অধিক পরিমাণে আহার করিলে অজীর্ণ হইবে; গরীব লোকদিগের অতিরিক্ত মোটা আঁশ বা দানা বিশিষ্ট খাদ্য খাইবার ফলে এই রোগ জন্মে। অনুপযুক্ত খাদ্য, যেমন—চিনি বা লবণে রক্ষিত খাদ্য, অথবা আদা, লঙ্কা, মসলা বা অপর কোন উগ্র বস্তু মিশ্রিত খাদ্য খাইলে, পাকস্থলীর অনিষ্ট হয়, ও যথা নিয়মে ইহার কার্য্য সাধিত হয় না।

যাহারা মদ বা তজ্জাতীয় অন্য কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে, তাহারা সকলেই অজীর্ণ রোগগ্রস্ত; তাহাদের ক্ষুধা বোধ খুব কমই হয়, বিশেষতঃ

সকালে তাহাদের আদৌ ক্ষুধা হয় না। তাহারা অধিকাংশ সময়েই পেটে বেদনা বোধ করে; এবং খাওয়ার পরে বমন করিয়া থাকে। মদের ন্যায় তামাক ব্যবহারেও পাকস্থলীর অনিষ্ট হয় এবং উহাও অজীর্ণতার একটা কারণ।

অনেকস্থলে বিশেষতঃ আফিসের কর্ম্মচারী, স্কুল ও কলেজের ছাত্র, ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের শারীরিক ব্যায়ামের অভাবে অজীর্ণতা হইয়া থাকে। মানবের স্বষ্টিকর্ত্তা বলিয়া দিয়াছেন, "তুমি ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিবে," অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রম করিয়া তোমার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। খাদ্য ও ব্যায়ামের উপরে দেহের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। যে ব্যায়াম করে না কেবল আহারই করে তাহার পরিপাক শক্তি নিশ্চয়ই খারাপ হইয়া যাইবে।

উপরি-উক্ত কারণগুলি ব্যতীত আরও একটা বিষয়ের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য; অনিয়মিত আহার, যেমন—খাবার সময় ব্যতীত আহার করা, অথবা অধিক রাত্রে প্রচুর ভোজন করা, এই দুই কারণেও অজীর্ণ রোগ জন্মে। কোন্ কোন্ খাদ্য-উপকারী এবং কোন্ খাদ্য অনিষ্টকর তৎসম্বন্ধে ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রতীকার

অজীর্ণ রোগ আরোগ্য করিতে হইলে, প্রথমে উহার কারণ দূর করিতে হইবে। বিজ্ঞাপন দেখিয়া, অসংখ্য ঔষধের মধ্যে একটা বাছিয়া লইয়া ব্যবহার করিলে, হয়তো যন্ত্রণার সাময়িক উপশম হইতে পারে, কিন্তু রোগের কারণ কখনও দূর হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। এই জন্য ঐ সমুদয় ঔষধ একেবারে ব্যবহার না করাই ভাল। উপরিলিখিত কারণগুলির কোন্টার জন্য অজীর্ণ রোগ হইয়াছে, প্রথমে তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তামাক বা অন্য কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিবার কু-অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করা আবশ্যক। দুর্ব্বল পাকস্থলী কখনও সবল পাকস্থলীর ন্যায় কার্য্যকারী হইতে পারে না, এই জন্য খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে। সহজে যাহা পরিপাক করা যায়, সেইরূপ খাদ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সহজে পরিপাক হয়, এরূপ খাদ্যের একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল,—

(১) ঝলসান গমের রুটী। (২) ভাল সিদ্ধ চাউলের গরম গরম ভাত। (৩) আধ সিদ্ধ ডিম,—এত অল্প সময়ে সিদ্ধ করিতে হইবে যে ভিতরের দ্রব্য শক্ত হইয়া না যায়। (৪) রান্না করা বা কাঁচা পিচ্ফল বা পেয়ারা। মিঠাই মণ্ডা একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ভাজা কোন খাদ্যই খাওয়া উচিত নহে।

অজীর্ণতা খুব প্রবল হইলে একবার জোলাপ লইবেন, এবং সম্পূর্ণ একটী দিন উপবাস করিবেন। যে পীড়ায় অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই, তাহার

পক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা কিছুই না খাইয়া থাকা ক্ষতিকারক নহে। অজীর্ণ রোগীদের পক্ষে উপবাস অতিশয় উপকারী, কারণ তাহা হইলে পরিপাক যন্ত্রাদির বিশ্রাম করিবার অবকাশ ঘটে।

বুক জ্বালা করিলে ও অম্ল ঢেকুর উঠিলে, শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য অল্প পরিমাণে খাইয়া উহার পরিবর্ত্তে তৈল জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করিতে হইবে। বুক জ্বালা ও অম্ল ঢেকুর বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক হইলে ৫০শ অধ্যায়ের ১২নং ব্যবস্থা পত্রের ঔষধের ১০ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। সকালে শয্যাত্যাগের পর, ও রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে কিছু পরিমাণ অতিশয় উষ্ণজল পান করিলে পাকস্থলী সুস্থ হইতে থাকিবে। এতদ্ব্যতীত দৈনিক দুই তিন বার বিশ মিনিট করিয়া পাকস্থলীর উপরে সেঁক প্রদান করিলে বেদনার উপশম হইবে।

সকল প্রকার অজীর্ণ রোগেই ধীরে ধীরে আহার্য্য দ্রব্য চর্ব্বণ ও ভক্ষণ করায় যে কত উপকার তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পরিপাক যন্ত্রাদির কার্য্য উত্তমরূপে চালিত করিবার জন্য প্রতিদিন শারীরিক ব্যায়াম আবশ্যক। নিয়মিত স্নান দ্বারা শরীরের ত্বক্ পরিষ্কৃত রাখিতে হইবে।

অজীর্ণ রোগের জন্য যে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, নিম্নে তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া গেল। উপরে যে চিকিৎসা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে সর্ব্ব প্রকার অজীর্ণ রোগ দূর হয় না। কখন কখন রোগীকে তাহার কি খাদ্য সহ্য হয়, তাহা তাহার বুঝিয়া দেখা উচিত এবং ঐরূপ কোন বলকারক খাদ্য পাইলে রোগীর পক্ষে কিছুদিন উহা চালান উচিত।

কোষ্ঠকাঠিন্য

দৈনিক দুই তিন বার, অন্ততঃ একবার মল ত্যাগ করা আবশ্যক। দুই তিন দিন অন্তর একবার মল ত্যাগ করিলে কোষ্ঠকাঠিন্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যাহাদের প্রতিদিন জোলাপ লইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করিতে হয়, তাহাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে বুঝিতে হইবে। জিহ্বার উপরে ময়লা পড়া, মুখে দুর্গন্ধ হওয়া, মাঝে মাঝে মাথা ধরা, বিশেষতঃ মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ও উপরের দিকে বেদনা, তলপেটে ভার বোধ প্রভৃতি কোষ্ঠকাঠিন্যের লক্ষণ।

রীতিমত চলাফিরা না করিয়া বসিয়া থাকার জন্য এবং চা, কাফি, তামাক এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্য ব্যবহারের ফলে, কোষ্ঠকাঠিন্য হইয়া থাকে। কখন কখন তলপেটের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য এই রোগ হইতে পারে। ঘন ঘন জোলাপ লইলে খুব কঠিন কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। মলত্যাগের বেগ হইলে, ইচ্ছা পূর্ব্বক রোধ করার কু-অভ্যাস বশতঃ অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই কু-অভ্যাস অধিক। ইহার ফলে অবশেষে বৃহদন্ত্রের শেষভাগে দূষিত মল জমা হইয়া মল ত্যাগের বেগে বাধা জন্মাইয়া থাকে, এবং ইহার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ দুরূহ হইয়া পড়ে।

প্রতীকার

কতিপয় কু-অভ্যাস দূর করিতে পারিলেই সাধারণতঃ এই রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বিজ্ঞাপন দ্বারা বহুল প্রচারিত ঔষধ অপেক্ষা নিয়মিত ও পরিমিত খাদ্য গ্রহণে ও দৈনিক ব্যায়ামে উহা সহজে আরোগ্য হইতে পারে। প্রতিদিন ভ্রমণ করিয়া, বাগানে কৃষি কার্য্য করিয়া, অথবা অপর কোনওরূপে অঙ্গচালনা করিয়া, দৈনিক ব্যায়াম করা নিতান্ত আবশ্যক। আর এক প্রকার ব্যায়াম এই বিষয়ে বিশেষ ফলপ্রদ; চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া উভয় পা লম্বাভাবে (সোজা উপর দিকে) উঠাইয়া দিন। একখানা কম্বল বা ঐরূপ কিছু ভাজ করিয়া পাছার নীচে দিতে হইবে। প্রভাতে বিশ বা ত্রিশবার এইরূপ করিতে হইবে। পা দুইখানি উপরে উঠাইবার সময়ে গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিবেন, আবার পা নামাইয়া ঐরূপে শ্বাস গ্রহণ করুন; তারপর মুহূর্ত্তকাল বিরত হউন। পদদ্বয় খুব তাড়াতাড়ি উঠাইবেন না। হাঁটুর নিকটে পা ভাঙ্গিবেন না। ধীরে ধীরে নামাইবেন, সহসা মাটিতে ফেলিবেন না। এই প্রকার ব্যায়াম দ্বারা তলপেটের পেশীসমূহ সবল হয়, এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রতীকারে সাহায্য করিয়া থাকে।

শয্যাত্যাগ করিবার পরে এক পেয়ালা ঠাণ্ডা বা গরম জল পান অনেক স্থলে বিশেষ উপকারী। অনেক লোক প্রতিদিন উপযুক্ত পরিমাণ জল বা অপর কোন তরল পদার্থ পান করে না বলিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ভুগিয়া থাকে। এই কারণে যাহারা ঐ রোগে ভুগিতেছে, তাহাদের প্রতিদিন আহারের সঙ্গে তরল খাদ্যাদি ব্যতীত অন্য সময়েও পাচ ছয় গেল্লাস জল পান করা কর্ত্তব্য। জলের পরিবর্ত্তে মাঝে মাঝে ফলের রস খাওয়া যাইতে পারে।

কোষ্ঠকাঠিন্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মল কোন কোন সময়ে একটু সাদা দেখায়। ইহার দ্বারা যকৃতের কার্য্য ভালরূপেই চলিতেছে না, তাহাই প্রমাণিত হয়। যকৃতে শক্তি সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত উহার উপরে দিনে দুইবার পনের কি বিশ মিনিট ধরিয়া সেঁক প্রদান করিবেন, এবং প্রত্যহ প্রাতে সিকি গ্রেণ "ইপিকাক্" খাইবেন।

এই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিতে জোলাপ ব্যবহার না করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কারণ, একবার উহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে প্রত্যহই ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। এইরূপে এক বড়ই কু-অভ্যাসের সৃষ্টি হয়।

জোলাপ ব্যবহারের পরিবর্তে প্রত্যহ আধ আউন্স হইতে এক আউন্স "আগার-আগার" (agar-agar) খাইবেন, ইহা কিছু গরম করিয়া খাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ফুটাইয়া খাইবেন না।

এনিমা দিয়া যে কোন সময়ে উদরাভ্যন্তর ধৌত করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রতিদিন তদ্রূপ করা সঙ্গত নহে। প্রথম দুই তিন দিন, তিন পোয়া বা তদধিক পরিমাণ গরমজল দ্বারা, তৃতীয় দিনে খুব অল্প পরিমাণ ঠাণ্ডা জল, এবং তৎপরে কয়েক দিন আরও স্বল্প পরিমাণ ঠাণ্ডা জল দ্বারা অন্তর্ধৌত করাইয়া দিবেন। এই প্রকারে দুই এক সপ্তাহের মধ্যে কোন প্রকার জল প্রবিষ্ট না করাইয়াই স্বাভাবিক ভাবে মলত্যাগ হইতে পারে। ইহা একটী সুন্দর উপায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য আরোগ্য করিবার আর একটী উত্তম পন্থা আছে। রবারের একটী ক্ষুদ্র পিচ্‌কারী লইয়া, (নিম্নে চিত্র দেখুন) পূর্ণ দুই পিচ্‌কারী পরিষ্কার সিদ্ধ করা শীতল জল, তলপেটের নিম্নভাগে মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। জল প্রবেশ করাইয়া দিবার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মলত্যাগ করিতে যাইবেন। ঠাণ্ডা জল তলপেটে প্রবেশ করাইয়া দিবার ফলে অনায়াসে মলত্যাগের বেগ হইয়া থাকে। বস্তিক্রিয়া (Enema) অপেক্ষা ইহা সহজ এবং বিশেষ ফলপ্রদ।
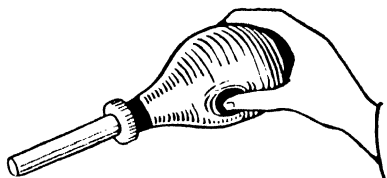
এই রোগের সকল প্রকার অবস্থাতেই রোগীর জানা প্রয়োজন যে প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে মলত্যাগ করিবার অভ্যাস করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রাতঃ-ভোজনের পরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। প্রতিদিন ঐ সময়ে বেগ না হইলেও মলত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে, শেষে ঐ সময়ে মলত্যাগ করা অভ্যাস হইয়া যাইবে ও আপনা আপনি মলত্যাগ হইবে।

কোন প্রকার সারক ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে, "ক্যাস্‌কারা স্যাগ্রাডার" সারাংশের (Extract of cascara sagrada) পনের ফোঁটার একমাত্রা অথবা উক্ত ঔষধের ৫ গ্রেণ পিলের দুইটী পিল প্রতিদিন প্রাতে গ্রহণ করা উচিত।

অর্শ (Piles)

মলদ্বারের মুখে বা কিছু ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ব্বুদ বা গুটীকা জন্মে, তাহাকেই অর্শ বলে। উক্ত স্থানের শিরাগুলি বৃদ্ধি হইয়া, ঐ প্রকার অর্ব্বুদের সৃষ্টি করে। অর্শের একটী কারণ কোষ্ঠকাঠিন্য। পায়খানায় কর্কশ কাগজ ব্যবহার

করিলে, অর্শ এবং গুহ্যদ্বারে অন্যান্য প্রকার ঘা হইতে পারে। এই জন্য নরম কাগজ ব্যবহার করা উচিত।

প্রতীকার

কোষ্ঠকাঠিন্য আরোগ্য করাই অর্শ চিকিৎসার একটী বিশেষ অঙ্গ। এই উদ্দেশ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী অংশে বর্ণিত উপায়গুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কঠিন ভাবে অর্শ রোগগ্রস্ত হইলে কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থাকা কর্ত্তব্য, কারণ, তদ্ব্যতীত আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নহে।

রোগ কঠিন না হইলে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বনে উপকার হইতে পারে। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে মলত্যাগ করিবার অভ্যাস করিবেন। প্রাতঃভোজনের পরই ভাল সময়। পূর্ব্বে যেরূপ পিচ্‌কারীর কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ একটা পিচ্‌কারী সংগ্রহ করিয়া, উহা দুইবার পরিষ্কার সিদ্ধ জলে পূর্ণ করিবেন, এবং ঐ জল পেটের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। তৎপরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মলত্যাগ করিতে যাইবেন। মলত্যাগ করিবার পরে পুনরায় আর এক পিচ্‌কারী পরিষ্কার সিদ্ধ করা শীতল জল ভিতরে প্রবেশ করাইয়া তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দিবেন। এইরূপে তলপেটের নিম্নাংশে যত দূষিত মল সঞ্চিত থাকে, তাহা দূরীভূত হয় এবং এই প্রণালীটী চিকিৎসার একটী প্রধান অঙ্গ। কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবার পরে একখানি পরিষ্কার নেকড়া জলে ভিজাইয়া মলদ্বার মুছিয়া ফেলিবেন। ঐ স্থান শুষ্ক হইয়া গেলে পর নিম্নলিখিত ঔষধ গুলি দ্বারা একটী প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া মাখাইয়া দিবেন। "লেড্ এসিটেট্" দুই অংশ, "ট্যানিক্ এ্যাসিড" এক অংশ, "বেলেডোনা অয়েণ্টমেণ্ট" পনের অংশ। উক্ত প্রলেপের সামান্য অংশ লইয়া দিবসে দুই তিনবার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মলদ্বারের উপরে এবং অভ্যন্তরে এই প্রলেপ ভালরূপে মাখাইয়া দিতে হইবে।

৩০শ অধ্যায়

উদরাময় ও আমাশয়

উদরাময়

উদরাময় বা "পেটে অসুখ" একটী পৃথক রোগ নহে; ইহা বহু রোগের উপসর্গ। কলেরার প্রকোপকালে উদরাময় হয়ত কলেরার সূচনা হইতে পারে; তাই ৩২শ অধ্যায়ে বর্ণিত প্রণালী অনুসারে উহার চিকিৎসা করিতে হইবে। কয়েক দিন ধরিয়া ভেদ হইতে থাকিলে এবং মলের রং ঈষৎ লাল ও আম বা শ্লেষ্মাযুক্ত হইলে, নিম্নে প্রদত্ত আমাশয়ে চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে।

অধিকাংশ স্থলে অনুপযুক্ত খাদ্য ও পাণীয়ের নিমিত্ত সাধারণ উদরাময় হইয়া থাকে। যাহা পরিপাক করা কঠিন, অথবা যাহা ভালরূপে পাক করা হয় নাই, বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এরূপ খাদ্য এবং অপক্ক ফল, শুট্‌কী মাছ ও কাঁকড়া প্রভৃতি অখাদ্য ভক্ষণ উদরাময়ের কারণ হইতে পারে। মাছি দ্বারা উদরাময় বিশেষরূপে বিস্তৃত হইয়া থাকে। কোন খাদ্যবস্তু অধিক পরিমাণে খাইলে, অথবা খারাপ জল পান করিলে, কিংবা পেটে ক্রিমি হইলে, বা তলপেটে ঠাণ্ডা লাগিলে, উদরাময় হইয়া থাকে।

প্রতীকার

পুনঃ পুনঃ ভেদ হইলে পর ইহাই বুঝিতে হইবে যে, পেটে সঞ্চিত কোন দূষিত পদার্থ দূর করিবার নিমিত্ত দেহ চেষ্টা করিতেছে; সুতরাং এ বিষয়ে সকল প্রকার সাহায্য করা উচিত, এবং এই উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণ গরমজল পান, প্রতিবার মলত্যাগের পর ১০৫° (ফারেন্‌হাইট্) উষ্ণজল দ্বারা অন্তর্ধৌত এবং কিছু "ক্যাষ্টর অয়েল" বা "এপ্‌সম্ সল্ট্" ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। গরমজল একটু একটু করিয়া চুমুক দিয়া খাইতে হইবে। শুধু জল পান করিতে ভাল না লাগিলে, এক পাইট (দেড় পোয়া আন্দাজ) তরল অন্নমণ্ডে ছোট এক চামচে লবণ দিয়া পান করা যাইতে পারে। উক্ত জল অন্ত্রের মধ্যে চালিত হইয়া, অন্ত্রের দূষিত পদার্থ দূর করিয়া দেয়। বেদনা উপশম ও রোগের প্রতীকারের জন্য তিন চারি ঘণ্টা অন্তর পনের মিনিট ধরিয়া তলপেটে গরম সেঁক দিতে হইবে।

একটী দিন উক্ত প্রণালীতে জল পান ও অন্তর্ধৌত করিয়া, পরে ভেদ বন্ধ করিতে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জলপানের পরিমাণ কমাইয়া প্রতিবার ভেদ হইবার পরে, উষ্ণশ্বেতসার দ্বারা অন্তর্ধৌত (২৬শ

অধ্যায় দ্রষ্টব্য) করিয়া দিতে হইবে। প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর ৭নং ব্যবস্থা পত্র (৫০শ অধ্যায়) অনুযায়ী ঔষধ দিতে হইবে।

সকল প্রকার উদরাময় রোগেই রোগীর সর্ব্বদা ধীর ভাবে বিছানায় শুইয়া থাকা উচিত। কোন আহত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে যেরূপ সেই সেই অঙ্গের বেদনা বাড়িয়া থাকে, সেইরূপ উদরাময় হইলে চলাফিরা করায় রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

চব্বিশ হইতে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্নমণ্ড, ডিম্বের শ্বেতাংশের জল (৫০শ অধ্যায় ২৭নং ব্যবস্থা দেখুন) ব্যতীত অপর কোন পথ্য দিবেন না। উদরাময় একেবারে থামিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, কোন প্রকার ঘন বা অতরল খাদ্য খাইতে দিবেন না, এবং রোগ সারিয়া যাইবার পরেও কিছুকাল খুব পরিমিত ভাবে ঐরূপ খাদ্য খাইতে দিবেন। উদরাময় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে না হইতে সামান্য এক টুক্‌রা মাংস বা শাকসব্‌জি খাইলেও পুনরায় উহা বাড়িতে পারে।

রোগীর খাদ্য দ্রব্য ও থালা বাসন খুব পরিষ্কার রাখিতে হইবে, ঐ সমস্ত ফুটন্ত জলে ধুইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। খাইবার পূর্ব্বে রোগী সর্ব্বদা ভালরূপে হাত ধুইবে। ভেদ সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ১২ হইতে ১৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত চওড়া এক টুকরা ফ্লানেল দ্বারা তলপেট জড়াইয়া রাখিবেন। এইরূপ করিলে তলপেটে ঠাণ্ডা লাগিবে না।

আমাশয়

আমাশয় রোগে উদরাময়ের ন্যায় ভেদ হইতে থাকে, কিন্তু ভেদ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তলপেটে জ্বালা করিতে, ও কামড়াইতে থাকে। পুনঃ পুনঃ মল ত্যাগ হয়, এবং মলের পরিমাণ খুব কম হয়, এবং উক্ত মলে আম ও রক্ত থাকে। কখন কখন খুব জ্বরের সহিত এই রোগ আরম্ভ হয়।

"এমিবা" নামক জীবাণু হইতে উৎপন্ন রক্তামাশয়ই সাধারণতঃ এশিয়া মহাদেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই আণুবীক্ষণিক (Micro-organism) খাদ্য ও পানীয়ের সহিত অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। "এমিবা" জাত আমাশয় আরম্ভ হইলে মলের সহিত আম ও রক্ত দেখা যায়; তলপেটে ক্ষত হয়; মলত্যাগকালে বিষ্ঠাবাহী নাড়ীর শেষ ভাগ খুব জ্বালা করিতে থাকে। প্রতিদিন হয়তো ত্রিশ বা তদধিক বার মলত্যাগ হয়। রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তাহার দেহের ওজন বিশেষ ভাবে কমিয়া যায়। অনেক সময়ে এই রোগ পুরাতন বা দীর্ঘস্থায়ী হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ ভেদ হইতে থাকে; তারপর কয়েক দিন মলত্যাগের মাত্রা একেবারে কমিয়া প্রায় কোষ্ঠকাঠিন্য হইয়া পড়ে; পুনরায় ইহার পর পূর্ব্বাপেক্ষাও ভীষণ বেগে ভেদ হইতে আরম্ভ করে।

"এমিবা" জাত আমাশয় দীর্ঘস্থায়ী হইলে, খাদ্যবস্তু মোটেই পরিপাক হয় না, এবং খাইবার অল্পক্ষণ পরে উহা অবিকৃত ভাবে মলের সহিত বাহির হইয়া যায়।

উক্ত আমাশয়ে অনেক সময়ে যকৃতে ফোড়া হইয়া থাকে। যকৃতে ফোড়া হইলে, ডান পার্শ্বের পাঁজরার নিম্নভাগে সম্মুখে বেদনা করিতে থাকিবে। অনেক সময় স্কন্ধের অস্থির নিম্নভাগে পিঠের দিকেও বেদনা হয়।

সকল প্রকার আমাশয়ই সাংঘাতিক, সুতরাং সম্ভব হইলে অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাকিতে হইবে। কোন্ জাতীয় আমাশয় দ্বারা রোগী আক্রান্ত হইয়াছে, চিকিৎসকের তাহা স্থির করিয়া লইয়া, তদনুযায়ী চিকিৎসা আরম্ভ করিতে হইবে। চিকিৎসকের বিভিন্ন প্রকার আমাশয়ের প্রভেদ বোধ থাকা প্রয়োজন।

রোগীর ধীরভাবে বিছানায় শুইয়া থাকা বিশেষ প্রয়োজন। মলত্যাগের বেগ হইলেই যাহাতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে না হয়, অজন্য রোগীকে বেড্-প্যান ব্যবহার করিতে দিবেন। আমাশয় রোগে শান্তভাবে বিছানায় শুইয়া থাকা, চিকিৎসার একটী প্রধান অঙ্গ। পেটেণ্ট ঔষধ কখনও ব্যবহার করিবেন না। এই রোগের পেটেণ্ট ঔষধ নাই বলিলেও হয়। সাবধান, উদরাময়ের ঔষধ ব্যবহারে রোগ শুধু বাড়িতে থাকিবে। সকল প্রকার সুরাই ক্ষতিকর, উহা কোন আকারেই ব্যবহার করিবেন না। "এমিবা" জাত আমাশয় তরল খাদ্য ব্যতীত অপর কোন পথ্য দিবেন না। আধ আউন্স "ক্যাষ্টর অয়েল" বা কিয়ৎ পরিমাণ "এপ্ সম্ সল্ট" বা "গ্লবার সল্ট" দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করিবেন। "ক্যাষ্টর অয়েলের" কাজ হইলে পর, "এমেটিন্" দিবেন। এমিবা জাত আমাশয়ের ইহাই প্রকৃত ঔষধ। চিকিৎসকের সাহায্যে ইহা শরীরে ফুড়িয়া (ইন্‌জেক্‌সন্ করিয়া) দেওয়া যাইতে পারে। চিকিৎসক পাওয়া না গেলে বারোস্ ওয়েল্‌কাম্ এণ্ড কোম্পানী (Burroughs Welcome & Co.) কৃত "কেরাটিন্ কোটেড এমেটিনের" এক প্রকার বটিকা অর্থাৎ ট্যাব্‌লেট্ সংগ্রহ করিয়া, আধ গ্রেণ করিয়া এক একটী বটিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে দশ দিন ধরিয়া সেবন করাইবেন। যে কয়দিন ঔষধ সেবন করাইবেন, সেই কয়দিন রাত্রে কিছু খাইতে দিবেন না। খাইলে বমন হইতে পারে।

এমেটিন্ না পাইলে ক্রমাগত কয়েকদিন দিনে দুইবার করিয়া ১০ হইতে ২০ গ্রেণ পর্যন্ত "ইপিকাক" সেবন করিতে দিবেন। ইপিকাক্ খাইবার পূর্ব্বে তিন ঘণ্টার মধ্যে কিছু খাইবেন না; খাইবার পরে ধীর ভাবে শয়ন করিয়া

থাকিবেন। খাইবার পর তিন ঘণ্টার মধ্যেও কিছুই খাইবেন না, বা পান করিবেন না। যাহাতে বমি না হইতে পারে সেই জন্যই এইরূপ করা কর্ত্তব্য। রোগের কঠিন অবস্থায়, তলপেটে গরম সেঁক দিয়া, অথবা একখানি পাথর গরম করিয়া, একখানি কাপড়ে জড়াইয়া তলপেটের উপরে স্থাপন করিলে, পেট কামড়ান ও পেট জ্বালা হইতে কথঞ্চিৎ শান্তি পাওয়া যাইবে। দেড় পোয়া পরিমাণ উষ্ণ তরল শ্বেতসারের (২৬শ অধ্যায়) সহিত ৪০ কি ৫০ ফোঁটা "লডেনাম" যোগ করিয়া অন্ত্রধৌত করিয়া দিলেও বেদনার উপশম হইবে; প্রতি এক পাইট উষ্ণজলে ছোট এক চামচে লবণ মিশ্রিত করিয়া অন্ত্রধৌত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে তলপেটের নিম্নভাগ পরিষ্কৃত হইবে এবং পুনঃ পুনঃ মল ত্যাগের বেগ সংযত করিবে।

পুরাতন আমাশয় রোগে সর্ব্বত্রই কয়েক দিন ধরিয়া "এমেটিন" অথবা "ইপিকাক" প্রয়োগ করিতে হইবে। রোগীকে শুইয়া থাকিতে হইবে; প্রতিদিন একমাত্রা অল্প পরিমাণ "ক্যাষ্টর অয়েল" দিতে হইবে; এবং রোগীকে অন্নমণ্ড এবং ডিম্বের শ্বেতাংশ ব্যতীত (৫০শ অধ্যায়) অপর কিছুই পথ্য দেওয়া উচিত নহে। "এমেটিন্" বা "ইপিকাকে" কোন ফল না পাইলে ঔষধ মিশ্রিত "এনিমা" অর্থাৎ অন্ত্রধৌত প্রণালী প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রতি তিন পোয়া গরমজলে ছোট তিন চামচে "সোডা বাই কার্ব্বনেট্" মিশ্রিত করিয়া অন্ত্রধৌত করিবেন। জল নিঃসৃত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, অর্দ্ধ পাইট উষ্ণজলের সহিত ছোট দুই চামচে "বোরাসিক্ এ্যাসিড" অথবা ছোট চামচের আধ চামচে লবণ মিশাইয়া পুনরায় উহা ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। প্রত্যহ এইরূপ করিতে হইবে।

অপর কয়েকটী সুফলদায়ক চিকিৎসা প্রণালী আছে, কিন্তু শুধু চিকিৎসক দ্বারাই তাহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

যে কোন প্রকার আমাশয় হউক না কেন, উপযুক্ত পথ্যই প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হওয়া উচিত, কারণ আমাশয় পেটের অভ্যন্তর ভাগ স্ফীত এবং রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন সাধারণ খাদ্য দ্বারা উহা অধিকতর উত্তেজিত হয়, এবং আমাশয় বাড়িয়া যায়। আমাশয় রোগাক্রান্ত হইয়া নিয়মিত খাদ্য ভক্ষণ করা, এবং পীড়িত চক্ষে বালি নিক্ষেপ করা প্রায় একই কথা। খাদ্যের পরিমাণ যতদূর সম্ভব কম করিয়া দিতে হইবে; জিহ্বার উপরে সাদা আবরণ থাকিলে পাতলা ভাতের মণ্ড বা ডিমের শ্বেতাংশ অল্প পরিমাণে খাইতে দিবেন। কাঁচা ডিম্ব সাধারণ ভাবে বা মণ্ডের আকারে (৪৭শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) দেওয়া যাইতে পারে দিবসে তিন বার বহু পরিমাণে ভোজন করিবার পরিবর্ত্তে

বরং প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর অল্প পরিমাণে খাদ্য খাওয়া উচিত। খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডা জিনিষ খাইতে দিবেন না। অম্লখাদ্য একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। জিহ্বার উপরে সাদা আবরণ না পড়িলে, দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেই দুগ্ধ যেন টাট্‌কা ও পরিষ্কার এবং খাইবার পূর্ব্বেই ভালরূপে ফুটাইয়া লওয়া হয়। রোগ ভাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে দুধের মাত্রাও ক্রমশঃ বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। শক্ত খাদ্য অতি সাবধানে ব্যবহার করিতে দিবেন। শাকসব্‌জি এবং অধিকাংশ ফলই সহ্য হইবে না, অতএব উহা আদৌ খাইবেন না। কোন শক্ত খাদ্য খাইলে ভালরূপে চিবাইয়া খাইবেন। না চিবাইয়া সামান্য একটু খাদ্যও গিলিয়া ফেলিলে, পুনরায় রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। ৯নং ব্যবস্থা পত্রে নির্দ্দিষ্ট ঔষধ দ্বারা দিনের মধ্যে কয়েক বার মুখ পরিষ্কার করিয়া ফেলিবেন (৫০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

উদরাময় ও আমাশয় নিবারণ

এই দুইটী ব্যাধি অন্যান্য ব্যাধি অপেক্ষা সহজে প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। কেননা উহাদের রোগের জীবাণু কেবল মুখের মধ্য দিয়া দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত ঐ দুইটী রোগ পরিহার করিতে হইলে নির্ম্মল খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিতে, এবং মুখের মধ্যে যা, তা, পুরিয়া দিবার কু-অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিলে, উদরাময় ও আমাশয়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

১। অপরিষ্কৃত জল ব্যবহারের ফলেই অধিকাংশ স্থলে উদরাময় ও আমাশয় হইয়া থাকে। যাহারা ঐ সমুদয় রোগ ভোগ করে, তাহাদের মলে উক্ত রোগের জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়। পাতকূয়া এবং জলস্রোতের নিকটেই অনেক পায়খানা থাকে। মলাদি দূষিত পদার্থ বর্ষার জলে ধুইয়া কূয়া, পুকুর ও নদীর জলে যায়। কোন কোন সময়ে অসাবধানে লোকে পুকুর বা পাতকূয়ার নিকটবর্ত্তী জমিতে অথবা জল মধ্যে মল ফেলিয়া থাকে। যাহারা নদী বা পুকুরের জল ফুটাইয়া না লইয়া পান করে, তাহাদের উদরাময় ও আমাশয় দ্বারা আক্রান্ত হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। এই নিমিত্ত মুখ দাঁত পরিষ্কার করিবার ও পান করিবার জল অবশ্যই ফুটাইয়া লইতে হইবে।

২। হস্ত ভালরূপে ধৌত না করিয়া পানীয় জল বা খাদ্য কখনও স্পর্শ করিবেন না।

৩। অপরিষ্কৃত থালায় কোন খাদ্য রাখিলে, অথবা মাটির উপরে কোন খাদ্য দ্রব্য পতিত হইলে, উহাতে উদরাময় ও আমাশয়ের জীবাণু প্রবেশ করিতে পারে। এই জন্য যতবার থালা বাসন ব্যবহার করা হয়, ততবার উহা ফুটন্ত-জলে ধৌত করিতে হইবে। মাটিতে কোন খাদ্য দ্রব্য পড়িলে, তাহা ফুটন্তজলে ধোয়া বা যে অংশে ময়লা লাগিয়াছে, তাহা কাটিয়া ফেলা সম্ভব না হইলে, উহা ফেলিয়া দিতে হইবে।

৪। খাদ্য দ্রব্যে যেন কখনও মাছি বসিতে না পারে। যাহাদের আমাশয় ও উদরাময় আছে, তাহাদের মলাদি মাছিতে খায় ও ঐ মল মাছির পায় লাগিয়া থাকে, তাই কোন পরিষ্কৃত খাদ্য দ্রব্যের উপরে উহারা বসিলে লক্ষ লক্ষ রোগ জীবাণু উহার উপর ছড়াইয়া পড়ে (৪৮শ অধ্যায়ে মাছি দূর করিবার উপায় দ্রষ্টব্য)।

৫। অধিকাংশ খাদ্য দ্রব্যই পাক করিয়া খাওয়া কর্তব্য। খাদ্য দ্রব্য রান্না করিবার পরে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, যেন উহাতে মাছি বসিতে না পারে। বাজার হইতে আনীত শাকসবজি অবশ্যই পাক করিয়া খাইতে হইবে। শশা বা ঐ জাতীয় অপর কোন সবজি প্রথমে ফুটান জলে ডুবাইয়া লইয়া খোসা ছাড়াইবেন। বাজারের কোন প্রকার ফলই খোসা না ছাড়াইয়া খাইবেন না। ফুটন্ত জলে ফলটীকে ডুবাইয়া লইয়া পরে খোসা ছাড়াইয়া খাইলে, আর কোন দোষই থাকিবে না।

বাজারে ফালি কাটিয়া যে সকল ফল (যেমন তরমুজ প্রভৃতি) বিক্রীত হয়, সেই সমুদয় ব্যবহারের ফলে অনেক সময়ে উদরাময় হইয়া থাকে।

৬। পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির উদরাময় বা আমাশয় হইলে, তাহার মল মূত্রাদি ফেলিয়া দিবার পূর্ব্বে উহা ঔষধ দ্বারা বিশোধিত করিয়া লইবেন। বিশোধন প্রণালী ৪৭শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। রোগীর ব্যবহৃত থালা বাসন তোয়ালে কখনও পরিবারস্থ অপর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিবেন না।

৭। মুখের মধ্যে অঙ্গুলি দিবেন না। অঙ্গুলি দ্বারা অনেক সময়ে বহু নোংরা জিনিষ স্পর্শ করা হয়, তাই উহা মুখে পূরিয়া দিলে, শরীরে রোগ জীবাণু প্রবিষ্ট হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। পরিষ্কার খাদ্য দ্রব্য এবং পানীয় ব্যতীত পয়সা প্রভৃতি অপর কোন বস্তুই মুখের মধ্যে পূরিবেন না।

উদরাময় আরম্ভ হইলেই একেবারে তৎক্ষণাৎ চলাফিরা ত্যাগ ও আহারে সংযম অবলম্বন করিবেন, এবং শুধু তরল খাদ্য ভক্ষণ করিবেন। রোগের প্রারম্ভে সতর্ক হইলে, রোগ কখনও প্রবল আকার ধারণ করিতে পারে না।

৩৭শ অধ্যায়

টাইফয়েড্ বা সান্নিপাতিক জ্বর

(Typhoid Fever)

টাইফয়েড্ রোগোৎপাদক এক প্রকার বিশিষ্ট জীবাণু আছে। এই জ্বর সাধারণতঃ তিন সপ্তাহ বা তদধিক কাল স্থায়ী হয়, কিন্তু কোন কোন রোগীর সাত হইতে দশ দিন মাত্র জ্বর থাকে। সাধারণতঃ অসুস্থতা ও মাথাধরা—এই রোগের প্রধান লক্ষণ। ইহাতে সমস্ত দেহ অথবা তলপেটে বেদনা হয়। অনেক সময় শীত কম্প হইয়া জ্বর আরম্ভ হয়।

এই রোগের প্রারম্ভে সকাল বেলা ১০১° এবং সন্ধ্যাবেলা ১০৩° হইতে ১০৪° ডিগ্রি (ফারেন্‌হাইট্) জ্বর উঠিয়া থাকে। নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মিনিটে ৮০ হইতে ৯০ বার হয়। অনেক সময়ে প্রথম দুই এক দিনের পরেই জ্বর কমিয়া যায়, এবং রোগী অসুস্থ বোধ করিলেও, আট দশ দিন একটু চলা ফিরা করিতে পারে, কেবল শুইয়া থাকিতে হয় না।

কয়েক দিবস পরে সাধারণতঃ জ্বর ১০৩° ডিগ্রি হইতে আরম্ভ হয়। রোগীর মাথাধরে, জিহ্বার উপরে সাদা আবরণ পড়ে। রোগীর খাইবার ইচ্ছা থাকে না, খাইলে পর বমি হয়। তলপেট সাধারণতঃ ফাঁপে, ও উহাতে বেদনা থাকে। কখনও কোষ্ঠকাঠিন্য কখনও বা তরল দাস্ত হইয়া থাকে। রোগী প্রায় সব সময়ই তন্দ্রাবিষ্ট থাকে।

টাইফয়েড্ জ্বর সাধারণতঃ পীড়ার দ্বিতীয় সপ্তাহে বৃদ্ধি পায়। তলপেটে অথবা বুকের উপরে পিস্থর কামড়ের মত লাল লাল দাগ দেখা যায়। জিহ্বায় এবং ওষ্ঠে সাধারণতঃ কাল মামড়ি পড়ে। আট দশ জন রোগীর মধ্যে অন্ততঃ একজনের অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হয়, কখন কখনও উহার মাত্রা এত অল্প হয় যে তাহাতে কেবল মল একটু লাল হয়, আবার কখন কখন এত অধিক হয় যে উহাতে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। রোগী কখন কখন প্রলাপ বকে। অধিকাংশ স্থলে রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়।

তৃতীয় সপ্তাহে জ্বরের মাত্রা ক্রমশঃ কমিয়া আসে, এবং রোগের আক্রমণ কাল হইতে একুশ দিন পরে জ্বরের বিরাম হয়। তৃতীয় সপ্তাহে অভ্যন্তরস্থ নাড়ীর অংশ ছিন্ন হইবার নিমিত্ত ছিদ্র হওয়া অথবা রক্তস্রাব হওয়ার আশঙ্কা করা যাইতে পারে।

ক্রমাগত কয়েকদিন ব্যাপী জ্বর চলিতে থাকিলে, অমনি চিকিৎসক ডাকিতে হইবে, কারণ তিনি রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া নিশ্চয়রূপে জানিতে পারিবেন যে উক্ত জ্বর প্রকৃত টাইফয়েড্ কিনা, কারণ, টাইফয়েড্ হইলে রোগীকে সাবধানে শুশ্রূষা করিতে এবং তাহার মলমূত্র বিশেষ ভাবে বিশোধিত করিতে হইবে। এই কারণে যত শীঘ্র সম্ভব রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

প্রতীকার

টাইফয়েড জ্বরের চিকিৎসায় ঔষধ দ্বারা খুব কম কাজ হয়। ঔষধ অপেক্ষা ভালরূপ শুশ্রূষা ও উপযুক্ত খাদ্য অধিক উপকারী। রোগীকে প্রথম হইতেই মুক্ত বায়ু বিচরণ করে এইরূপ একটী ঘরে শোয়াইয়া রাখিতে হইবে; তাহাকে বিছানা হইতে উঠিতে দিবেন না।

রোগীর অধিকাংশ পথ্য তরল হওয়া প্রয়োজন। উত্তম টাট্কা দুগ্ধ পাইলে তদ্দ্বারা পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। রোগীকে দিবার দুগ্ধ ভালরূপে ফুটাইয়া লইতে হইবে। মাংসের কণিকা পর্য্যন্ত ভালরূপে ছাঁকিয়া লইয়া সেই স্থপ, অর্দ্ধ সিদ্ধ নরম নরম ডিম্ব, অথবা ডিম্বের ক্বাথ ভাতের মণ্ড, সেঁকিয়া লাল করা ময়দার মণ্ড, প্রভৃতি পথ্য রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। দুগ্ধের সহিত টোষ্ট রুটী ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইতে হইবে (৪৭শ অধ্যায়ে ঐ সকল পথ্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত হইয়াছে)। আঙ্গুর ফলের রস রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। রোগীকে কখনও এক কালে অধিক পরিমাণ খাদ্য দিবেন না। রোগীর তত্ত্বাবধানের জন্য সর্ব্বদা কোন লোক থাকিতে না পারিলে, তাহার শয্যা পার্শ্বে এক কুঁজো পরিষ্কার ও উত্তমরূপে ফুটান জল রাখিবেন, যেন সে ইচ্ছামত বারংবার উহা পান করিতে পারে। টাইফয়েড্ জ্বরাক্রান্ত রোগীর প্রচুর জল পান করা কর্ত্তব্য—দৈনিক অন্ততঃ আড়াই কিংবা তিন সের।

মুখের মধ্যভাগ ভালরূপ ধৌত করিতে এবং দাঁত ও জিহ্বা ভালরূপ মাজিতে হইবে (৫০শ অধ্যায়ে ৯নং ব্যবস্থা পত্র দ্রষ্টব্য)।

তলপেটে বেদনা থাকিলে প্রতিবারে পনের বা বিশ মিনিট করিয়া গরম জলের সেঁক দিলে বেদনার উপশম হইবে।

উদরাময় থাকিলে উষ্ণশ্বেতসার দ্বারা অন্তর্ধৌত করিয়া দিবেন (২৬শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে উষ্ণজলের অন্তর্ধৌত একদিন অন্তর একদিন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য (২০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

জ্বরের বেগ কমাইবার জন্য রোগীকে ঠাণ্ডা জলের কাপড় দিয়া গা মুছাইয়া দিবেন। পনের বিশ মিনিট অথবা তদধিক কাল ধরিয়া, চামড়ার উপরিভাগ ঠাণ্ডাজলে ভিজান কাপড় দ্বারা মুছিয়া লইবেন। তোয়ালে দ্বারা গাত্র না মুছিয়া পাখার বাতাস দ্বারা গাত্র শুষ্ক করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়া অতিশয় উপকারী, কারণ ইহাতে জ্বর কমাইয়া দেয়, এবং রোগী বেশ আরাম বোধ করে। এইরূপে স্পঞ্জ করিলে ঠাণ্ডা লাগিবার আশঙ্কা করা বৃথা। জ্বর খুব বেশী থাকিলে দিনের মধ্যে কয়েকবার ঐরূপ স্পঞ্জ করা চলিতে পারে (২০শ অধ্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য)।

রোগীর মাথার যন্ত্রণা কমাইবার জন্য, অতশিয় শীতল জলে এক খণ্ড কাপড় ভিজাইয়া মাথায় জলপটী দিবেন। কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর কাপড় খানিকে পুনরায় জলে ভিজাইয়া লইতে হইবে।

মলের সহিত রক্ত দেখা গেলে, রোগীকে দশ কি বার ঘণ্টার মধে, কোন প্রকার পথ্য দিবেন না। বরফ পাওয়া গেলে কয়েক টুক্‌রা বরফ একখানি নেকড়ায় জড়াইয়া লইয়া উহা তলপেটের উপর রাখিয়া দিবেন। এইরূপে ঠাণ্ডা প্রয়োগ করিবার ফলে পেট হইতে রক্ত পড়া বন্ধ হইবে।

জ্বর কমিয়া যাইবার পরে, রোগীর ক্ষুধা আরম্ভ হইতে থাকিলে কখনও তাহাকে সাধারণ মোটা আঁশ বা দানা বিশিষ্ট খাদ্য বা শাকসব্‌জি খাইতে দিবেন না।

টাইফয়েড্‌ রোগ যাহাতে বিস্তৃত হইতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। টাইফয়েড্‌ রোগীর মলমূত্র ও থুথুতে উক্ত রোগের জীবাণু থাকে, এই জন্য ঐ সমুদয় বিশোধিত করা আবশ্যক। প্রায় তিন পোয়া আন্দাজ মলমূত্রে ১৫ গ্রেণ "বাই-ক্লোরাইড্‌ অব্‌ মার্কারী" (Bi-chloride of mercury) মিশ্রিত করিয়া এক ঘণ্টা পরে উক্ত মলমূত্র ফেলিয়া দিবেন (৪৭শ অধ্যায়ে মলমূত্র বিশোধিত করিবার প্রণালী দ্রষ্টব্য)। কাগজের টুক্‌রার উপরে থুথু ফেলিয়া পরে উহা পুড়াইয়া দিতে হইবে।

রোগীর নিমিত্ত পৃথক্‌ থালা, বাটী, চামচে প্রভৃতি রাখিতে হইবে। পরিবারস্থ অপর কাহারও থালাবাসনের সহিত যেন উহা কখনও মিশিয়া না যায়। ঐ সমুদয় দ্রব্য রোগীর কক্ষেই রাখিয়া দিবেন, এবং প্রতিবার ব্যবহার করিবার পরেই জলে ফুটাইয়া লইবেন। রোগীর ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য কখনও কাহাকেও ভক্ষণ করিতে দিবেন না। রোগীর শুশ্রূষাকারীদের রান্না ঘরে প্রবেশ করা উচিত নহে।

রোগীর ব্যবহৃত তোয়ালে এবং রুমাল প্রভৃতি জলে সিদ্ধ করিয়া লইবেন। শুশ্রূষাকারী সর্ব্বদাই আত্মরক্ষার জন্য যত্নপর থাকিবেন। প্রায় তিন পোয়া আন্দাজ জলের সহিত ১৫ গ্রেণ "বাই-ক্লোরাইড্ অব্ মার্কারী" মিশ্রিত করিয়া রোগীর কুঠরীতে রাখিয়া দিবেন, এবং রোগীকে প্রতিবার খাওয়াইবার এবং ধৌত করিবার পর, উহার দ্বারা শুশ্রূষাকারী তাহার নিজের হস্তদ্বয় ভালরূপে ধুইয়া ফেলিবেন।

রোগী সারিয়া উঠিলে তাহার শয্যার নিম্নের মাদুর পুড়াইয়া ফেলিবেন; এবং বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি, ভালরূপে জলে সিদ্ধ করিয়া লইবেন। রোগীর গৃহটী পাকা হইলে, উহার দেওয়ালগুলি পুনরায় চূণকাম করিতে হইবে, এবং এক পাইট জলে ১৫ গ্রেণ এই হিসাবে জলে "বাই-ক্লোরাইড্ অব মার্কারী" মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ভাল করিয়া মাজিয়া ঘষিয়া উহার মেঝে পরিষ্কার করিতে হইবে (কুঠরী পরিষ্কার করিবার প্রণালী সম্বন্ধে ৪৭শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

রুগ্নাবস্থায় ও রোগ সারিবার পরেও দুই সপ্তাহ প্রতিদিন প্রস্রাবে রোগ জীবাণু নষ্ট করিবার জন্য ১০ গ্রেণ "ইউরোট্রোপিন্" (Urotropin) দেওয়া কর্ত্তব্য।

টাইফয়েড্ প্রতিরোধ

যাহা মুখে ঢুকে তৎসম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিলে সকলেই টাইফয়েড জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। এই রোগের জীবাণু কেবল মুখের মধ্য দিয়াই দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ খাদ্যে ও পানীয়ে ইহা বর্ত্তমান থাকে। সচরাচর মলমূত্র এরূপ স্থানে নিক্ষিপ্ত হয় যে, সে স্থান হইতে উহা অবশেষে পাতকুয়া, পুকুর বা অন্যান্য জলাশয়ে যায়। এই জন্য পান করিবার এবং মুখ, দাঁত ও যে সকল খাদ্য রন্ধন না করিয়া খাওয়া হয়, তাহা ধৌত করিবার নিমিত্ত সিদ্ধ জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

অনেক সময়ে দুগ্ধের সহিত টাইফয়েড্ রোগের বীজ মানব দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেই জন্য টাট্কা দুগ্ধ সিদ্ধ ও বিশোধিত করিয়া পান করিবেন। ঝিনুক, চিংড়ি, গুগ্লি প্রভৃতি খাইবার ফলে টাইফয়েড্ জ্বর হইয়া থাকে। ঐ সকল খাদ্য মানবের হজম করিবার উপযুক্ত নহে। তথাপি উহা খাইবার প্রবৃত্তি হইলে, ভালরূপে সিদ্ধ করিয়া খাইবেন।

কখন কখন শাকসব্জির ক্ষেত্র উর্ব্বর করিবার জন্য, মানুষের মল নিক্ষেপ করা হয়। তরিতরকারীর শাকপাতায় ও শিকড়াদিতে ঐ মল হইতে জীবাণু লাগিয়া থাকিতে পারে; এই জন্য জলে সিদ্ধ না করিয়া কোন সব্জি খাওয়া

উচিত নহে। যাহারা ফল সংগ্রহ করে, তাহাদের হাত নোংরা থাকে, আবার সংগ্রহ করিবার পরেও উহা অপরিষ্কার স্থানে রাখিয়া দেয়। এই জন্য উহা খাইবার পূর্বে কিছুক্ষণ গরমজলে ফেলিয়া খোসা ছাড়াইয়া লইতে হইবে।

মাছি দ্বারা টাইফয়েড্ রোগের জীবাণু চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। উক্ত রোগ বিস্তারে মাছির প্রভাব এত বেশী যে, সাধারণতঃ উহাকে "টাইফয়েড মাছি" বলা হয়। কবাট ও জানালায় তারের জাল ব্যবহার করিয়া রান্না ঘরে মাছি প্রবেশের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। রান্না করা দ্রব্যাদি এরূপভাবে কোন জাল দেওয়া আলমারীর মধ্যে রাখিয়া দিবেন, যেন কোন মাছি উহার উপরে বসিতে না পারে (৩৮ পৃষ্ঠায় চিত্র দেখুন)। খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া

টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি বিস্তৃত হইবার একটী উপায়

পরিবেশন করিবার পরেও প্রয়োজন হইলে যাহাতে মাছি বসিতে না পারে এরূপে উহা জাল দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।

টাইফয়েড্ রোগীর ব্যবহৃত থালা, বাসন, রুমাল, তোয়ালে, প্রভৃতি কয়েক মিনিট ধরিয়া ভালরূপে না ফুটাইয়া কখনও অপর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিবেন না। উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির গৃহের কোন খাদ্য বস্তু গ্রহণ করিবেন না। পুকুরের জলে টাইফয়েড্, কলেরা, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি রোগের জীবাণু থাকে। কাজেই পুকুরের জলে কাহারও স্নান করা উচিত নহে, কারণ ঐ জল মুখে গিয়া সাংঘাতিক রোগ হইতে পারে।

কয়েক বৎসর হইল টাইফয়েড্ রোগ নিবারণ করিবার এক নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। টীকা দ্বারা যেরূপ বসন্ত রোগ নিবারণ করা যায়, সেইরূপ ত্বক্‌ভেদী একটী ক্ষুদ্র পিচ্‌কারীর সাহায্যে, দেহাভ্যন্তরে টাইফয়েডের টীকা প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া দুই তিন বৎসর কাল উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকা যাইতে পারে। যাহাদের চারি দিকে টাইফয়েড রোগ ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং যাহারা সর্ব্বদা ভ্রমণে রত, সুতরাং খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা যাহাদের সম্ভব নহে, তাহাদের উপরি-উক্ত প্রণালী মতে টাইফয়েড প্রতিরোধ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

দেহের রোগ প্রতিরোধ করিবার স্বাভাবিক শক্তি টাইফয়েড প্রতিরোধের একটী বিশেষ উপায়। মদ, তামাক, পান, আফিং প্রভৃতি মাদকদ্রব্য ব্যবহার এবং যে কোন প্রকার অমিতাচারে শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং টাইফয়েড্ রোগের বীজ সহজে দেহে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। যে ব্যক্তির অন্নবহা-নালী বেশ সতেজ, আহার অপেক্ষা যে ব্যক্তি অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় ভোগ করিয়া অন্নবহানালীকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের পক্ষে টাইফয়েড রোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সহজ।

৩২শ অধ্যায়

কলেরা বা বিসূচিকা

পৃথিবীতে এমন দেশ খুব কমই আছে, যে দেশে কোন না কোন সময়ে বিসূচিকা ব্যাধি মহামারী আকারে বিস্তৃত হয় নাই। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি-গণের মধ্যে সাধারণতঃ অর্দ্ধেকের মৃত্যু হইয়া থাকে। এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ বড় বড় সহরে সকল সময়েই এই রোগ বিদ্যমান; তাই যাহাতে ইহা আরও ভাল করিয়া প্রতিরোধ করা যাইতে পারে, সেই জন্য সকলের কিরূপে এই রোগ বিস্তৃতি লাভ করে তাহা জানিয়া রাখা উচিত। সাধারণতঃ কলেরা হইলেই যে মারাত্মক হইবে, এইরূপ নহে, তাই উহার সর্ব্বোত্তম প্রতীকারের পন্থা সকলেরই জানা উচিত।

কলেরা জীবাণু দ্বারাই কলেরা রোগ উৎপন্ন হয়। খাদ্য ও পানীয়ের সহিত এই জীবাণু মুখ-বিবরের মধ্য দিয়া শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে; অথবা মুখের মধ্যে অঙ্গুলি বা অপর কোন জিনিষ পূরিয়া দিলে, তৎসঙ্গে রোগ জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। রোগজীবাণু শরীরে প্রবিষ্ট হইবার পর, দুই এক দিনের মধ্যেই, বেশী হইলে চারি পাঁচদিনের মধ্যে রোগের সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতিমাত্রায় কলেরা জীবাণু পরিপূর্ণ কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করিলে, অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগ হইতে পারে।

কলেরা রোগের লক্ষণ

প্রকৃত কলেরার লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কলেরা জীবাণু পরিপূর্ণ কোন খাদ্য খাইবার পর ১২ হইতে ১৮ ঘণ্টার মধ্যে তলপেটে বেদনা আরম্ভ হয়। অল্পক্ষণ পরে দাস্ত হইতে থাকে; পরে ক্রমশঃ উহার মাত্রা বাড়িতে থাকে, এবং অবশেষে অতি তরল চাউল ধোয়া জলের ন্যায় মল ক্রমাগত নিঃসৃত হয়।

কখন, কখন শীতকম্প, পিপাসা, জিহ্বার উপরে কঠিন আবরণ, তলপেটে ঈষৎ বেদনা, এবং দিনের মধ্যে তিন চারি বার অতিমাত্রায় তরল দাস্ত প্রভৃতি উপসর্গ লইয়া কলেরার সূচনা হয়। রোগী অতিশয় দুর্ব্বলতা বোধ করে। পর-দিবস মলত্যাগের মাত্রা অতিশয় বাড়িতে থাকে, এবং মল সাদা চাউল ধোয়া জলের ন্যায় দেখায়। খুব জোরে মলত্যাগ ও বমি হইতে থাকে। বমির সঙ্গে

প্রথমতঃ ভুক্ত খাদ্য উঠিতে থাকে। অবশেষে বমির আকৃতি কতকটা মলের ন্যায় হয়। পিপাসা ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে, এবং হাত, পা, পিঠ এবং অন্যান্য অঙ্গে দারুণ বেদনা হয়।

রোগের প্রখরতা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে, রোগীর বাহ্যিক আকৃতি ভীতিপ্রদ হইতে থাকে। চক্ষু কোঠর গত হয়, এবং উহার চারিদিকে কাল দাগ পড়ে; নাসিকা কুঞ্চিত ও সুতীক্ষ্ণ হয়, এবং গাল দুই খানি একেবারে বসিয়া যায়। ওষ্ঠদ্বয় নীলাভ এবং শরীর শীতল ও ঘর্মসিক্ত হইয়া চট্‌চটে হইয়া থাকে। হাত ও অঙ্গুলিগুলির চামড়া অনেকক্ষণ গরম সাবান জলে ডুবাইয়া রাখিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ দেখায়, স্বর ক্ষীণ হয়, নিশ্বাস শীতল হয়, এবং প্রস্রাব একেবারে কমিয়া যায়।

কলেরায় আক্রমণ সকল সময়েই যে উপর-উক্ত লক্ষণ অনুযায়ী হইবে এই-রূপ নহে। কখন কখন রোগীর কিছুদিন সাধারণ পেটের পীড়া হইয়া উহা ক্রমশঃ কলেরায় পরিণত হয়।

কোন কোন সময়ে কলেরার রোগী একেবারে শয্যাশায়ী হয় না। কেবল উদরাময়, শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং মূত্রাল্পতা হইয়া থাকে। এই প্রকার রুগ্নব্যক্তি অবাধে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারে বলিয়া চারিদিকে কলেরা রোগের বীজ বিস্তার করিতে থাকে।

এই রোগ যখন মহামারীর আকার ধারণ করে, তখন কখন কখন হাত পায়ে ভীষণ রকমে খিল ধরিয়া, উদরাময় না হইয়াই অনেকে অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রোগের কঠিন লক্ষণগুলি কমিয়া গিয়া কলেরা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির অনেক সময়ে মূত্রকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হয়; এবং তখনও জীবন নাশের বড় ভয় থাকে।

রোগ নির্ণয়

কলেরা যখন মহামারীর আকার ধারণ করে, তখন যে কোন প্রকার পেটের পীড়া কলেরার সূচনা হইতে পারে। কাজেই উহার চিকিৎসা কলেরার ন্যায় করিতে হইবে। প্রভূত পরিমাণ চাউল ধোয়া জলের ন্যায় মল নিঃসরণ, হিমাঙ্গ, গাত্রচর্ম্ম চটচটে ও শীতল হওয়া, চোখ মুখ বসিয়া যাওয়া, হস্ত ও পদের অঙ্গুলি কোচ্‌কান, হাতপায়ে খিল ধরা, অল্প প্রস্রাব হওয়া প্রভৃতি কলেরার সুপ্রকট লক্ষণ।

শিশুদিগের কলেরা

অনেক সময়ে শিশুদিগের কলেরা হইলে চিকিৎসায় ঔদাসীন্য দেখান হয়, কারণ, বয়স্ক ব্যক্তিদিগের কলেরায় যে প্রকার লক্ষণ দেখা যায়, শিশুদিগের সেই-রূপ দেখা যায় না।

অনেক ক্ষেত্রে শিশুদিগের কলেরায় সাধারণ উদরাময় ও আমাশয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হয় (২৬শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বহু শিশুর কলেরা হইলে, সামান্য উদরাময়ের সঙ্গে তড়কা হয়, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে কলেরা থাকিলে, শিশুদিগের বমি ও পেটে অসুখ, পাকস্থলীতে খিলধরা, অথবা তড়কা দেখা গেলে, তাহাদিগকে কলেরার রোগী বলিয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিবেন।

চিকিৎসা

কলেরার চিকিৎসা যত সত্বর আরম্ভ করা যায়, ততই ভাল। কলেরা হইয়াছে টের পাইলেই নিকটস্থ স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী কর্ম্মচারীকে ঐ বিষয় জানান উচিত, এবং সম্ভব হইলে চিকিৎসার জন্য সু-চিকিৎসক ডাকা উচিত।

মলত্যাগ বা খেঁচুনি আরম্ভ হইলেই, রোগীকে বিছানায় শয়ন করাইয়া দিবেন। মলমূত্র ত্যাগের নিমিত্ত মলপাত্র এবং মূত্রভাণ্ড রাখিবেন, রোগীর যেন শয্যাত্যাগ করিতে না হয়। রোগীকে প্রচুর পরিমাণে ফুটান পরিষ্কার শীতল জল পান করিতে দিবেন; উষ্ণ জলে লেবুর রস মিশাইয়া দেওয়া ভাল। অন্নমণ্ড এবং ডিম্বের জল (৪৭শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ব্যতীত অপর কোন পথ্য দিবেন না। বমন হইতে থাকিলে কিছুক্ষণ খাওয়া বন্ধ করিয়া, ইচ্ছামত জল পান করিতে দিবেন। তলপেটে সেঁক প্রদান করিলে (২০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে।

অধুনা কলেরা চিকিৎসার একটী ফলদায়ক প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। কলেরা রোগীর দেহের শিরার মধ্যে লবণ জল প্রবেশ করাইয়া দিলে সুফল লাভ করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এক পাইট পরিষ্কার জলে ১২০ গ্রেণ খাঁটি লবণ মিশ্রিত করিবেন, পরে ঐ জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া হাত বা পায়ের কোন শিরায় পিচকারী দ্বারা প্রবিষ্ট করাইয়া দিবেন। কলেরা চিকিৎসায় ইহা একটী উৎকৃষ্ট পন্থা। এই প্রকারে ইহা সাধারণতঃ তিন চারিবার প্রয়োগ করিতে হয়। চিকিৎসক বা শিক্ষিত সেবক সেবিকা ব্যতীত অপর কেহ কখনও রোগীর দেহে ঔষধ প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিবেন না।

চিকিৎসক বা অভিজ্ঞ নার্স না পাইলে, নিম্নলিখিত উপায়সমূহ অবলম্বন করা যাইতে পারে। রোগীকে উষ্ণ রাখিবেন; গরমজলপূর্ণ বোতল কাপড়ে মুড়িয়া রোগীর দেহের পার্শ্বে রাখা যাইতে পারে। দেড় সের আন্দাজ গরম জলে (১০৫° ডিগ্রি) লবণ মিশ্রিত করিয়া প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর্ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিবেন। উক্ত জলে ছোট আট চাম্‌চে লবণ মিশ্রিত করিবেন। উক্ত জলে "ট্যানিক এ্যাসিড" (Tannic Acid) মিশ্রিত করিয়া দিবসে তিনবার অন্তর্ধৌত করিয়া দিবেন। এক পাইট জলে ৭৫ গ্রেণ

"ট্যানিক এ্যাসিড" মিশাইয়া, উহা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা উদরাময় কমিয়া যাইবে।

লবণ মিশ্রিত জলের অন্তর্ধৌত ব্যতীত আর একটী উত্তম পন্থা কিছুদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। "পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গনেট্" (Potassium Permanganate) ৫ কি ৬ গ্রেণ পরিমাণ এক পাইট জলে মিশ্রিত করিয়া, রোগীকে সাধারণ জলের পরিবর্ত্তে পান করিতে দিবেন। এক এক বারে উক্ত ঔষধ মিশ্রিত জলের দুই তিন আউন্স পরিমাণ পান করিতে দিবেন। এতদ্ব্যতীত প্রতি আধঘণ্টা অন্তর পোটাসিয়াম্ পারম্যাঙ্গানেটের এক একটী পিল রোগীকে ঔষধস্বরূপে দিতে হইবে। সামান্য কেওলিন (Kaolin) বা ভ্যাসিলিনের সহিত উক্ত পোটাসিয়াম্ পারম্যাঙ্গানেট্ মিশ্রিত করিলে, উহা দ্বারা সহজে বড়ি প্রস্তুত করা যায়। বড়ি প্রস্তুত করিয়া উহার উপরে কেরাটিনের (Keratin) প্রলেপ আবারণ দিতে হইবে। প্রথম দিনে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর এবং পরে প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর এক একটী বড়ি সেবন করাইবেন।

উদরাময় কিছু কমিয়া গেলে রোগীকে অল্প পরিমাণে ভাতের মণ্ড পথ্য দিবেন। রোগের কতিপয় লক্ষণ দূরীভূত হইলে এবং রোগী ক্রমশঃ ভাল বোধ করিলেও আরও কিছু কাল লবণ মিশ্রিত জলের অন্তর্ধৌত চালাইতে হইবে। উদরাময় থামিয়া গেলে ট্যানিক এ্যাসিডের অন্তর্ধৌত দিবেন না। রোগীকে সর্ব্বদা লেবুর রস মিশ্রিত জল প্রচুর পরিমাণে পান করাইবেন।

রোগীর প্রস্রাব না হওয়া পর্য্যন্ত সে নিরাপদ নহে। এই জন্য মূত্রাশয়ের কার্য্য আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত লবণ মিশ্রিত উষ্ণ জলের অন্তর্ধৌত বন্ধ করিবেন না। পিঠের নিম্নাংশে সেঁক প্রদান করিবেন, ও গা টিপিয়া দিবেন।

বাজারের বিজ্ঞাপনে প্রচারিত পেটের অসুখ বা আমাশয়ের কোন পেটেন্ট ঔষধ ব্যবহার করিবেন না। কোন প্রকার মাদক পানীয় দ্রব্য ব্যবহার করা অতিশয় অন্যায়।

কলেরা রোগীর শুশ্রূষাকারীর প্রতি উপদেশ

কলেরা রোগীর নিমিত্ত পৃথক কোন হাঁসপাতালের ব্যবস্থা থাকিলে, প্রথমে রোগীকে তথায় প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। ইহার অভাবে তাহাকে একটী নিরিবিলি কক্ষে রাখিয়া দিবেন। সেই কক্ষে একটী টেবিল, একখানি চেয়ার ও একখানা খাট ব্যতীত যেন অপর কোন আসবাব না থাকে। কক্ষের জানালাগুলি উন্মুক্ত রাখিবেন, এবং সম্ভব হইলে মাছি না আসিতে পারে এই জন্য দরজা জানালাগুলি মশারীর কাপড় বা তারের জাল দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবেন।

কলেরা রোগীর মলমূত্র অতি সাবধানে বিশোধিত না করিলে, কেবল একটী মাত্র রোগী দ্বারা সমগ্র গ্রামে বা সহরে কলেরা ছড়াইয়া পড়িতে পারে। একটী স্বতন্ত্র পাত্রে রোগীর মল রাখিয়া দিবেন; পাঁচ ছটাক জলে ৭॥০ গ্রেণ "বাই-ক্লোরাইড অব্ মার্কারী" (Bi-cloride of mercury) মিশ্রিত করিয়া, উক্ত ঔষধ মিশ্রিত জল মলে সংযুক্ত করতঃ এক ঘণ্টা কাল রাখিয়া দিবেন। তৎপরে উহা গৃহ হইতে দূরে ফেলিয়া দিবেন। উক্ত মল কখনও পুকুর বা পাতকূয়া প্রভৃতি জলাশয়ের নিকটে ফেলিবেন না।

বাই-ক্লোরাইড্ অব্ মার্কারী পাওয়া না গেলে, একশত ফুটের মধ্যে কোন জলাশয় না থাকে, এরূপ একটী স্থানে একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া, তাহার মধ্যে মল নিক্ষেপ করিয়া ছাই বা চূণ দ্বারা উহা আবৃত করিতে হইবে। বর্ষা ভিন্ন অন্য ঋতুতে এইরূপ করা যাইতে পারে, কিন্তু বর্ষাকালে কোন বিশোধন-দ্রব্য পাওয়া না গেলে, মল মূত্রাদি কোন টিনের পাত্রে করিয়া ফুটাইয়া লইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে।

কলেরা রোগীর মল, কলেরা জীবাণু দ্বারা এইরূপ বিষাক্ত থাকে যে উহার তিল পরিমাণ কোন খাদ্যে বা পানীয়ে পড়িলে, উক্ত খাদ্য বা পানীয় যে খাইবে, তাহার সত্বরই কলেরা হইবে।

রুগ্ন ব্যক্তির ব্যবহৃত থালা বাসন ফুটন্ত জলে না ধুইয়া কখনও রোগীর গৃহ হইতে অন্যত্র সরাইবেন না। কলেরার রোগী যাহা কিছু তাহার হস্ত বা মুখ দ্বারা স্পর্শ করে, তাহাই বিষাক্ত; কারণ রোগীর হস্ত ও ওষ্ঠ রোগ জীবাণু পরিপূর্ণ থাকে। এই জন্য অপর কাহারও ঐ সমুদয় জিনিষ স্পর্শ করা উচিত নহে। রোগীর শুশ্রূষা-কারিণী সর্ব্বদা "বাই-ক্লোরাইড অব্ মার্কারী" মিশ্রিত তরল ঔষধ দ্বারা হস্ত ধৌত করিয়া লইবেন। কখনও নিজ মুখে অঙ্গুলি পুরিয়া দিবেন না। রোগীর গৃহে বসিয়া কোন খাদ্য খাইবেন না। খাইবার পূর্ব্বে হস্তদ্বয় প্রথমে সাবান দ্বারা ধৌত করিয়া পরে "বাই-ক্লোরাইড্ অব্ মার্কারী" মিশ্রিত জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিবেন।

রোগ মুক্ত হইবার পরে কলেরা রোগীর গৃহ ও তন্মধ্যস্থ জিনিষ পত্রাদি ৪৭শ অধ্যায়ে বর্ণিত প্রণালী অনুযায়ী বিশোধিত করিতে হইবে।

প্রতিরোধের উপায়

সুস্থ ব্যক্তির পাকস্থলীর পাচকরস্ কলেরা রোগের জীবাণু বিনষ্ট করিতে পারে,—অবশ্য যদি জীবাণুর সংখ্যা অধিক না হয়। এই নিমিত্ত পাকস্থলী ও অন্ত্রদ্বয় এবং দেহকে সুস্থ রাখিতে পারিলেই রোগ পরিহার করা যায়। যাহারা মাদক দ্রব্য সেবন করে, এবং অন্যান্য পাপাচরণ দ্বারা শরীর নষ্ট করে, কলেরা

রোগের প্রাদুর্ভাব কালে, তাহারাই প্রথমে রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পরিশ্রান্ত দুর্ব্বল দেহে এবং খালি পেটে কলেরা জীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে, কলেরা হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে।

কলেরা রোগের জীবাণু কেবল মুখের মধ্য দিয়াই শরীরে প্রবেশ করে; সুতরাং এই রোগের আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করিতে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য সুসিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে, এবং সুসিদ্ধ হইবার পরে উহার উপরে যাহাতে মাছি বসিতে না পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

মুখের মধ্যে কখনও অঙ্গুলি দিবেন না।

অনেক সময়ে কাঁচা ফল বা অপক্ক শাকসব্‌জি খাইবার ফলে এই রোগ হয়।

কলেরার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে ৩০শ ও ৩১শ অধ্যায় বিবৃত প্রণালীগুলি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কলেরা মহামারীর আকার ধারণ করিলে যাহাতে সাবধানে থাকা যায় এই জন্য আমরা নিম্নে সংক্ষেপে ঐ সকল বিষয়ের পুনরালোচনা করিতেছি।

১। পান করিবার এবং মুখ ও দাঁত ধুইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত জল যেন সর্ব্বদা ফুটাইয়া লওয়া হয়।

২। সুপক্ক এবং উষ্ণ খাদ্য ব্যতীত অপর কোন খাদ্য খাইবেন না।

৩। শশা, তরমুজ এবং অন্যান্য কাঁচা ফলও খাইবেন না।

৪। ফেরিওয়ালার নিকট হইতে কোন জিনিষ ক্রয় করা বড়ই বিপজ্জনক, ঐরূপ জিনিষ গরম জলে সিদ্ধ না করিয়া খাইবেন না।

৫। কলেরা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত বিছানা, তোয়ালে, চামচে, বাসন, বাটি প্রভৃতি তাহার ঘর হইতে বাহির করিয়া ফুটান জলদ্বারা বিশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও স্পর্শ করিবেন না।

৬। মাছি, পিপীলিকা, তেলাপোকা প্রভৃতি দ্বারা কলেরা রোগের জীবাণু চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া থাকে। উহারা যেন খাদ্য বস্তু স্পর্শ করিতে না পারে, এইরূপে ঢাকিয়া রাখিবেন। বিশেষতঃ রান্না করা খাদ্যের উপরে যাহাতে কখনও মাছি বসিতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৭। খাদ্য বা পানীয় কোন বস্তুতে হাত দিবার পূর্ব্বে ভালরূপে সাবান ও গরম জল দ্বারা হাত ধুইয়া ফেলিবেন।

৮। যে গৃহে বা যে পল্লীতে কলেরা সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে, সেই গৃহের বা সেই পল্লীর কোন ব্যক্তির সহিত সম্ভব হইলে মেলামিশা করিবেন না।

৯। বিদেশে ভ্রমণকালে নিজের তোয়ালে, পানপাত্র এবং অন্যান্য আবশ্যক জিনিষ পত্রাদি সঙ্গে লইবেন; কারণ হোটেলের বা ষ্টেশনের জিনিষ পত্রাদি ব্যবহার করা মোটেই নিরাপদ নহে।

৩৩শ অধ্যায়

টাইফাস ও ডেঙ্গু জ্বর ঃ প্লেগ

টাইফাস্ জ্বর (Typhus fever)

টাইফাস্ জ্বরের অনেক প্রকার নাম আছে, যেমন গারদের জ্বর, দুর্ভিক্ষের জ্বর। এই নামগুলি হইতেই এই জ্বরে প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়, এবং বুঝা যায় যে যাহারা উপযুক্ত খাদ্য পায় না, জনাকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে, তাহাদেরই এই রোগ হয়। দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে প্রায়ই এই রোগ মহামারীর আকার ধারণ করে।

নিশ্চয়রূপে জানা গিয়াছে যে, টাইফাস্ জ্বর শরীরের ও মাথার উকুণের দ্বারা এক দেহ হইতে অন্য দেহে নীত হয়। ছারপোকা প্রভৃতি অন্যান্য কীট পতঙ্গ দ্বারাও ইহা বাহিত হইতে পারে। টাইফাস্ জ্বরাক্রান্ত রোগীর মলমূত্র দূষিত খাদ্য ও পানীয় দ্বারাও এই রোগের বিস্তৃতি লাভ করা সম্ভব।

লক্ষণ

উকুণ টাইফাস্ জ্বরাক্রান্ত কোন রোগীকে কামড়াইয়া কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়াইলে পর ১২ দিনের মধ্যেই ঐ সুস্থ ব্যক্তির হঠাৎ ঐ রোগ উপস্থিত হয়। প্রথমে শীতকম্প হইয়া খুব বেশী জ্বর উঠে, কখন কখনও বা প্রলাপও বকিতে থাকে। চক্ষু লাল হয় ও চক্ষু হইতে জল পড়ে। তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে জ্বর ১০৪° ডিগ্রি, এমন কি ১০৫° বা ১০৬° ডিগ্রি ফারেন্‌হাইট্ পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। তাহার পর চারি পাঁচ দিন ধরিয়া সকালে জ্বর একটু একটু কম থাকে, কিন্তু বৈকালে ১০৩° বা ১০৪° ফারেন্‌হাইট্ জ্বর উঠে। সাধারণতঃ চৌদ্দ দিনের দিন হঠাৎ জ্বর ছাড়িয়া যায়। জ্বর ছাড়িবার সময়ে প্রচুর ঘাম হয়।

রোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনের পর শরীরে একপ্রকার গুটি বাহির হয়। বাহুতে ও কাঁধে এগুলি বেশ দেখা যায়। দাগগুলি প্রথমে হাম বলিয়া মনে হইতে পারে। অল্পদিনের পরেই প্রথমে যে দাগগুলি দেখা গিয়াছিল, তাহার মধ্যস্থলে একটী নীল বিন্দু দেখা যাইবে।

চিকিৎসা

ঔষধে এই রোগ ভাল করিতে বা ইহার ভোগকাল কমাইতে পারে না। ৩১শ অধ্যায়ে টাইফয়েড জ্বরের যে চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে, টাইফাস্ রোগের পক্ষেও তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। রোগীকে সর্ব্বদা শয্যায় শুইয়া থাকিতে

হইবে। শয্যাখানি গৃহের বাহিরে, সূর্য্য কিরণ ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইতে পারা যায় এমন বারান্দায় বা কোন আচ্ছাদনের নিম্নে হইলে ভাল। রোগীকে প্রচুর ফুটান জল ও ফলের রস পান করিতে দিতে হইবে। ভাতের মণ্ড, ডিম, ঝোল (স্যুপ) সেঁকা রুটী, জ্বাল দেওয়া দুধ এই সকল খাদ্য রোগীকে দেওয়া যায়।

রোগ নিবারণের উপায়

যাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে বাস করে, যাহাদের কাপড় প্রভৃতি পরিষ্কার, তাহাদের বিছানায় বা কাপড়ে উকুণ থাকিতে পারে না, কাজেই তাহাদের এই রোগ হয় না।

পাড়ায় কাহার টাইফাস্ জ্বর হইলে, যাহাতে উকুণে না কামড়ায় সে দিকে খুব লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাহাদের ঐ জ্বর হইয়াছে যদি তাহাদের সংস্পর্শে আসিতে হয়, তবে কিছুতেই তাহাদের কাপড় জামা পরিবেন না, বা তাহাদিগের বিছানায় বসিবেন না, বা কোন মতেই রোগীর ব্যবহৃত টুপি, জুতা, মোজা প্রভৃতি ব্যবহার করিবেন না।

রোগীর বিছানা ও বিছানার চাদর পরিষ্কার করিতে হইবে। চুল ছোট করিয়া কাটিতে হইবে। রোগ মুক্ত হইলে রোগীর কাপড়, জামা, বিছানা প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া বিশোধিত করিতে হইবে।

ডেঙ্গুজ্বর

মশক দ্বারা ডেঙ্গুজ্বর চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ডেঙ্গুবিষবাহী মশকে দংশন করিবার তিন হইতে ছয় দিন পরে, রোগ প্রকাশ পায়। রোগের আক্রমণ সাধারণতঃ সহসা উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রথমে শীত বোধ হয়, এবং হাত পা অথবা পিঠ, এরূপ কোন এক অঙ্গে দারুণ বেদনা আরম্ভ হয়। মস্তকের সম্মুখ ভাগে এবং চক্ষের পিছন দিকে খুব কামড়াইতে থাকে। চক্ষু সজল ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। জ্বরের তাপ ১০৩° ডিগ্রি হইতে ১০৫° ডিগ্রি ফারেন্‌হাইট্ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ক্ষুধা মোটেই থাকে না বমন অথবা বমনোদ্বেগ প্রায়ই দেখা যায়। শিশুদিগের প্রলাপ ও তড়কা হওয়া সম্ভব। তৃতীয় দিবসে খুব ঘাম, অতিরিক্ত প্রস্রাব, কখন কখন বা উদরাময় হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়। ইহার পরে রোগী দুই তিন দিন ভাল বোধ করে, তারপর পুনরায় বেদনা আরম্ভ হয়, এবং জ্বর বাড়িতে থাকে। হাত, পা এবং মুখায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি প্রকাশ পাইতে পারে। দ্বিতীয় বারের জ্বর অল্পকালস্থায়ী হইয়া ছাড়িয়া যায়।

চিকিৎসা

রোগীকে সারাদিনরাত মশারীর নীচে বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতে হইবে; যেন মশক তাহাকে কামড়াইয়া রোগেই বীজ চারিদিকে ছড়াইবার সুযোগ না পায়। ভাতের মণ্ড, অল্প সিদ্ধ ডিম এবং ফল ব্যতীত রোগীকে অপর কোন পথ্য দিবেন না। রোগের প্রথম অবস্থায় এক মাত্রা "ক্যাষ্টর অয়েল" বা "এপ্‌সম্ সল্ট" সেবন করাইয়া দিবেন। মাথার যন্ত্রণার জন্য মাথায় বরফ বা ঠাণ্ডা জলের পটী দিবেন। শরীরের যে অঙ্গে যন্ত্রণা আছে সেই অঙ্গে সেঁক প্রদান করিবেন।

এই রোগ হইতে রক্ষা পাইতে সর্ব্বপ্রথমে মশকের দংশন হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। শয়নকালে সর্ব্বদা মশারী ব্যবহার করিবেন, এবং ভ্রমণকালে উহা সঙ্গে লইবেন।

প্লেগ (Plague)

ইঁদুরের দ্বারা বিউবনিক প্লেগ বিস্তৃত হয়

প্লেগ ইংরেজীতে ব্লাক্‌ডেথ্ ও বিউবনিক প্লেগ নামেও অভিহিত। প্লেগ-জীবাণু নামে এক প্রকার বিশিষ্ট জীবাণু দ্বারা এই রোগ বিস্তৃত হয়। উক্ত জীবাণু প্রথমে ইঁদুরে সঞ্চারিত হইয়া প্লেগ উৎপন্ন করে এবং পরে পিশুর সহায়তার ইঁদুর হইতে মনুষ্যে এই রোগ সঞ্চারিত হয়। প্লেগ অতিশয় মারাত্মক ব্যাধি; ইহা মহামারীরূপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে, অল্পকাল মধ্যে লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের প্রাণ সংহার করিয়া থাকে।

রোগের লক্ষণ

প্লেগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিবার পরে অতি সত্বর সাধারণতঃ তিন দিনের মধ্যে রোগ প্রকাশ পায়; শীতকম্প সহকারে হঠাৎ রোগ আরম্ভ হইয়া জ্বরের তাপ অল্পক্ষণ মধ্যে ১০৩° বা ১০৪° ডিগ্রি হয়। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মাথায় যন্ত্রণা, পিঠে ও হাত পায়ে বেদনা, বমন ও উদরাময় হইয়া থাকে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চক্ষু লাল এবং মুখের ভাব ও আকৃতি অতিশয় ভয়াবহ ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ হইয়া উঠে। কখন কখন জ্বরের তাপ সহসা ১০৭. ডিগ্রি হইয়া থাকে এবং তদ্রূপ অবস্থায় রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রোগের প্রখরতা অপেক্ষাকৃত কম হইলে, জ্বর ১০৪° ডিগ্রি পরিমাণ হয়। বগল, কুচ্কি ও গলার মাংসপিণ্ডগুলি নানা আকারে ফুলিয়া উঠে, এবং বড়ই যন্ত্রণাদায়ক হয়। রোগ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে এবং প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে।

গ্রামের ইঁদুর মারিবার ফাঁদ
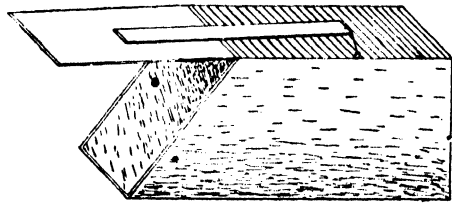
কখন কখন অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হইতে পারে। এক জাতীয় প্লেগে শরীরের চামড়ার উপর কালো কালো দাগ পড়ে; সেইরূপ অবস্থায় দুই দিনের মধ্যেই মৃত্যু হয়। নিউমোনিয়া সংযুক্ত প্লেগে ফুস্ফুস্ বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হয়, এবং দুই তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে।

প্রতীকার

এক প্রকার রস (Serum) ইন্জেক্সন্ করিয়া দিলে, প্লেগ রোগে খুব উপকার হয়, উহা প্লেগ জীবাণুর বিষ নষ্ট করিতে সাহায্য করে। সহরে প্লেগ উপস্থিত হইলেই "হেল্থ অফিসারকে" জানাইতে হইবে। প্লেগ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিকে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করিবেন।

রোগীকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখিবেন, এবং গৃহের জানালাগুলি খুলিয়া দিবেন। তাহাকে যথেষ্ট শীতল জল পান করিতে দিবেন। জ্বর কমাইবার নিমিত্ত, ৩১শ অধ্যায় বর্ণিত প্রণালী অনুযায়ী ঠাণ্ডা জল দ্বারা গা মুছাইয়া দিবেন। মাথার উপরে ঠাণ্ডা জলপটী রাখিবেন, এবং উহা বার বার শীতল জলে ভিজাইয়া লইবেন। ভাতের মণ্ড ও অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম্ব প্রভৃতি পথ্য (৪৭শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) দেওয়া যাইতে পারে।

ইঁদুরের গাত্রের পিশু
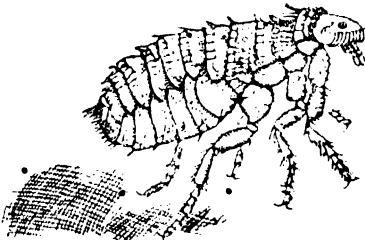
এই পিশু দ্বারা ইঁদুরের দেহ হইতে প্লেগজীবাণু মানব দেহে সংক্রমিত হয়।

রোগ নিবারণ

কলেরার ন্যায় প্লেগ নিবারণ করিতেও সাধারণের উপকারার্থে সরকারী এবং ব্যক্তিগত সাহায্য প্রয়োজন।

যে স্থানে প্লেগ মহামারীর আকার ধারণ করিয়াছে, সেই স্থানের রাজ-কর্ম্মচারী এবং জনসাধারণ সমুদয় ইঁদুর ধ্বংস করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। বহু পূর্ব্ব হইতেই জানা গিয়াছে যে মানুষের প্লেগ হইবার আগে ইঁদুরের প্লেগ হয়। ইঁদুর মরিতে আরম্ভ করিলে, উহার গাত্রের পিশুগুলি মরা ইঁদুর ছাড়িয়া মানব দেহে আশ্রয় লয়। প্লেগ রোগাক্রান্ত ইঁদুরকে দংশন করিয়া উহাদের নিজ দেহে প্লেগ জীবাণু গ্রহণ করে, এবং পরে যখন উক্ত পিশুগুলি কোন মানুষকে দংশন করে, তখন প্লেগ জীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া প্লেগ রোগ উৎপন্ন করে।

যেখানে ইঁদুর নাই, সেখানে প্লেগ নাই। ইঁদুর মারিতে পটু একদল লোকের রীতিমত ভাবে এই কাজ করা উচিত। ফাঁদ, জাতিকল, বিষ, বিড়াল, এই সকলই ইঁদুর মারিবার কার্য্যকারী উপায়। কিন্তু খাদ্য ও শয্যাদি যাহাতে ইঁদুরে পাইতে না পারে, এইরূপ স্থানে রক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকারী পন্থা। ইঁদুর খাদ্য ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। আরও যে বাড়ীতে ইঁদুর আছে সেই বাড়ীর মেঝ ও দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, নূতন করিয়া ইঁদুরে গর্ত্ত করিতে না পারে, এরূপ দেওয়াল ও মেঝ করিতে হইবে। সরকারী কর্ম্মচারিগণ সহরের বিভিন্ন অংশে ধৃত ইঁদুর পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারেন, সহরের কোন অংশে প্লেগ হইয়াছে, কোন্ অংশে হয় নাই।

প্লেগ নিবারণের নিমিত্ত এক প্রকার টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে উক্ত টীকা দেওয়া হইলে প্লেগের আশঙ্কা খুব কম, এবং প্লেগ দ্বারা আক্রান্ত হইলেও, যাহাদের টীকা হয় নাই, তাহাদের অপেক্ষা যাহাদের টীকা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা খুবই কম। এই জন্য কোন স্থানে প্লেগের আক্রমণ দেখা গেলেই বালক ও বৃদ্ধ সকলেরই উহা নিবারণের জন্য টীকা লওয়া উচিত।

ইঁদুর মরাই প্লেগের পূর্ব্ব সূচনা। এই জন্য কোন পল্লীতে অকস্মাৎ মরা ইঁদুর দেখিতে পাইলেই বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। প্রথমে স্থানীয় হেল্থ অফিসারকে ঐ সংবাদ পাঠাইবেন। তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত উহা রাখিয়া দিবেন, কিন্তু স্পর্শ করিবেন না। পরে উহার উপরে কার্ব্বলিক এ্যাসিড ছড়াইয়া দিয়া অথবা ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিয়া উহা স্থানান্তরিত করিবেন।

প্লেগ বহনকারী পিশুর দংশন হইতে রক্ষা পাইতে, যে পাড়ায় প্লেগের রোগী আছে সেই পাড়ায় সম্ভব হইলে কখনও প্রবেশ করিবেন না। প্লেগের সময়ে পিশু হইতে রক্ষা পাইতে ঘরের মেঝেতে কেরোসিন বা ফিনাইল ঢালিয়া দিবেন। দেওয়ালের নিম্ন ভাগে এবং গৃহের কোণে সাবধানে উহা

ছড়াইয়া দিবেন। ঘরের মেঝেতে ফিট্‌কিরির গুড়া ছড়াইয়া দিলেও পিশু দূরীভূত হয়।

যে বাড়ীতে প্লেগ হইয়াছে, সে বাড়ীতে যাইতে হইলে প্রথমে প্লেগের টীকা লওয়া ভাল। আরও অয়েল ক্লথের পোষাক (পা পর্য্যন্ত) পরিধান করিয়া যাওয়া ভাল, কারণ তাহা হইলে আর পিশু চামড়ার উপর কামড়াইতে পারে না।

নিউমোনিয়া সংযুক্ত প্লেগ হইলে, শুশ্রূষাকারিণী ও ঐ রোগী যে বাড়ীতে থাকিবে সেই বাড়ীর সকলেরই পাতলা কাপড় ও তূলা দ্বারা নির্ম্মিত মুখস্ পরা উচিত।

নিউমোনিয়া সংযুক্ত প্লেগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংক্রামক। নিশ্বাসের সহিত নাকের মধ্য দিয়া ইহার জীবাণু প্রবেশ করে, এই জন্যই ঐরূপ মুখস্ পরিতে হইবে।

৩৪শ অধ্যায়

বেরিবেরি

কয়েক বৎসর হইল এই রোগটী এশিয়া মহাদেশের অনেক স্থানে সাধারণ রোগ হইয়া উঠিয়াছে। এই রোগের লক্ষণগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের। এই রোগে কাহার কাহার হাত পা আংশিক ভাবে অবশ হইয়া যায়, ও চামড়া অসার হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ পায়ের নলার সম্মুখ দিকের এবং পায়ের পাতার এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগের চামড়াই ঐরূপ হয়। রোগীর পা ক্রমশঃ শুকাইয়া থাকে, এবং পায়ের ডিম চাপিয়া ধরিলে রোগী যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। পদদ্বয় আংশিকভাবে অবশ হইয়া যায় বলিয়া, রোগী টলিতে টলিতে চলে এবং শীঘ্রই হাঁপাইয়া পড়ে। কোন কোন সময়ে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অতিদ্রুত হইয়া থাকে। গলার স্বর অতিশয় ক্ষীণ হয় এবং কখনও বা একেবারে বসিয়া যায়।

কাহার কাহার বেরিবেরি হইলে তাহাদের হাত, পা, ও শরীর খুব ফুলিয়া যায়। তাহাদের নিশ্বাস লইতে খুব কষ্ট হয়। হৃৎপিণ্ড খুব দ্রুত স্পন্দিত হয়। পায়ের গুলি চাপিয়া ধরিলে তাহারা যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠে। এই দুই প্রকার বেরিবেরির কোন প্রকারেই জ্বর থাকে না; জিহ্বা পরিষ্কার থাকে, মল পাতলা হইতে পারে, বা কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিতে পারে।

শরীরের অনেকগুলি স্নায়ু স্ফীত হওয়াই বেরিবেরি। উক্ত স্নায়ু দ্বারা যে যে মাংসপেশী চালিত হয়, স্নায়ুগুলি স্ফীত হইবার ফলে সেই সেই মাংসপেশীও আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। অনুভব করিবার স্নায়ুসমূহ বর্ত্তমান থাকায়, স্ফীতির জন্য বেদনা অনুভূত হয়। ঐ স্ফীতির জন্যই রক্তবহা শিরার স্নায়ু বিকৃত হইয়া উহা হইতে রস বাহির হইয়া আইসে ও তজ্জন্য হাত, পা, ও দেহ রসে ভার হইয়া ফুলিয়া উঠে।

বেরিবেরির কারণ

কলের ছাটা চাউল যাহারা প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহার করেন, সাধারণতঃ তাহাদের মধ্যেই বিশেষভাবে বেরিবেরির প্রকোপ দেখা যায়। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে চাউলের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর ভাগ একই প্রকার দ্রব্য নহে। চাউল ছাঁটিলে উহার বহিরাবরণ দূর হইয়া যায়। চাউলের বহিরাবরণ বলিতে আমরা চাউলের খোসা বা তুষের কথা বলিতেছি

না। ধানের খোসার তলায় চাউলের উপরে যে একটী সূক্ষ্ম লাল আবরণ থাকে, আমরা তাহারই বিষয় বলিতেছি। উক্ত লাল আবরণে দেহের পুষ্টিকর অতিশয় সার পদার্থ রহিয়াছে। চাউল ছাঁটিলে উক্ত লাল রঙের বহিরাবরণ বাহির হইয়া যায়। চাউলের উক্ত লাল বহিরাবরণ অন্যান্য খাদ্যেও—যেমন, শিমের বীচিতে—পাওয়া যায়। এই জন্য ছাটা চাউল খাইলেও যাহারা মাছের সঙ্গে শিম ও বিভিন্ন শাকসব্‌জি ব্যবহার করেন, তাহারা বেরিবেরি দ্বারা আক্রান্ত হন না।

ছোট ছোট শিশুদিগেরও বেরিবেরি হয়; কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ মনিলা সহরে এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক যে সকল শিশু মারা যায়, তাহাদের মধ্যে বেরিবেরি রোগেই মারা যায় অধিক। এ কথা সত্য যে শিশুরা কলেছাটা চাউল খায় না, কিন্তু তাহাদের মায়েরা খাইয়া থাকেন। কলেছাঁটা চাউল মাতার প্রধান খাদ্য হইলে তাঁহার দুগ্ধে চাউলের উপরের লাল আবারণ জাতীয় খাদ্যের অভাব হইবে। ঐ জাতীয় খাদ্য মানব শরীর সুস্থ রাখিতে বড়ই প্রয়োজনীয়। এই জন্য যে সকল শিশু ঐরূপ দুগ্ধে পরিপুষ্ট তাহাদের শৈশব হইতেই বেরিবেরি হয়।

শিশুর বেরিবেরির লক্ষণ:—মাতৃ দুগ্ধপায়ী শিশুদিগেরই বেরিবেরি হয়। তাহাদের বয়স যখন কেবল দুইমাস সাধারণতঃ তখনই এই রোগ দেখা যায়। শিশুর বেরিবেরি হইলে তাহাকে রুগ্ন মনে হয় না; কারণ তাহার গাল দুইখানি স্ফীত থাকে, সে খুব খায়, এবং সুস্থ শিশুর মত হাসে ও খেলা করে। কিন্তু উহার নাক ও মুখ নীল হয়, শিশু অস্থির হয়, ঘুমাইতে পারে না, ও তাহার গলা বসিয়া যায়। কোন কোন অবস্থায় হঠাৎ শিশুর কাঁদিয়া উঠাই, ইহার প্রথম লক্ষণ হয়, এবং যে পর্য্যন্ত না তড়কা হয়, বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যায়, সে পর্যান্ত ক্রন্দনের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। বেরিবেরি হইলে শিশুদের শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হয়। শিশু আক্ষেপ করে ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, মুখমণ্ডল লাল বর্ণ হয়, এবং নিশ্বাস ও নাড়ী দ্রুত বহিতে থাকে। আদৌ জ্বর থাকে না। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, শিশুর মাতা কেবল কলেছাঁটা চাউল খাইয়া থাকেন।

নিবারণের উপায়

উপরে যাহা যাহা বলা হইল, ঐ সমস্ত বিষয় হইতেই বেরিবেরি নিবারণের উপায় সম্বন্ধে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কলেছাঁটা চাউল না খাইয়া সাধারণ আ-ছাঁটা বা ঢেঁকিছাঁটা চাউল খাইলেই হইল। খাওয়া-পরার ব্যয় না বাড়াইয়াই উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাওয়া যায়। কলে-

ছাঁটা, আ-ছাঁটা বা ঢেঁকিছাঁটা চাউলে সমান ভাবেই ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। চাউলের লাল অংশ ছাঁটিয়া ফেলা আরম্ভ না হইলে, এই দেশে কখনও বেরিবেরির উৎপাত দেখা যাইত না।

যাহারা বেরিবেরির কারণ কি তাহা বুঝেন, তাঁহাদের অপরকে কলেছাঁটা চাউল খাওয়ার কি বিপদ, তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কলে-ছাঁটা চাউল অপেক্ষা আ-ছাঁটা বা ঢেঁকিছাঁটা চাউল সকল অংশে ভাল বলিয়া আদর্শ দেখাইবার জন্য সকলেরই আ-ছাঁটা বা ঢেঁকিছাঁটা চাউল খাওয়া উচিত। সকলেরই বুঝা প্রয়োজন যে কেবল মাছ ও ভাতের উপরে নির্ভর না করিয়া, ডাল ও শুঁটি প্রভৃতিও ব্যবহার করা আবশ্যক। উহাও খাদ্যের প্রয়োজনীয় অংশ।

প্রতীকার

রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ না করিলে, উপরে লিখিত নিবারণের উপায় অবলম্বন করিলেই আরোগ্য লাভ হইবে। রোগের কঠিন অবস্থায় একটী ঔষধের ব্যবহার করিতে হইবে; উক্ত ঔষধ চাউলের বহিরাবরণের সারাংশ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

টীকা:—বেরিবেরির চিকিৎসা—নিম্নে বেরিবেরির আরও এক প্রকার চিকিৎসা প্রণালী প্রদত্ত হইল। বেরিবেরির প্রথম লক্ষণগুলি দেখিয়াই বেরিবেরি হইয়াছে বুঝিতে পারা আবশ্যক, কারণ রোগের প্রথমেই চিকিৎসা আরম্ভ হইলে ফল ভাল হয়, এবং রোগীও আরোগ্যলাভ করে। বিশ্রাম, মর্দ্দন, উষ্ণপাদমজ্জন, পেটে পর্য্যায়ক্রমে উষ্ণ ও শীতল সেঁক প্রভৃতি দ্বারা বিভিন্ন উপসর্গ দূর করাই এই প্রণালীর প্রধান কার্য্য। ক্যাষ্টর অয়েল বা কিছু সেলাইন্ ল্যাক্স্এটিভ ব্যবহার করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে হইবে। মানবদেহের পুষ্টির জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, সমস্ত প্রদান করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যে দ্রব্য মিশাইলে তালের রস প্রভৃতি গাঁজিয়া উঠে (Yeast) পথ্যের সহিত তাহা থাকা প্রয়োজন। উহার ছোট এক চাম্‌চে বা বড় এক চাম্‌চে ফুটন্ত দুগ্ধে দিয়া সুস্বাদু করিবার জন্য কতকটা সর দিয়া নাড়িয়া আহারের শেষে খাইতে হইবে। নিম্নলিখিত খাদ্য বেরিবেরি রোগীর পক্ষে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। নরম আধ সিদ্ধ ডিম, টাট্‌কা দুধ, শুঁটি, মটরশুঁটি, শিম, মসুর ডাল, লেবুর রস, আখ্‌রোট, এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংগৃহীত ভিটামিন। রোগীর সকল লক্ষণ দূরীভূত হইলেও কয়েক সপ্তাহ খাদ্য সম্বন্ধে ঐরূপ সতর্ক হইতে হইবে,—প্রকাশক।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান

ভারতবর্ষে যে সকল ক্যালরিক ও ভাইটামিন্ সংযুক্ত সাধারণ খাদ্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে প্রতি আউন্সে গ্রাম্ হিসাবে সেই সকল খাদ্যের প্রোটিন্, তৈল ও চর্ব্বি এবং শ্বেতসার ও শর্করার পরিমাণ প্রদর্শিত হইল।

খাদ্য দ্রব্যের নাম	প্রোটিন	তৈল ও চর্ব্বি	শ্বেতসার ও শর্করা	ক্যালরিক	ভাইটামিন্ ক	খ	গ	ঘ
দুগ্ধ ও দুগ্ধ জাত খাদ্য								
গো-দুগ্ধ	০·৯৪	১·০২	১·৩৬	১৮	xxx	xx	x	x
মাতৃ-দুগ্ধ	০·৪২	১·৫০	০·৭৫	১৮	x to xx	x	x	
ননী	০·৭০	৫·২৪	১·২৬	৫৫	xxx	x		x
পনির	৭·৩৫	৮·৮৮	০·৫০	১১১	xx	V.L		
ঘোল	০·৯৬	০·০৮	১·৪৪	১০	x	x	x	
দধি	১·৪০	১·০০	০·৮০	১৮	xx	x	x	
ছাগ-দুগ্ধ	১·২১	১·১৩	১·২১	২০	xxx	x	x	x
মহিষ-দুগ্ধ	১·৩৫	২·১৮	১·২৪	৩০	xxx	x	x	x
ডিম্ব	৩·৭৯	২·৯১		৪২	xx	xxx		x
মাখন ও ঘি		২৩·১০		২০৮	xxx			x
উদ্ভিজ্জ-তৈল								
নারিকেল তৈল		২৮·০০		২৫২	x	0	0	VL
জিন্জেলি তৈল		২৮·০০		২৫২	V.L	0	0	0
মসিনার তৈল		২৮·০০		২৫২	V.L	0	0	
চিনেবাদাম তৈল		২৮·০০		২৫২	V.L	0	0	V.L
জলপাই তৈল		২৮·০০		২৫২	V.L	0	0	
কার্পাস তৈল		২৮·০০		২৫২	V.L	c	0	
শর্করা ও শ্বেতসার								
চিনি			২৬·৮৯	১০৮	0	0	0	
গুড়	০·০৮		২৫·০০	১০০	0	V.L	0	
মধু	০·১১		২০·২১	৮১	V.L	V.L	0	
সাগু	২·১৮	০·০৪	২২·০০	৯৭	0	0	0	
ইক্ষু	০·৪২	০·১৬	৬·২০	২৮		x	x	
ট্যাপিওকা	০·০৫	০·০১	২৪·৮৩	১০০	0	0	0	

খাদ্য দ্রব্যের নাম	প্রোটিন	তৈল ও চর্ব্বি	শ্বেতসার ও শর্করা	ক্যালরিক	ভাইটামিন্ ক	খ	গ	ঘ
শস্য ও খাদ্যাদি								
আটা	৩·৯০	০·৫৪	২০·৩৫	১০২	x	xx	0	
ময়দা	৩·১৪	০·৩৭	২১·৫৪	১০২	0	V.L	0	
আ-ছাঁটা চাউল	১·৩০	০·০৮৫	২২·৩০	৯৯	V.L	x	0	
ছাঁটা চাউল	১·৭৯	০·১৩	২৬·০৯	১১৩	0	V.L	0	
বাজরি	২·৭৮	০·৪৬	২৩·৩৫	১০৯	x to xx	xx	0	
কাম্বু (Cambu)	৩·৬৪	১·৫৮	১৯·৪০	১০৫	x	xx	0	
ছোলাম	২·৯০	১·১৭	১৯·৭০	১০১	x	xx	0	
যই	৩·৩৭	২·৪৩	১৯·৮১	১১৫	x	xx	0	
ভুট্টা	২·১৩	০·৪৮	২০.৮০	৯৬	xx	xx	0	
যব	২·০০	০·৩৩	১৪·৮০	৭০	0	x	0	
সুজী	৪·২০	০·৬৮	১৪·২০	৮০	x	xxx	0	
চাউলের কুঁরা					x	xx	0	
ডাল, মটর ও শিম								
টাটকা শিম	২·৬৬	০·১১	৬·৪৫	৩৭	x	xx	xx	
" ফরাসী শিম	০·৫৪	০·০৩	১·৩৬	৮	x	xx	xx	
ভাজা কলাই	১·৮৫	০·১৭	৪·৭৫	২৮	x	xx	0	
ডাল	৬·৫০	০·৯৯	১৬·২০	১০০	x	xx	0	
ছোলা	৫·৭০	১·৩০	১৫·৩০	৯৬	x	xx	0	
ছোয়া শিম	৯·৬০	৪·৭০	২·৫০	১১৯	x	xx	0	
বাদাম ও বীজ								
নারিকেল	১·৬১	১৪·৩১	৭·৯০	১৬৭	x	xx	0	
চিনেবাদাম	৭·৩০	১০·৯২	৬·৯০	১৫৫	V.L	xx	0	
আখরোট	৩·৮৫	১৯·৯২	৩·৯৬	২১১	V.L	xxx	0	
তিসি	৬·৪০	৯·৫০	৭·৬০	১৪২	x to xx	xx	0	
মূল ও শিকড়জাত								
গোল আলু	০·৭০	০·০৪	৮·১৫	৩৬	V.L	x	x to xx	
বিট	০·৩৪	০·০৩	১·৭৫	৯	V.L	x	x	

খাদ্য দ্রব্যের নাম	প্রোটিন	তৈল ও চর্ব্বি	শ্বেতসার ও শর্করা	ক্যালরিক	ভাইটামিন্ ক	খ	গ	ঘ
ছিপার	০·১৭	০·০৩	১·০৭	৫		xxx	xx	
পেঁয়াজ	০·৩৭	০·০৩	৩·০৬	১২	V.L	xx	x	
রশুন	১·৯২	০·০৩	৭·৯০	৪০	x	x	xx	
ক্যারোট্	০·২৫	০·০৩	২·২৬	১০	x to xx	xx	x to xx	
পলাণ্ডু শাক	০·৭১	০·০৩	২·৬৩	১৪	x	x	xx	
মূলা	০·২৮	০·০৩	০·৯৬	৫	V.L	x	x	
ওল	০·৩৪	০·০৩	১·২৫	৭	V.L	xx	x	
মেটে আলু	০·৫১	০·০৬	৬·৩১	২৮		x	x	
টাট্কা মূল	০·৫০	০·০৬	৬·৩০	২৮		x	x	
সবুজ পত্রজ								
বাঁধা কপি	০·৩৯	০·০৩	১·২৭	৭	xxx	xx	xxx	
লেটিউস্	০·৩১	০·০৬	০·৫৪	৪	xx	xxx	xx	
সোয়া	০·৫১	০·০৬	০·৮২	৬	xxx	xxx	xxx	
ওলকপি	১·৯১	০·১৭	১·৭৮	১৩	xxx	xxx	xx	
অন্যান্য শাকসব্জি								
টক্ বেগুন	০·২০	০·০৩	১·২৭	৬	xx	xxx	xxx	
শশা	০·১৭	০·০২	০·৫৭	৩		x	xx	
লাউ	০·২৮	০·০০	০·৪৭	৭		x	x	
বেগুন	০·৩৪	০·০৯	১·৪৪	৮		x	x	
ফুলকপি	০·৫৪	০·০৬	১·৬৭	৯	x	x	x	
ঢেঁরশ	০·৫৭	০·৩৩	১·৭০	১২		x	x	
এস্প্যারাগাস্	০·৬৮	১·০০	০·৬৬	১৪	x	xxx	x	
পটল	০·২১		০·৩৬	২		x	x	
টাট্কা কোমল ফল								
আতা	০·০৯	০·০৬	৩·৫৪	১৫		x	x	
কলা	০·৪৫	০·০৩	২·২৬	১১	V.L.	x	x	
আঙুর	৯·১৭	০·০৩	৩·৯৩	১৭		x	V.L.	
লেবু	০·১৪	০·১৪	০·৮৮	৫		x	xxx	

খাদ্য দ্রব্যের নাম	প্রোটিন	তৈল ও চর্ব্বি	শ্বেতসার ও শর্করা	ক্যালরিক	ভাইটামিন্ ক	খ	গ	ঘ
কমলালেবু	০·২৫	০·০৩	২·৬৯	১২	x	x	xxx	
দারিম্ব	০·১৮		০·১৯	২		x	x	
আনারস	০·১১	০·০৯	২·৭৫	১২			xx	
তরমুজ	০·১১	০·০৬	১·৯০	৯			x	
পেঁপে	০·১৬		০·১০	১	x	x	xx	
লিচু	০·৮০	০·০৭	১·৯০	১২		x	xx	
আম	০·০৪	০·২২	৫·২০	২৩	x		xx	
পেয়ারা	০·৩৭	০·২০	২·২৭	১২		x	x	
শুকান ফল								
খেঁজুর	০·৪৫	০·০৩	১৯·৭৩	৮১		x	0	
ডুমুর	০·৫৬	০·১৪	১৫·৯৯	৬৭		x	0	
কুল	০·৮৪	০·০৯	১১·৪৩	৫০		x	0	
কিস্মিস্	০·৬২	০·০৯	১৭·৩২	৭৩		x	0	
তেঁতুল	০·৩৯		৮·৮৯	৩৭		x	x:	

তিনটী (xxx) অর্থে "অধিক মাত্রা", দুইটী (xx) অর্থে "পরিমিত মাত্রা", একটী (x) অর্থে "অল্প মাত্রা", শূন্য (0) অর্থে "কিছুই নাই", এবং (V.L) অর্থে "অতি সামান্য মাত্রা" বুঝায়।

ভাইটামিনের ঘরে যেখানে কিছুই লিখিত হয় নাই, সেখানে এই বুঝিতে হইবে যে, ভাইটামিনের মাত্রা পরিমিত করা হয় নাই। ক্যালরিকের মাত্রা পূর্ণ সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে। এক আউন্স সমান ২৮·৩ গ্রাম্।

৩৫শ অধ্যায়

অন্ত্রমধ্যস্থ পরাঙ্গপুষ্ট কীট ও কৃমি

মানব দেহে নানা প্রকার কীট বাস করিতে পারে। তন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষ অনিষ্টকর; কতকগুলি তত অনিষ্টকর নহে। এই অধ্যায়ে সাধারণ কয়েকটার বিষয় আলোচিত হইবে।

গোলাকার কৃমি (Round worms)

ইহা গোল কৃমি বিশেষ। ইহার দুই দিক সরু এবং দৈর্ঘ্যে চারি হইতে ছয় ইঞ্চি। সাধারণতঃ ইহারা ক্ষুদ্র অন্ত্রে থাকে বটে কিন্তু পাকস্থলীতেও উহারা প্রবেশ করিতে পারে—কখনও উহা বমনের সহিত বাহির হয়, কখনও গলা বাহিয়া উঠে। কখনও হয়ত শ্বাসনালীতে প্রবেশ করিয়া শিশুদিগের দম আটকাইয়া দেয়। শিশুদিগের পেটে অল্প দুই একটা কৃমি থাকিলে কোন লক্ষণ প্রকাশ না পাইতে পারে। ক্ষুধা হ্রাস, এবং বমনোদ্বেগ শিশুদিগের কৃমির সাধারণ লক্ষণ। কোন কোন সময়ে শিশুগণ তলপেটে বেদনার কথা বলে। শিশুদের নাক চুলকান এবং দাঁত কড়মড়—কৃমির লক্ষণ। অণুবীক্ষণ দ্বারা শিশুর মল পরীক্ষা করিলে, শিশুর পেটে কৃমি আছে কিনা চিকিৎসক তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন।

শিশুদিগের কৃমি নিবারণ করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে; দুপুরবেলা উহাকে একমাত্রা, ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়াইয়া দিউন; ঐ দিবস সন্ধ্যা বেলা অর্দ্ধ গ্রেণ স্যাণ্টোনিন্ সেবন করিতে দিবেন। শিশু যাহাতে সহজে খায়, এই জন্য উহাতে একটু চিনি মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে তৎপর দিন সকাল বেলা পুনরায় অর্দ্ধ গ্রেণ, এবং দুপুরে আবার অর্দ্ধ গ্রেণ "স্যাণ্টোনিন্" (Santonin) দিবেন। শেষবারে "স্যাণ্টোনিন্" দিবার দুই ঘণ্টা পরে পুনরায় একমাত্রা ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়াইবেন। যে দুই দিন উপরি-উক্ত প্রণালীতে ঔষধ খাওয়ান হইবে, সেই দুই দিন শিশুকে ভাতের মণ্ড ও ডিম ব্যতীত অপর কোন শাকসব্জি খাইতে দিবেন না। আহার সংযত না করিলে স্যাণ্টোনিন্ দ্বারা পেটের সমস্ত কৃমি বিনষ্ট করা অসম্ভব।

কৃমির উপদ্রব বিশেষতঃ শিশুগণের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য তাহাদিগকে প্রতিবৎসর দুই একবার উপরি-উক্ত প্রণালীতে স্যাণ্টোনিন্ প্রদান

করা কর্ত্তব্য। কারণ পেটে বেদনা বা বমনোদ্বেগ না থাকিলেও, অন্ত্রমধ্যস্থ সামান্য দুই একটা কৃমি শিশুর পরিপাক শক্তির ও দেহে খাদ্যের শোষণ ক্রিয়ার বাধা জন্মায়, এবং এইরূপে উহার স্বাস্থ্যলাভ ও পুষ্টিসাধন সম্ভব হয় না।

স্যাণ্টোনিন্ বিষাক্ত ঔষধ, তাই শিশুদিগকে অতিরিক্ত মাত্রায় দিবেন না। স্যাণ্টোনিন্ সেবন করিবার কালে, প্রস্রাবের বর্ণ হলদে হয়, এবং সকল বস্তুই হলদে দেখায়, ইহাতে চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই, কেননা অল্পকাল মধ্যেই উহা কাটিয়া যায়।

গোল কৃমির আক্রমণ প্রতিরোধ

অনেকের এইরূপ ভুল ধারণা আছে যে, 'গোল কৃমি-গুলি আপনা হইতেই অন্ত্রে জন্মে। কৃমির অদৃশ্য ডিম্বাণু খাদ্য ও পানীয়ের সহিত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। পেটের মধ্যস্থ কৃমিকীটগুলি প্রচুর ডিম পাড়িয়া থাকে, এবং উহারা মলের সহিত বহির্গত হয়। মলের সহিত নিঃসৃত ডিম্বগুলি, মাঠে, জলাশয়ে, শস্য ও সব্জিক্ষেত্রে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।
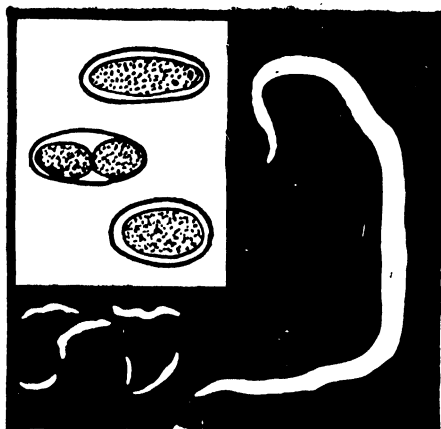
অন্ত্রমধ্যস্থ পরাঙ্গপুষ্ট কীট ও কৃমি

কৃমি পরিহার করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা সিদ্ধ জল শীতল করিয়া পান করা কর্ত্তব্য। বাজার হইতে ক্রীত শাকসব্জি ভালরূপে পাক করিয়া ভোজন করিবেন। ফলগুলি ফুটন্ত জলে কিছুক্ষণ ফেলিয়া রাখিবার পর খোসা ছাড়াইয়া খাইবেন। শিশুকে মুখে আঙ্গুল দিতে দিবেন না, কারণ তাহাদের ময়লা হাতে ধূলির সহিত অনেক কৃমির ডিম ও নানাপ্রকার রোগের জীবাণু থাকিতে পারে। শিশুরা যাহা মুখে দিতে চাহে, তাহাদের প্রায় সকল জিনিষেই কৃমির ডিম্ব থাকিতে পারে।

কুকুর ও বিড়ালের উদরে সর্ব্বপ্রকার কৃমি দেখিতে পাওয়া যায়। যখন কোন কুকুর বা বিড়াল, কোন শিশুর হাত চাটে, তখন ঐ কৃমির ডিম্ব শিশুর হাতে লাগিয়া থাকে। পরে ঐ হাত মুখে দিলে বা উহার দ্বারা কোন খাদ্য

গ্রহণ করিলে, কৃমির ডিম্ব শিশুর মুখে প্রবেশ করে। এইজন্য কুকুর বিড়ালকে গৃহে আসিতে দেওয়া এবং কোন মতে উহাদিগকে শিশুর হাত, পা চাটিতে দেওয়া উচিত নহে।

হুক্‌ওয়াম বা বক্রকৃমি (Hookworm disease)

কোন কোন স্থানে প্রতি দশ জন লোকের মধ্যে নয় জন বক্রকৃমি দ্বারা আক্রান্ত। এই রোগের প্রতীকার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, অথচ ইহা অতিশয় ব্যাপক। পূর্ব্বে কোন কোন স্থানের লোককে স্বভাবতঃই অলস এবং অকর্ম্মণ্য বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু পরে দেখা গেল যে, বক্রকীট দ্বারা আক্রান্ত বলিয়াই তাহারা দুর্ব্বল এবং ঐরূপ কর্ম্ম বিমুখ; আবার উক্ত রোগ প্রতীকারের এবং নিবারণের বন্দোবস্ত করিতেই দেখা গেল যে, যাহাদিগকে পূর্ব্বে অলস ও উদ্যমহীন বলিয়া মনে হইত, তাহারা পুনরায় বেশ পরিশ্রমী ও উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে।

বক্রকৃমি ক্ষুদ্র, গোলাকার ও শ্বেতবর্ণ। উহার দৈর্ঘ্য এক তৃতীয়াংশ ইঞ্চি হইতে অর্দ্ধ ইঞ্চি পর্য্যন্ত এবং এক গাছা সাধারণ সেলাই করিবার সূতার ন্যায় মোটা। এক গাছা সাদা সূতা লইয়া, আধ ইঞ্চি লম্বা এক এক টুকরা করিয়া কাটিলে, ঐ টুকরা গুলি দেখিতে বক্র কৃমির ন্যায় হইবে। কি শিশু, কি বয়স্ক, সকলের শরীরেই এই ক্ষুদ্র কৃমিগুলি প্রবেশ করে। কখন কখন উহারা সংখ্যায় খুব কম থাকে, কেবল পনের বিশটী দেখা যায়। আবার কখনও বা একই সময়ে কাহার অন্ত্রে কয়েক হাজারও পাওয়া যায়। উহারা পেটের নাড়ীর উপরিস্থ সূক্ষ্ম আবরণীতে লাগিয়া থাকে, এবং শরীরের রক্ত চুষিয়া লয়। দেহের রক্ত চুষিয়া লইয়াই উহারা নিবৃত্ত হয় না; কখন কখন পেটে এইরূপ ক্ষতের সৃষ্টি করে যে, সর্ব্বদাই তাহা হইতে রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে। এইরূপ সর্ব্বদা রক্তক্ষরণ, এবং তৎসঙ্গে বক্রকৃমি হইতে উৎপন্ন বিষ মানুষকে ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও রক্তহীন করিয়া ফেলে। তাহার জীবনীশক্তি এত কমিয়া যায় যে, অন্যান্য ব্যাধি বিশেষতঃ ক্ষয় রোগ সহজেই সেই ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে পারে। শিশুগণ বক্রকৃমি দ্বারা আক্রান্ত হইলে পাণ্ডু বর্ণ ও ক্ষুদ্রকায় হইয়া পড়ে। তাহাদের শারীরিক ও মানসিক উভয়ের বৃদ্ধি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া যায়। শারীরিক বর্দ্ধন এতদূর হ্রাস পায় যে ১৮ কি ২০ বৎসরের যুবককে, ১০ কি ১২ বৎসরের শিশুর ন্যায় দেখায়। কোন বালক বক্রকৃমি দ্বারা অতি মাত্রায় আক্রান্ত হইলে, সে লেখাপড়ায়ও পিছনে পড়িয়া যায়।

বক্রকৃমি জনিত ব্যাধির সুস্পষ্ট লক্ষণ

শরীরের চর্ম্মের পাণ্ডুরতা, অলসতা, পাকস্থলীতে মাঝে মাঝে বেদনা, মানসিক জড়তা, মাটী বা চূণ খাইবার কুপ্রবৃত্তি প্রভৃতি কতিপয় লক্ষণ দ্বারা

কোন শিশু বা বয়স্ক ব্যক্তি বাস্তবিক বক্রকৃমি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে কিনা, বুঝিতে পারা যাইবে।

কোন চিকিৎসক অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পীড়িত ব্যক্তির মল পরীক্ষা করিলে, বক্রকৃমি হইয়াছে কিনা নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিবেন।

পায়ের তলা ও পায়ের অঙ্গুলির মধ্যভাগ চুলকান এই রোগের আর একটী লক্ষণ; পায়ের চামড়া দিয়া শরীরের মধ্যে যখন বক্রকৃমি প্রবিষ্ট হয়, তখন ঐরূপ চুলকানি হইয়া থাকে।

বক্রকৃমির বিস্তার ও উহার নিবারণ

বক্রকৃমি অন্ত্র মধ্যে থাকিয়া অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করে। মলের সহিত উহারা পড়িয়া যায়, এবং যে স্থানে মল নিক্ষিপ্ত হয়, সেই স্থানে উহারা ছড়াইয়া পড়ে। তথায় ডিম্বগুলি বড় হইতে থাকে, এবং দশ দিনের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র কীটের আকারে পরিণত হয়। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট মাঠে, বাগানে ও গৃহ প্রাঙ্গনে ছড়াইয়া পড়ে। উহারা শাকসব্জি ও জলের মধ্যেও থাকিতে পারে। কাঁচা কোন শাকসব্জি খাইলে বা অসিদ্ধ জল পান করিলে সেই সঙ্গে উহারা শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। অধিকাংশ লোকই নগ্নপদে চলিবার নিমিত্ত উহা দ্বারা আক্রান্ত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্রকৃমি কীট মাটী হইতে হাতে এবং পায়ে ও নিতম্বের অনাবৃত্ত অংশে লাগিয়া চামড়া ভেদ করিয়া শরীরে প্রবেশ করে। চামড়ার মধ্যে একবার পথ করিয়া লইতে পারিলে উহারা অন্ত্রে না পৌঁছিয়া বিরত হয় না; তথায় অন্ত্রের সূক্ষ্ম আবরণী কামড়াইয়া থাকে, এবং রক্ত চুষিয়া লয়।

এই রোগ নিবারণ কল্পে সর্ব্বপ্রথমে মল দ্বারা মাটী দূষিত করা বন্ধ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে পৃথক শৌচাগার নির্ম্মাণ করিয়া উহা ব্যবহার করিতে হইবে। সাধারণতঃ যাহারা বক্রকৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহারা যদি মলমূত্র দ্বারা জমি দূষিত না করিয়া শৌচাগার ব্যবহার করে, তবে উক্ত ব্যাধি সহজেই সম্পূর্ণ দূরীভূত হইতে পারে। যতদিন লোকে মাটিতে এবং এরূপ পায়খানায় মলত্যাগ করিবে যেখান হইতে বৃষ্টি, পক্ষী, শূকর, মাছি, ও মুরগী প্রভৃতি দ্বারা সহজেই ঐ মল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে, ততদিন এ রোগ নিবারণ করা যাইবে না।

শৌচাগারে এরূপ বাল্তি ব্যবহার করিবেন, যাহা ঢাকিয়া রাখা সম্ভব হয়। উক্ত বাল্তি প্রতিদিন পরিষ্কার করিতে হইবে। বাল্তির ময়লা কোথায়ও মাটির উপরে না ঢালিয়া মাটির নীচে গর্ত্ত করিয়া পুঁতিয়া রাখিবেন

যদি শৌচাগার প্রস্তুত করা এবং যাহাতে মলে মাছি বসিতে না পারে ময়লার পাত্র এরূপ করা সম্ভব না হয়, তবে মাটিতে প্রথমে একটী গর্ত্ত করিবেন। তারপরে একটী বড় রকমের কাঠের বাক্স সংগ্রহ করিয়া উহার তলদেশে একটী বড় ছিদ্র করিবেন, এবং বাক্সটী গর্ত্তের উপরে উল্টাইয়া রাখিবেন, এবং বাক্সের নীচে চারিদিকে মাটি দিয়া ভরাট করিয়া সমস্ত ফাঁক বন্ধ করিয়া দিবেন যেন এরূপ কোন ফাঁটাল না থাকে যাহার মধ্য দিয়া মাছি প্রভৃতি প্রবেশ করিতে পারে। বাক্সে যে বৃহৎ ছিদ্র করা হইয়াছে, তাহা ঢাকিয়া রাখিবার উপযোগী একখানি তক্তা প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন, যেন মলত্যাগ করিবার পরেই উহা ঢাকিয়া ফেলা যায়। কিছুকাল পরে বাক্সটী অন্যত্র সরাইয়া গর্ত্তটা মাটিদ্বারা পূর্ণ করিবেন। এই প্রকারে পায়খানার বন্দোবস্ত করিলে, মলের উপরে মাছি বসিতে পারিবে না, এবং উহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে পারিবে না।

ক্রমাগত ছয়মাস কি তদপেক্ষাও দীর্ঘকাল ধরিয়া বক্রকৃমিগুলি মাটিতে জীবিত থাকিতে পারে। এই জন্য বাহিরে যে স্থানে কোন সময়ে মল নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ স্থলে বৎসরকাল মধ্যে নগ্ন পদে যাওয়া উচিত নহে।

বক্রকৃমির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা সকলের পক্ষেই অতি সহজ; কখনও নগ্ন পদে বাহির না হওয়া, খালি হাতে মাটি খনন না করা, অপরিষ্কৃত জল পান না করা, অথবা উত্তমরূপে সিদ্ধ জলে ধৌত না করিয়া কোন প্রকার শাক-সব্জি না খাওয়া—এই গুলিই সহজ পন্থা।

শিশুগণ উলঙ্গাবস্থায় অথবা নিতম্ব অনাবৃত রাখিয়া মাটিতে বসিলে বক্রকৃমি দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে।

প্রতীকার

"এপ্‌সম্ সল্ট" এবং "থাইমল্" (Thymol) (ক্যাপ্‌সুলে পুরিয়া) দ্বারা বক্রকৃমির চিকিৎসা করিতে হয়। এপ্‌সম্ সল্ট্ দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়; তাহা হইলে থাইমল্ দ্বারা সহজেই কৃমি বিনষ্ট হইতে পারে। থাইমল্ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বরাত্রে, রোগী অতি সামান্য পরিমাণ খাদ্য খাইবেন। উক্ত সন্ধ্যায় এক মাত্রা এপ্‌সম্ সল্ট খাইবেন; পর দিন সকালে মলত্যাগ হইবার পর অর্দ্ধমাত্রা থাইমল্ গ্রহণ করিবেন। শেষবার থাইমল গ্রহণের দুই ঘণ্টা পরে আর একমাত্রা এপ্‌সম্ সল্ট খাইবেন। থাইমলের সাহায্যে যে সমস্ত বক্রকৃমি অন্ত্রের আবরণী হইতে স্থানচ্যুত হইয়াছে সেইগুলি শেষ মাত্রা এপ্‌সম্ সল্ট দ্বারা বিদূরিত হইবে। প্রত্যেক মাত্রা থাইমল্ গ্রহণের পরে অন্ততঃ আধ ঘণ্টাকাল রোগী ডান কাৎ হইয়া শয়ন করিবেন। যে দিন "থাইমল্" দেওয়া যাইবে, সেই দিন শেষ মাত্রা "এপ্‌সম্ সল্টের" ভালরূপ ক্রিয়া

না দেখিয়া কোন খাদ্য গ্রহণ করিবেন না। সামান্য জল পান করা যাইতে পারে। যে কোন আকারেই হউক সুরা, মাংস বা তৈলাক্ত বস্তু গ্রহণ করিলে, থাইমল্ বিষবৎ কার্য্য করিবে। এই জন্য ঐ সমুদয় পদার্থ ত্যাগ করিবেন।

থাইমল্ উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া ক্যাপ্সুলে পুরিয়া খাইতে হয়।

একমাত্রা থাইমল্ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর গ্রহণ করিতে হইবে, বিভিন্ন বয়সে উহার মাত্রা এইরূপ :—

১	হইতে	৫	বৎসর	বয়সে	পূর্ণমাত্রা	৭॥৹	গ্রেণ
৫	„	১০	,,	,,	„	১৫	„
১০	„	১৫	,,	,,	„	৩০	,,
১৫	„	২০	,,	,,	„	৪৫	,,
২০	ও	তদূর্দ্ধ	,,	,,	„	৬০	,,

মলের সঙ্গে কৃমি কীট বাহির হইলে, একখণ্ড পাতলা নেকড়ায় মল বাঁধিয়া লইয়া ধৌত করিলে ও ছাঁকিয়া দেখিলে ঐ কৃমি দেখা যাইবে।

বক্রকৃমি চিকিৎসার আর একটী উপায় আছে; পনের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রোগীকে তাহার যত বৎসর বয়স তত ফোঁটা করিয়া "চিনোপোডিয়াম্" (Chenopodium) খাইতে দিবেন। বয়স্ক রোগীকে উহার পাঁচ ফোঁটা এক চাম্‌চে চিনির সহিত মিশাইয়া দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর তিনবার খাইতে দিবেন। এই ঔষধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্ব দিবস অপরাহ্ণে রোগীকে এক মাত্রা "এপ্সম্ সল্ট" দেওয়া আবশ্যক; তারপর ঔষধ ব্যবহারের দিন শেষবার "চিনোপোডিয়াম্" দিবার দুই ঘণ্টা পরে আর এক মাত্রা "এপ্সম্ সল্ট" দিবেন।*

ক্ষুদ্র কৃমি

ক্ষুদ্র কৃমিগুলি সুতার ন্যায় সূক্ষ্ম, এবং শ্বেত বর্ণ, ও এক ইঞ্চির এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ লম্বা। উহারা সাধারণতঃ তলপেটের নিম্নাংশে থাকিয়া, গুহ্যদ্বার ও উহার চারি পার্শ্বে চুলকানি ও উত্তেজনা উৎপন্ন করে। মলের সহিত উহারা বহির্গত হইয়া যায়। অনেক সময়ে উহারা আপনা আপনি মলদ্বারের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া বস্ত্রাদিতে লাগিয়া থাকে। এই প্রকারে উহারা বালিকাদিগের যোনিপথেও প্রবেশ করে, এবং তন্নিমিত্ত চুলকানি ও যোনিদ্বার

* পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে ৪৫ ফোঁটা "কার্ব্বণ টেট্রাক্লোরাইড্" খালিপেটে ক্যাপ্সুলে করিয়া কেবল একমাত্রা দিতে হইবে। ইহা উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ চিকিৎসা।

হইতে জলীয় পদার্থ নিঃসৃত হইতে থাকে। সাধারণতঃ নোংরা ও রুগ্ন বালক বালিকাদিগকে এই কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

প্রতীকার

উক্ত ক্ষুদ্র কৃমি বিনাশ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে শিশুর খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শুধু পরিচ্ছন্ন ও পুষ্টিকর খাদ্যই খাইতে দিবেন। আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত অপর কোন সময়ে কিছুই খাইতে দিবেন না।

রোগীকে অল্প এক মাত্রা "ক্যাষ্টর অয়েল" খাইতে দিবার পরে, কুড়ি গ্রেণ কুইনিন্ মিশ্রিত এক পোয়া পরিমাণ উষ্ণ জল পেটের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। কুইনিনের পরিবর্ত্তে তিন চাম্‌চে লবণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। উক্ত জল পেটের মধ্যে একটু বেশীক্ষণ ধারণ করিতে পারিলে ভাল হয়। এই প্রকারে এক সপ্তাহ ধরিয়া একদিন অন্তর একদিন রাত্রিকালে, কুইনিন্ বা লবণ মিশ্রিত জল প্রয়োগ করিবেন। উপরি-উক্ত প্রণালী দ্বারা উপকার না হইলে, "কোয়াশিয়া" ভিজান অন্তঃপ্রবিষ্ট করাইয়া দিবেন। ছোট একবাটি পরিমাণ কোয়াশিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লইয়া এক পোয়া আন্দাজ জলে বারঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবেন। পরে ঐ জল ছাঁকিয়া লইয়া পেটের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবেন।

চুলকানি নিবারণের জন্য দুই চাম্‌চে "ভেস্‌লিনের" সহিত পাঁচ ফোঁটা কার্ব্বলিক এ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া মলদ্বারের চারিদিকে প্রয়োগ করিবেন।

শিশু পুনঃ পুনঃ মলদ্বার চুলকাইতে বা ঘষিতে থাকিলে, তাহার আঙ্গুলে ও নখে কৃমির ডিম্বাণুগুলি লাগিবার সম্ভাবনা। এই জন্য কৃমি রোগ দ্বারা আক্রান্ত শিশুর হস্তদ্বয় বারংবার ধৌত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আঙ্গুলের নখগুলি খাট করিয়া কাটিয়া রাখিবেন। শিশুর নিতম্ব (পাছা) প্রতিদিন ধৌত করিতে হইবে। ক্ষুদ্র কৃমির পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইতে শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য এই নিয়মগুলি পালন করা নিতান্ত আবশ্যক।

ফিতাকৃমি বা পটিকৃমি (Tape worm)

ফিতা কৃমিগুলি লম্বা ও সরু; উহারা প্রায় দশ হইতে বিশ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। যাহারা কুকুর বিড়ালের সহিত বিশেষ মাখামাখি করে, এবং হামের ন্যায় বীজাক্রান্ত শূকর বা গরুর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারাই উহার দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই প্রকার দূষিত শূকর ও গোমাংসে সাদা সাদা দাগ থাকে, এবং ঐ সাদা দাগগুলিই ফিতাকৃমির বাচ্চা। উক্ত মাংস বহুক্ষণ

ধরিয়া সিদ্ধ না করিয়া বা ভাজিয়া না লইয়া ভক্ষণ করিলে ফিতাক্রমি অন্ত্রে প্রবেশ করিয়া বড় হইতে থাকে।

বাহ্যিক কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ দ্বারা অন্ত্রে ফিতাক্রমি আছে কিনা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। সাধারণতঃ উহার আক্রমণে অজীর্ণতা এবং পেটে উৎকট যাতনা হইয়া থাকে, রুগ্ন ব্যক্তি ক্রমশঃ রক্তহীন হয়, এবং মাথাধরা, মাথাঘুরা বিশেষভাবে অনুভব করে। মলের মধ্যে উক্ত ক্রমির খণ্ড খণ্ড গাঁইট দেখা গেলে ফিতাক্রমির নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রতীকার

ফিতা ক্রমির মস্তক ভাগ দূর করিবার চেষ্টা করাই, উহার চিকিৎসার এক মাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত; কারণ মস্তকভাগ দূর করিতে না পারিলে উহা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এই জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।
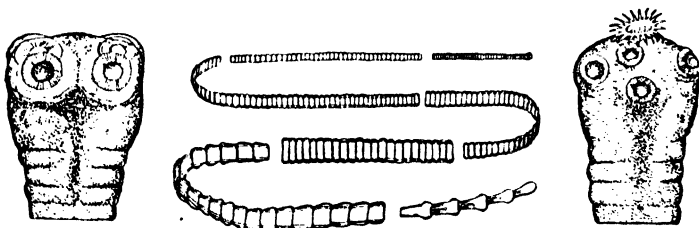
বামে :—গোমাংসস্থিত ফিতা ক্রমির মস্তক মধ্যস্থলে :—ফিতা ক্রমির দেহ
দক্ষিণে :—শূকরের মাংসস্থিত ফিতা ক্রমির মস্তক।

চিকিৎসা আরম্ভ করিবার দুইদিন পূর্ব্ব হইতে রোগী কোন প্রকার শক্ত খাদ্য খাইবে না। শুধু ভাতের মণ্ড, অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম্ব ইত্যাদি গ্রহণ করিবে রোগীকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখিবেন এবং এই দুই দিন তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে দিবেন। প্রথম দিন সকাল বেলা একমাত্রা ক্যাষ্টর অয়েল দিয়া রোগীকে সারাদিন উপবাসী রাখিবেন। দ্বিতীয় দিবসে, পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশু রোগীকে ত্রিশ ফোঁটা ওলিওরেজিন্ (Oleoresin of the male fern) দিবেন ইহা খাইতে অতি বিস্বাদ বলিয়া, ভাতের মণ্ডের সহিত ইহা খাওয়ান ভাল দুই তিন ঘণ্টা পরে পুনরায় ঐ ঔষধ ঐরূপে ত্রিশ ফোঁটা দিবেন। রোগীকে অবশ্যই বিছানায় ধীরভাবে শোয়াইয়া রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় মাত্রা "গ্রহণ করিবার চারি পাঁচ ঘণ্টা পরে, একটু বেশী পরিমাণ এক মাত্রা "ক্যাষ্টর অয়েল" খাইতে দিবেন। শিশুর মলত্যাগ হইতে আরম্ভ করিলে একটা পাত্রে খানিক

গরম জল লইয়া উক্ত মল ধরিয়া রাখিবেন, কারণ তাহা হইলে কৃমির মস্তক বহির্গত হইয়াছে কিনা জানিতে পারা যাইবে। মানুষের মল মাটিতে প্রোথিত ও বিশোধিত করা, এবং মাংস জাতীয় সমুদয় খাদ্য ভালরূপে সুসিদ্ধ করিয়া লওয়া, ফিতাকৃমি নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়। কুকুর বিড়ালের উদরে ফিতাকৃমি অতিরিক্ত মাত্রায় থাকে বলিয়া, উহাদিগকে গৃহে না রাখাই ভাল। উহারা যেন কোন ক্রমে শিশুদের হাত বা মুখ চাটিতে না পারে।

ট্রীকাইনা (Trichinae)

শূকরের মাংস খাইয়া এই জাতীয় কৃমি হয়। উহারা অন্ত্রে থাকে না, মাংস পেশীতে গিয়া বেদনা উৎপন্ন করে। জ্বর হইতে পারে। দেহের বিভিন্ন অংশের মাংসপেশীতে বেদনা হয়, হাত পা নাড়িলে মাংসপেশীতে বেদনা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সন্ধিস্থলে কোনই বেদনা থাকে না। মাংসপেশীতে চাপ সহ্য হয় না। চক্ষুর নিম্ন ভাগ ফুলিয়া উঠে এবং দম কমিয়া যায়।

ইহার ফলদায়ক কোন চিকিৎসা নাই। ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়াইয়া প্রত্যহ ডুস্ দিন, উহাতে অন্ত্রে ঐ জাতীয় কোন কৃমি থাকিলে বাহির হইয়া যাইবে। সমস্ত শরীরের মাংসপেশীতে যে কৃমি আছে, তাহা বাহির করিবার কোন উপায় নাই। শূকরের মাংস না খাইলে এই রোগ হইতে পারে না।

৩৬শ অধ্যায়

তালুগ্রন্থি বা টন্‌সিল্‌—এ্যাডিনয়েড্‌স্‌—সর্দ্দি—কণ্ঠনালীর ঝিল্লীর প্রদাহ—ব্রঙ্কাইটিস—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা

টন্‌সিল্‌ (Tonsils) এ্যাডিনয়েড্‌স্‌ (Adenoids)

যাহারা মুখ মেলিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করে, তাহাদের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়; যেমন—নাক দিয়া সর্ব্বদা সর্দ্দি ঝরা, নাকের ও মুখের মধ্যে ঘা, শব্দ করিয়া নাক টানা, চক্ষু রক্ত বর্ণ হওয়া, লেখা পড়ায় কাঁচা হওয়া মুখ হাঁ করিয়া ঘুমান, মুখ মেলিয়া চাহিয়া থাকা, কাণে যেন কোন বেদনা আছে এই-রূপে কাণে হাত দেওয়া প্রভৃতি। তালুগ্রন্থি বৃহদাকার হইলে অথবা নাসিকার পশ্চাদ্ভাগ এবং কণ্ঠের মধ্যবর্ত্তী বিধান তন্তুসমূহ স্ফীত হইলে (অর্থাৎ এ্যাডিন-য়েড্‌স্‌ হইলে) অধিকাংশ স্থলে রোগী মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করে। যে সকল বালকবালিকা পুষ্টিকর খাদ্য পায় না, অথবা যাহারা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে, সাধারণতঃ তাহাদেরই এ্যাডিনয়েড্‌স্‌ হইয়া থাকে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বা প্যাসিফাইয়ার নামক স্তনের বোঁটার ন্যায় রবারের বোঁটা চুষিলেও উহা হইতে পারে।

১। এ্যাডিনয়েড্‌স ২। রুগ্ন টন্‌সিলের আবরণ

কণ্ঠের পশ্চাদ্ভাগে যে স্থানে কণ্ঠ ও নাসিকা মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে এ্যাডিন-য়েড্‌স্‌ জন্মিয়া থাকে। উহাদের আকৃতি একটী লাল ক্ষুদ্র ফুল-কপির স্তবক বা গুচ্ছের ন্যায়। হাতের উপরে অনেক সময় যে প্রকার আঁচাল হইয়া থাকে, সেইরূপ আঁচালের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। উহারা নাসিকার পশ্চাদ্ভাগে দোদুল্যমান

অবস্থায় থাকিয়া, নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া দেয়, এবং তাই রোগী মুখ দিয়া শ্বাস টানিতে বাধ্য হয় (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য)। মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করিলে দেহের মধ্যে বহু পরিমাণ ধূলিকণা ও বহু সংখ্যক জীবাণু প্রবেশ করিতে পারে; নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস লইলে এরূপ হয় না। এ্যাডিনয়েড্স্ দ্বারা আক্রান্ত শিশুদিগের প্রায়ই কর্ণশূল হইয়া থাকে। কাণ হইতে কখনও পূঁজ ঝরিতে থাকে, কখন বা পূঁজ থাকে না। শিশুদিগের এইরূপ কর্ণশূল পূঁজ নির্গত হইতে থাকিলে, ভবিষ্যতে বধির হইবার এবং তদপেক্ষাও সাংঘাতিক, মস্তিষ্ক ঝিল্লী প্রদাহ নামক রোগ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

শিশুর মুখ হাঁ করাইয়া লইয়া, একখানা চামচের বাঁট দ্বারা জিহ্বাটী নীচের দিকে চাপিয়া ধরিয়া, গলার মধ্যে টন্‌সিল্ বৃদ্ধি পাইয়া গলদেশ পর্য্যন্ত বাহির হইয়া আসিয়াছে কিনা দেখিতে হইবে। টন্‌সিল্‌টী রোগগ্রস্ত না হইলে কখনও প্রলম্বিত হয় না, এবং উহার রঙ্ গলমধ্যের চতুর্দ্দিকের ন্যায় ঈষৎ রক্তাভ থাকে। স্ফীত ও ব্যাধিগ্রস্ত টন্‌সিলের রঙ গভীর রক্ত বর্ণ হয়, অথবা উহার উপরে সাদা চাকা চাকা একটা আবারণ পড়িয়া থাকে, কখনও বা উহাতে হল্‌দে রঙের পূঁজ দেখা যায়। টন্‌সিল্ সহসা ফুলিয়া উঠিলে, রোগী গলায় বেদনার কথা বলে এবং তাহার জ্বর ও মাথাধরা আরম্ভ হয়। কোন খাদ্য বা পানীয় গলাধঃকরণ করিতে গলার বেদনা বৃদ্ধি পায়।

শিশুকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার ঘাড়ে, বা কাণের পিঠের চামড়ার নীচে ডেলা ডেলা কিছু বোধ হয় কিনা। এইগুলি বর্দ্ধিত গ্রন্থি। যখনই হউক না কেন, এইগুলি হইলেই বুঝিতে হইবে যে, নাক, গলা, কাণ বা দাঁতের মধ্যে কিছু বিষ জন্মিয়াছে বা প্রদাহ হইয়াছে; কাজেই দেহের অন্য অংশ যাহাতে পীড়িত না হয়, তজ্জন্য সত্বর ইহা দূর করা দরকার।

এ্যাডিনয়েড্স্ ও বর্দ্ধিত টন্‌সিল্ নাক ও গলা বন্ধ করিয়া দেয়, কাজেই শিশু নিয়মিত শ্বাস লইতে পারে না, ফলে শরীর যথেষ্ট পরিমাণ বায়ু পায় না।

বর্দ্ধিত তালুগ্রন্থিতে (টন্‌সিলে) এবং এ্যাডিনয়েড্‌সে বিষাক্ত জীবাণু থাকে। উহা রক্তের সহিত হৃৎপিণ্ডে যাইয়া হৃদ্রোগ এবং সন্ধিস্থলে যাইয়া বাত রোগ সৃষ্টি করিতে পারে। এই সকল জীবাণু দেহের অন্যান্য অংশে নীত হইয়া অন্যান্য রোগও সৃষ্টি করিতে পারে। উহারা দৈনিক বৃদ্ধির বাধা জন্মায়, কাজেই যে সকল বালকবালিকার তালুগ্রন্থি বর্দ্ধিত হয় বা এ্যাডিনয়েড্স্ থাকে; তাহারা খর্ব্বাকৃতি হয়। ঐ সকল জীবাণু ধীরে ধীরে শরীর বিষাক্ত করে; এই জন্যই বালকবালিকাগণ অনেক সময় সহজে পাঠ প্রস্তুত করিতে পারে না। এইরূপ বালকবালিকার ডিফথিরিয়া, পীত জ্বর ও হাম হইবার খুব সম্ভাবনা;

উহাদের ঐ সকল রোগ হইলেই খুই প্রবলভাবে হয়, এবং অতি ধীরে তাহারা রোগ মুক্ত হয়।

প্রতীকার

কোন শিশুর এ্যাডিনয়েড্‌স্ হইলে তাহাকে কোন হাঁসপাতালে বা উপযুক্ত অস্ত্র চিকিৎসকের নিকটে লইয়া এ্যাডিনয়েড্‌স্ বাহির করিয়া ফেলাই একমাত্র পন্থা। উক্ত রোগ বিশেষ সাংঘাতিক নহে মনে ভাবিয়া কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। যে কোন উপায়ে উহা শীঘ্রই বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে; নতুবা শিশুর মুখ বিকৃত ও শরীর খর্ব্ব এবং নানাপ্রকার ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা।

টন্‌সিল্‌গুলি ক্রমশঃ বাড়িতে না থাকিয়া যদি হঠাৎ ফুলিয়া উঠে, ও বেদনা হয়, তবে একমাত্রা "ক্যাষ্টর অয়েল" বা "এপ্‌সম্‌সল্ট" খাওয়াইয়া দিয়া পরে চোয়ালের নীচে ঘাড়ের দুই পার্শ্বে সেঁক দিতে থাকিবেন। ৫০শ অধ্যায়ের ৯নং বা ১০নং ব্যবস্থা পত্রের ঔষধ দ্বারা কুলকুচি করিতে দিবেন। উক্ত কুলকুচি ব্যতীত দিনের মধ্যে কয়েক বার স্ফীত টন্‌সিল্‌গুলির উপরে উক্ত ব্যবস্থা পত্র মত ঔষধ লেপিয়া দিতে হইবে। টন্‌সিল্ যদি বেশী বড় হয়, বা বেশী বড় না হইলেও যদি উহার উপরে হরিদ্রাবর্ণ পূঁজের স্তর পড়িতে থাকে, তাহা হইলে ইহা বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে।

সর্দ্দি

অনেক লোকেই সর্দ্দি দ্বারা যত অধিকবার আক্রান্ত হয়, আর কোন ব্যাধি দ্বারা তত অধিকবার আক্রান্ত হয় না। অনেক লোকেই বৎসরের মধ্যে বহুবার, কখনও বা "মাথায় সর্দ্দি" কখনও বা "বুকে সর্দ্দি"; এইরূপে একটা সারিতে না সারিতে সর্দ্দির আর একটা উপসর্গ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে।
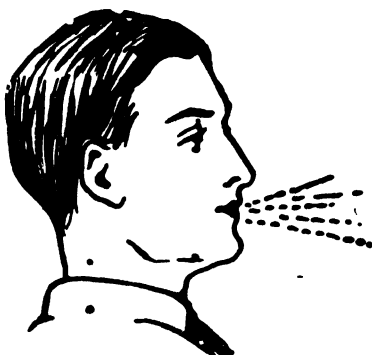
কাশিদ্বারা সর্দ্দির জীবাণু বিস্তার

প্রায় সমস্ত প্রকারের সর্দ্দিই জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয়। হাম, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ যেরূপ সংক্রামক, সর্দ্দিও সেইরূপ সংক্রামক ব্যাধি। ঠাণ্ডা বাতাস বা আব-হাওয়ার জন্য কখনও সর্দ্দি হয় না। যাহারা মেরুপ্রদেশে ভ্রমণ করেন এবং সর্ব্বদা অতিশয় শীতল হাওয়ার

মধ্যে থাকিতে বাধ্য হন, তাঁহারা পুনরায় স্বদেশে ফিরিবার পর যখন স্বজনদিগের সহিত মেলা মিশা করেন, কেবল তখনই সর্দ্দি দ্বারা আক্রান্ত হন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাহারা সর্দ্দি রোগে ভুগিতেছে তাহাদের সংস্পর্শে আসিলে সর্দ্দি হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে পরিবারস্থ কোন এক জনের সর্দ্দি হইলে ক্রমে ক্রমে অপর সকলেরও সর্দ্দি হয়।

সর্দ্দি রোগ মারাত্মক না হইলেও উহা হইতে নিউমোনিয়া, ক্ষয়রোগ, বাত-শ্লেষ্মা জ্বর ও বধিরতা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগ হইতে পারে।

সর্দ্দি নিবারণ।

কয়েকটী বিষয়ের উপরে সর্দ্দির প্রতীকার নির্ভর করে। প্রথমতঃ উপযুক্ত খাদ্য ও দৈনিক ব্যায়াম দ্বারা শরীর সুস্থ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। যে নিয়মিত প্রতিদিন ঘাম বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যায়াম করে না, অথচ অধিক পরিমাণ আহার করে, তাহার সর্দ্দি দ্বারা আক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অতিরিক্ত খাওয়া, এবং ব্যায়াম না করা এই দুইটীই সর্দ্দি হইবার প্রধান কারণ। প্রতিদিন ঠাণ্ডা জলে বেশ করিয়া স্নান করিলে, শরীরের পক্ষে সর্দ্দির আক্রমণ প্রতিরোধ করা সহজ হয়। যাহারা সর্দ্দি দ্বারা আক্রান্ত, তাহাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে কক্ষে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া অনেক লোক থাকে সেইরূপ কক্ষে, ট্রামে বা সভা সমিতিতে সাধারণতঃ সর্দ্দি লাগিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। সর্দ্দি দ্বারা আক্রান্ত কোন ব্যক্তি কাহারও মুখের উপরে হাঁচিলে বা কাশিলে শেষোক্ত ব্যক্তির সর্দ্দি লাগিবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে।

সাধারণ পানপাত্র, তোয়ালে, যাহা দ্বারা সাধারণতঃ হাত মুখ মুছা হয়, চুরুটের নল, খেলনা, আঙ্গুল প্রভৃতি নাক ও মুখ নিঃসৃত রসে দূষিত হয়, সাধারণতঃ এইরূপ দ্রব্যসমূহ দ্বারা সর্দ্দির জীবাণু এক দেহ হইতে অন্য দেহে চালিত হয়। অল্প বাতাস ও আলো বিশিষ্ট গৃহে বাস করিলে, নিশ্বাসের সহিত ধূলিপূর্ণ বায়ু গ্রহণ করিলে, ঠাণ্ডা লাগাইলে বা ভিজিলে, ঘামে ভিজা জামা কাপড় পরিয়া বাতাসে বসিয়া থাকিলে, ঘুম না হইলে, কঠিন পরিশ্রম করিলে খুব সহজেই সর্দ্দি হয়। যাহারা মুখ দিয়া নিশ্বাস লয়, যাহাদের দাঁতে পোকা লাগিয়াছে বা টন্‌সিল্‌ বড় হইয়াছে তাহাদের পুনঃ পুনঃ সর্দ্দি হইতে থাকে। এই সকল বিষয় জানিলে যাহাতে সর্দ্দি হয়, সেই বিষয় হইতে সতর্ক হওয়া যায়।

প্রতীকার

সত্বর চিকিৎসা আরম্ভ করিলে সর্দ্দি শীঘ্রই সারিয়া যায়। হাঁচি, নাক দিয়া জল পড়া, অল্প মাথা ধরা, নাক বন্ধ হওয়া, সর্দ্দি লাগিবার এই সমুদয়

প্রাথমিক লক্ষণ দেখা গেলেই উহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উন্মুক্ত বায়ুতে বাগানের কাজ করা, দ্রুত বেড়ান বা অপর কোন প্রকার শারীরিক ব্যায়াম সর্দ্দির আক্রমণ নিবারণের উৎকৃষ্ট পন্থা। ঘাম বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিতে থাকিবেন, তারপর একটী বড় স্নান করিবার টবে বা বড় গামলায় গরম জলে সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইয়া স্নান করিবেন। গরম জল হইতে উঠিয়া সর্ব্বাঙ্গে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিবেন এবং পরে শুষ্ক তোয়ালে দ্বারা পায়ের চামড়া ভালরূপে মুছিয়া ফেলিবেন।

সর্দ্দি দুই তিন দিন পূর্ব্বে হইয়া থাকিলে গরম জল দ্বারা "ফুট্ বাথ্" বা পাদমজ্জন ও "লেগ্ বাথ্" (২০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) দেওয়া যাইতে পারে। উক্ত জল খুব গরম রাখিবার জন্য, বার বার উহাতে উত্তপ্ত জল ঢালিতে থাকিবেন। গরম জলে পা ডুবাইয়া রাখিবার কালে, কয়েক পাইট অতিশয় উষ্ণজল অমনি অথবা একটু লেবুর রস মিশাইয়া পান করিবেন। ঘাম না হওয়া পর্য্যন্ত গরম জলে পা ডুবাইয়া রাখিবেন, এবং ঐরূপে ঘাম বাহির হইতে থাকুক। যতক্ষণ গরম জলে পা ডুবান থাকিবে, ততক্ষণ কপালে ঠাণ্ডা জলের পটী দিবেন। পরদিন সকালে উঠিয়া গরম জল দ্বারা, সর্ব্বশরীর "স্পঞ্জ" করিয়া ফেলিবেন, এবং ঐ দিন ভাতের মণ্ড, অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম্ব এবং ফল ব্যতীত অপর কোন খাদ্য খাইবেন না। সর্দ্দি আরোগ্য করিবার পক্ষে এরূপ চিকিৎসা বড়ই ফলপ্রদ।

উষ্ণ "লেগ্ বাথ্" বা পাদমজ্জন লইবার পূর্ব্বে "এপ্‌সম্ সল্ট্" অথবা "গ্লবার্স্ সল্ট" বা "ক্যাষ্টর অয়েল" এইরূপ কোন জোলাপ লওয়া কর্ত্তব্য। অথবা এই সমুদয়ের পরিবর্ত্তে ১০৬° ডিগ্রি উষ্ণ গরম জলের ডুস্ লওয়া যাইতে পারে (২০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কুলকুচি করিবার জন্য ৯ নং অথবা ১০ নং ব্যবস্থা পত্রের (৫০শ অধ্যায় দেখুন) ঔষধ দ্বারা দিবসে তিনবার, গলার মধ্যে যায় এরূপে কুলি করিবেন। নাসিকা বন্ধ হইয়া গেলে, অথবা নাসিকা দিয়া দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা বাহির হইতে থাকিলে, কুলকুচি করিবার নিমিত্ত ঔষধ গরম করিয়া লইয়া নাকের মধ্যে টানিবেন।

কিছুকাল ধরিয়া সর্দ্দি নির্গত হইতে থাকিলে, পূর্ব্ব লিখিত ঔষধ দ্বারা নাসিকা বারংবার ধৌত করা, এবং ১৬নং ব্যবস্থা পত্রের অনুযায়ী ঔষধ নাসিকা দ্বারা টানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য (৫০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

গলায় বেদনা

টন্‌সিল্ (তালুগ্রন্থি) ফুলিয়া উঠিয়াই সাধারণতঃ গলায় বেদনা হইয়া থাকে। এই অধ্যায়ের প্রথমাংশে ইহার চিকিৎসা প্রণালী লিখিত হইয়াছে। গলার বেদনা যে কোন প্রকারের হউক না কেন, দৈনিক তিনবার করিয়া প্রতিবারে

পনের মিনিট কাল ২০শ অধ্যায় অনুযায়ী গলায় সেঁক দিবেন এবং প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ৫০শ অধ্যায়ের ৯নং ব্যবস্থা পত্রের ঔষধ দ্বারা কুলকুচি করিবেন। উক্ত ঔষধ গলার অভ্যন্তরে লাগাইলে ভাল হয়।

ব্রঙ্কাইটিস্ (Bronchitis)

এই রোগকে চলিত কথায় "বুকে ঠাণ্ডা লাগা" বলে। সাধারণতঃ নাসিকায় প্রথমে সর্দ্দি টের পাওয়া যায়, পরে রোগ জীবাণু শ্বাসনালী এবং ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া থাকে। প্রথমে শুষ্ক ও খুস্‌খুসে কাশি হয়; কয়েক দিনের মধ্যে কাশি উঠিতে থাকে।

এই রোগের প্রথমেই খুব যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা আরম্ভ করা আবশ্যক; কারণ ইহা নিউমোনিয়া অথবা "টিউবার কিউলোসিস্" ক্ষয়রোগ প্রভৃতি কঠিন ব্যাধিতে পরিণত হইতে পারে।

প্রতীকার

প্রথমাবস্থায় এই রোগের সর্দ্দির ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে; অধিকন্তু দৈনিক তিনবার বুকের সম্মুখ ভাগে সেঁক দিতে হইবে। কাশি শুষ্ক ও যন্ত্রণাদায়ক হইলে ৫০শ অধ্যায়ের ১৮ নং ব্যবস্থা পত্র অনুযায়ী ঔষধও ব্যবহার করা আবশ্যক।

ক্রমাগত কয়েক সপ্তাহ কাশি চলিতে থাকিলে, বুঝিতে হইবে রোগ গুরুতর; হয়ত বা ক্ষয় রোগ। ৩৮শ অধ্যায়ে বর্ণিত চিকিৎসা প্রণালী অনুযায়ী তখন চিকিৎসা করিতে হইবে।

যাহারা তামাক সেবন করে, তাহাদের এই প্রকার কাশি হয়, এবং তামাক ত্যাগ করিলেই উহা সারিয়া যায়।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা

প্রতি বৎসর ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। উহার লক্ষণ সাধারণ সর্দ্দির মত, কিন্তু অধিক যন্ত্রণাদায়ক। রোগের প্রারম্ভে নাক বন্ধ, হাঁচি, ছল ছল চক্ষু, মাথা ধরা, পিঠে বেদনা, শুষ্ককাশি এবং জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এই রোগ বড়ই সংক্রামক। প্রতি বৎসর বহু বৃদ্ধ লোক এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। যাহারা স্বভাবতঃই দুর্ব্বল তাহারা ঐ রোগে আক্রান্ত হইলে প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

প্রতীকার

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বড়ই সংক্রামক। পরিবারস্থ কোন এক জন এই রোগে আক্রান্ত হইলে, কাশিবার বা হাঁচি দিবার সময় একখানি রুমাল মুখের বা

নাকের কাছে ধরিবেন। টুক্‌রা কাগজের উপরে থুথু ও কফ ফেলিবেন, এবং উহা পরে পুড়াইয়া ফেলিবেন। রোগীর তোয়ালে, পান করিবার বাটি বা থালা বাসন প্রভৃতি অপর কেহ ব্যবহার করিবেন না।

রোগের আক্রমণের প্রারম্ভ হইতে রোগী বিছানায় শুইয়া থাকিবেন, এবং এই অধ্যায়ের প্রথমে সর্দ্দির চিকিৎসায় বর্ণিত ফুট্‌বাথ্‌ ও লেগ্‌বাথের ব্যবস্থা করিবেন। রোগী প্রতি ঘণ্টায় আধ পাইট বা তদধিক পরিমাণ শুধু জল বা লেবুর রস মিশ্রিত জল পান করিবেন। সর্ব্বদা পা গরম রাখিতে হইবে। গরম জল পূর্ণ বোতল হয়ত পায়ের কাছে রাখিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইতে পারে। ভাতের মণ্ড, অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম ও ফল ব্যতীত অপর কিছু খাইবেন না। কাশির নিমিত্ত বুকে ঠাণ্ডা লাগিলে যেরূপ প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই-রূপ প্রক্রিয়া করিবেন। দিবসে তিনবার ৫০শ অধ্যায়ে লিখিত ৯নং ব্যবস্থা পত্রের ঔষধ দ্বারা কুলকুচি করিবেন। এইরূপে মুখ ও গলা পরিষ্কার থাকিবে এবং বধিরতা ও কাণের ব্যাধি নিবারিত হইবে।

৩৭শ অধ্যায়

নিউমোনিয়া এবং প্লুরিসি

(Pneumonia and Pleurisy)

নিউমোনিয়া ফুস্‌ফুসের রোগ। ইহা নিউমোনিয়া জীবাণু দ্বারা জন্মিয়া থাকে। এই রোগ সাধারণতঃ হঠাৎ শীতকম্প হইয়া আরম্ভ হয়। জ্বরের তাপ দ্রুত বাড়িয়া যায় এবং বুকে বেদনা থাকে। একটু একটু শুষ্ক এবং যন্ত্রণাদায়ক কাশি দেখা যায়, এবং শ্বাসের মাত্রা অতিশয় বাড়িয়া যায়। রোগী চিৎ হইয়া না শুইয়া ডান বা বাম কাতে শয়ন করে। মুখ মণ্ডল বিশেষতঃ যে কোন এক গাল বা দুই গালই রক্তবর্ণ হইয়া উঠে; ওষ্ঠের উপরে জ্বর ঠুঁটো উঠিতে থাকে। মুখ হইতে নির্গত কফের সহিত রক্ত দেখা যায়। সাত, নয়, অথবা দশ দিন ক্রমাগত জ্বর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে পর, একদিন সহসা প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর থামিয়া যায়। ইহার পর রোগী অনেকটা আরাম বোধ করে, এবং আকস্মিক কোন পরিবর্ত্তন না হইলে রোগী ক্রমশঃই ভাল হইতে থাকিলে, ও দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবে। জ্বর থামিবার পূর্ব্বেই অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জ্বর থামিয়া যাওয়ার পরে ফুস্‌ফুস্ প্রদাহের অথবা ফুস্‌ফুসে টিউবার কিউলোসিসের অর্থাৎ ক্ষয়রোগের নিমিত্ত মৃত্যু হইতে পারে। নিউমোনিয়া রোগ দ্বারা আক্রান্ত প্রতি দশ জনের মধ্যে তিন চারি জনের মৃত্যু ঘটে; যাহারা সুরা বা অপর কোন প্রকার মাদক পানীয় পান করে, তাহারা এই রোগে আক্রান্ত হইয়া কদাচিৎ বাঁচিয়া উঠে।

নিবারণ ও চিকিৎসা

নিউমোনিয়া রোগের জীবাণু নানাদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। উহাদিগকে পরিহার করা বড়ই কঠিন, কিন্তু দেহ সুস্থ ও সবল থাকিলে নিউমোনিয়া জীবাণু কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। সুরাপান, তামাক সেবন, উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, অথবা অতিরিক্ত খাদ্য ভক্ষণ, অন্ধকার বায়ুহীন গৃহে বাস, জানালা কবাট বন্ধ করিয়া, অথবা নাক মুখ ঢাকিয়া ঘুমান, কুঁজো হইয়া বসা, অথবা সর্দ্দি লাগা প্রভৃতি কারণে দেহের রোগ জীবাণু প্রতিহত করিবার সাধারণ শক্তি হ্রাস হইয়া যায়।

নাসিকা হইতে নিঃসরিত শ্লেষ্মা এবং থুথু, কাশি ও হাঁচি দ্বারা নিউমোনিয়া রোগের জীবাণু ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অপরের ব্যবহৃত পানপাত্র

ব্যবহার করিবার ফলেও, এই রোগ সংক্রমিত হইতে পারে। শ্বাসের সহিত রাস্তার এবং ঘরের ঝাঁট দেওয়া ধূলিপূর্ণ বায়ু গ্রহণ করিবার ফলে, আমরা হয়ত নিউমোনিয়া জীবাণু শরীরের মধ্যে টানিয়া লইয়া উক্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারি। কি প্রকারে উক্ত রোগ হইতে পারে, তাহা বর্ণিত হইয়াছে; এক্ষণে উহা পরিহার করিবার নিমিত্ত কি করা কর্ত্তব্য তাহা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। কোন ঔষধ দ্বারা নিউমোনিয়া আরোগ্য হইবার নহে, ভাল-রূপে শুশ্রূষা ঔষধ অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ। রোগীকে যেরূপ হউক মুক্ত বায়ুতে রাখা কর্ত্তব্য। রৌদ্র নিবারণের জন্য উপরে কোন প্রকার আচ্ছাদন দিয়া, গৃহের বাহিরে রোগীকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখিলে ভাল হয়। রোগীর পা সর্ব্বদা গরম রাখিবেন; প্রয়োজন হইলে বোতল গরম জলে পূর্ণ করিয়া পায়ের কাছে রাখিয়া দিবেন। রোগের প্রারম্ভে এক মাত্রা "এপ্‌সম্‌ সল্ট" খাওয়ান, এবং ১০০ ডিগ্রি উষ্ণ জল দ্বারা অন্তর্ধৌত করান আবশ্যক। লেমনেড্‌ বা লেবুর রস মিশ্রিত জল অথবা শুধু জল যথেষ্ট পরিমাণে পান করিতে দিবেন। ভাতের মণ্ড এবং কাঁচা বা অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম্ব প্রভৃতি তরল খাদ্য খাইতে দিবেন। নিয়মিত মলত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে কিছুকাল প্রতিদিন অন্তর্ধৌত করান কর্ত্তব্য।

বুকে যে স্থানে অধিক বেদনা সেই স্থানে প্রতি ঘণ্টায় পাচ মিনিট কাল খুব উষ্ণ সেঁক দিতে থাকিলে (২০শ অধ্যায় দেখুন), বেদনা ও কাশি উভয়ই কমিয়া যাইবে। অতি উষ্ণ জল ধীরে ধীরে চুমুক দিয়া খাইলেও কাশির উপশম হয়। নিম্নলিখিত প্রণালী চিকিৎসার পক্ষে খুব প্রয়োজনীয়। বড় একখণ্ড পাতলা কাপড় লইয়া ছয় কি আট ভাঁজ করিবেন, ভাঁজ করা হইলে পর উহা দ্বারা যেন বুকের সম্মুখ ভাগ সম্পূর্ণরূপে ঢাকিতে পারা যায়। তারপর ঐ বস্ত্রখণ্ড যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া লইয়া, অল্প নিংড়াইয়া ফেলিবেন, যেন টুপ্‌ টুপ্‌ করিয়া জল না পড়ে। বুকের উপরিভাগে উক্ত ঠাণ্ডা বস্ত্র খণ্ড রাখিয়া দিয়া তদুপরি একখণ্ড ফ্লানেল বা এক টুক্‌রা কম্বল স্থাপন করিবেন। পনের কি বিশ মিনিট অন্তর উহা পুনরায় ভিজাইয়া লইবেন। পুনরায় ভিজাইবার সময় গায়ের চামড়া ভালরূপে মুছিয়া ফেলিবেন। বরফ পাওয়া গেলে, কাপড়ের মধ্যে বরফের টুক্‌রা জড়াইয়া লইয়া বেদনাযুক্ত স্থানে রাখিয়া দিবেন। গায়ের চামড়া ও বরফের মধ্যে অন্ততঃ দুই কি তিন ভাঁজ কাপড় থাকা প্রয়োজন। বুকের উপরে ঠাণ্ডা জলপটি দিবার সময় পা গরম রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন। জ্বরের মাত্রা খুব বেশী হইলে, প্রতিদিন দুই কি তিনবার রোগীর শরীর ঠাণ্ডা জল দ্বারা স্পঞ্জ করিবেন। ৩১শ অধ্যায়ে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্পঞ্জ দিবেন (১২২ পৃষ্ঠায় স্পঞ্জিং দ্রষ্টব্য)।

রোগীর থুথু ও কফ বিষম বিপজ্জনক, কারণ উহাতে অধিক পরিমাণে নিউমোনিয়া রোগের জীবাণু থাকে। টুকরা কাগজ বা পুরাতন কাপড়ের উপরে রোগীর থুথু ফেলিয়া উহা পুড়াইয়া দিতে হইবে।

শিশুদিগের নিউমোনিয়া

বয়স্কদিগের নিউমোনিয়ায় যেরূপ চিকিৎসা বিধি প্রদত্ত হইয়াছে, শিশুদিগের নিমিত্তও সেইরূপ বিধি অবলম্বন করিতে হইবে। রুগ্ন শিশুকে উন্মুক্ত বাতাসে রাখিতে হইবে। পা যেন সর্ব্বদা গরম থাকে; শিশুর স্বাভাবিক খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে। পূর্ব্ব লিখিত নিয়ম অনুযায়ী বুকের উপরে জলপটি রাখিয়া দিয়া পা উষ্ণ রাখিবেন। বুকের যে অংশে খুব বেদনা সেই অংশে সরিষার প্লাষ্টার বা পলাস্তারা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ছয় কি সাত ভাগ ময়দার সহিত, একভাগ সরিষা মিশাইয়া প্লাষ্টার প্রস্তুত করিতে হয়। পরে উহা গরমজলে মিশাইয়া পাতলা এক ভাগ কাপড়ের উপরে লেপিয়া দিতে হইবে। এইরূপে প্লাষ্টার প্রস্তুত করা হইলে শরীরের চামড়ার উপরে উহা প্রয়োগ করিবেন। উহা প্রয়োগ করিবার ফলে, চামড়া যখন বেশ লাল হইয়া যাইবে, তখন প্লাষ্টার সরাইয়া ফেলিবেন। চারি পাচ ঘণ্টার মধ্যে উহা পুনরায় গরম করিয়া কয়েক মিনিট প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগীকে প্রচুর জল পান করিতে দিবেন; জলের সঙ্গে বরং লেবুর রস মিশাইয়া দিতে পারেন। প্রতিদিন অল্প পরিমাণ গরম জল দ্বারা অন্তর্ধৌতের ব্যবস্থা করিবেন। রোগী যদি খুব কাশিতে থাকে, অথচ শ্লেষ্মা নির্গত না হয় এবং কাশির বেগে ঘুমের ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে ৫০শ অধ্যায়ে বর্ণিত ১৮ নং ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন।

নিউমোনিয়ার পর ক্ষয়রোগের ভয়ে সতর্কতা

বয়স্ক হউক, কি শিশুই হউক, নিউমোনিয়া রোগ আরোগ্য হইবার পর, টিউবারকিউলোসিস্ (ক্ষয়রোগ) হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। তাই সাবধান হইবার জন্য, নিউমোনিয়া হইতে আরোগ্য লাভ করিবার পরে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সবল না হওয়া পর্য্যন্ত রোগী চারি দিকে ঘুরা ফিরা এবং কোন কাজকর্ম আরম্ভ করিবে না। সর্দ্দি না লাগিতে পারে এই জন্য বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য; এবং কখনও দরজা জানালা বন্ধ করিয়া কোন কক্ষে নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত প্রণালী অনুযায়ী দৈনিক গভীর শ্বাস গ্রহণ করা বিধেয়।

প্লুরিসি (Pleurisy)

ফুস্‌ফুস্‌ এবং বুকের অভ্যন্তরের প্রাচীর আচ্ছাদন করিয়া যে সূক্ষ্ম ঝিল্লী রহিয়াছে, তাহা ফুলিয়া উঠা প্লুরিসি রোগ। প্রত্যেক নিউমোনিয়া রোগীরই প্লুরিসির নিমিত্ত বুকের পার্শ্বের দিকে যন্ত্রণা হইয়া থাকে। কখনও কখনও বুকে আঘাত, অথবা ঠাণ্ডা লাগিলে প্লুরিসি হইতে পারে। প্রথম শীত শীত করে, তারপর সাধারণতঃ বুকের এক পার্শ্বে বেদনা অনুভূত হয়। ছোরার আঘাতের ন্যায় বিষম যন্ত্রণা হইতে থাকে;—এবং গভীর শ্বাস গ্রহণ করিলে, অথবা কাশি দিলে যন্ত্রণা বাড়িয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর থাকে। বুকের কোন এক পার্শ্বে বেদনাই ইহার প্রধান লক্ষণ। যে পার্শ্বে বেদনা সেই পার্শ্বে কাত হইয়া রোগী কখনই শয়ন করিতে পারে না। কয়েক দিবস পরে ফুস্‌ফুস্‌ আবরক ও বক্ষ পঞ্জর আবরক ঝিল্লীর মধ্যে কিছু তরল পদার্থ জমিলে পর যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

প্রতীকার

সাধারণতঃ প্লুরিসি হইবার সঙ্গে যে জ্বর হয়, তাহা এক সপ্তাহ কি দশ দিন কাল থাকে। যদি রোগী প্রতিদিন অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যাবেলা দুই তিন সপ্তাহ কাল জ্বর জ্বর বোধ করে, তবে তাহার টিউবার কিউলোসিস্‌ (ক্ষয়রোগ) হইবার আশঙ্কা করা যাইতে পারে; এইরূপ অবস্থায় ৩৮শ অধ্যায়ের প্রণালী অনুযায়ী চিকিৎসা করিতে হইবে।

রোগীকে এরূপ কক্ষে রাখিতে হইবে, যে স্থানে সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ু চলাফিরা করিতে পারে। তাহাকে শুধু তরল খাদ্য খাইতে দিবেন। রোগীর বুকে তিন ইঞ্চি চওড়া একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবেন। রোগী একবার নিশ্বাস ত্যাগ করিতে ফুস্‌ফুস্‌ যখন খালি হইয়া যাইবে, এবং বুক সঙ্কুচিত হইবে তখন ঐ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবেন। ইহার দ্বারা বুকের প্রসারণ নিবারিত হয়, এবং বেদনা কমিয়া যায়। বেদনা কমাইবার জন্য প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর বিশ মিনিট করিয়া তাপসেঁক দিবেন। সেঁকের পরিবর্ত্তে গরম জলে এক খণ্ড বস্ত্র ডুবাইয়া ও নিংড়াইয়া লইয়া তদ্দ্বারা গরম জলপূর্ণ ব্যাগ জড়াইয়া লইবেন, এবং উহা বুকের উপরে প্রয়োগ করিবেন। "এপ্‌সম্‌ সল্ট" অথবা "ক্যাষ্টর অয়েল" দ্বারা একবার জোলাপ দিবেন। অনেক সময়ে রোগীর বুকে ঠাণ্ডা জল পটি দিলে বিশেষ উপশম বোধ হয়। গরম সেঁক প্রভৃতি প্রয়োগ করিবার পরেও বেদনার উপশম না হইলে, ঠাণ্ডা প্রক্রিয়াগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

কয়েক দিনের মধ্যে শিশু রোগী আরোগ্য লাভ না করিয়া যদি কষ্টে শ্বাস গ্রহণ করিতে থাকে, অথচ কোন বেদনা বোধ না করে, তাহা হইলে তাহাকে ভাল চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। চিকিৎসকের অভাবে গৃহে চিকিৎসা করিতে হইলে, দৈনিক তিনবার, তাঁহার যে পার্শ্বে বেদনা সেই পার্শ্বে সেঁক দিবেন (২০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। প্রথমে গরম সেঁক দিবেন, উহা সামান্য ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ হইলে দুই তিন ভাঁজ করা একখানা পাতলা কাপড় অতিশয় শীতল জলে ভিজাইয়া ও নিংড়াইয়া লইয়া উক্ত স্থানে কয়েক সেকেণ্ড প্রয়োগ করিবেন। তারপর পুনরায় গরম সেঁক দিয়া আবার কয়েক সেকেণ্ড ঐরূপে ঠাণ্ডা লাগাইতে থাকুন। এইরূপে বিশ মিনিট কি তদধিক কাল পর্য্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা দিতে থাকিবেন। এক সপ্তাহ কি দুই সপ্তাহ মধ্যে প্লুরিসি কমিয়া না গেলে, ৩৮শ অধ্যায়ে বিবৃত টিউবার কিউলোসিস্ বা ক্ষয়রোগের চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

৩৮শ অধ্যায়

টিউবার কিউলোসিস্ বা ক্ষয়রোগ

(Tuberculosis or Consumption)

সমস্ত দিন রাত্রি ভারতবর্ষে প্রতি মিনিটে কেহ না কেহ ক্ষয়রোগে মরিতেছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ক্ষয়রোগে ভুগিতেছে এরূপ লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষে বহু।

ক্ষয়রোগ এরূপ সাংঘাতিক যে পৃথিবীতে যত লোকের মৃত্যু হয়, তন্মধ্যে ছয় ভাগের এক ভাগ লোক কেবল ক্ষয়রোগে মরিয়া থাকে। বৎসরের প্রথম হইতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দিন রাত প্রতি মুহূর্ত্তে কেহ না কেহ এই রোগে জীবন হারাইতেছে। এই বিবরণ সত্য, এবং ইহা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, কলেরা বা বসন্ত রোগ অপেক্ষাও ইহা সাংঘাতিক।

অথচ এই রোগকে যেরূপ ভীতির চক্ষে দেখা উচিত, সাধারণ লোক ইহাকে সেরূপ ভীতির চক্ষে দেখে না। ইহার কারণ এই যে, সাধারণ অন্যান্য রোগ যে প্রকার যন্ত্রণাদায়ক, এই রোগ সেই প্রকার যন্ত্রণাদায়ক নহে; এবং ইহার ক্রিয়াও খুব ধীর; কলেরা, প্লেগে রোগী যেরূপ তাড়াতাড়ি মরিয়া যায়, ক্ষয়রোগে সেইরূপ হয় না। ক্ষয়রোগী কয়েক মাস বা বৎসরাধিক কাল ভুগিয়া পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ক্ষয়রোগী বহুদিন ভোগে এবং যে বয়সে লোকে কর্ম্মক্ষম থাকে অর্থাৎ ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যে এই রোগ হয়, এই দুই কারণে এই রোগে বহু অর্থ ব্যয় হয়।

পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে ক্ষয়রোগ কখনই আরোগ্য হয় না, এবং যাহাদের এই রোগ হইত, তাহারাও সমস্ত আশা ত্যাগ করিত, এবং নীরোগ হইবার জন্য কিছুই করিত না; ইহা মহা ভ্রম, কেননা বর্ত্তমানে দেখা গিয়াছে যে, রোগ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে, প্রায় সকল ক্ষয়-রোগীকেই আরোগ্য করা যায়।

ক্ষয়রোগ যে কেবল আরোগ্য করা যায় এরূপ নহে, উহার আক্রমণ নিবারণ করাও সম্ভব।

এই রোগ নিবারণ ও আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করিলে, আরোগ্য করা সম্ভব বলিয়া সকলেরই ইহার লক্ষণ, নিবারণের উপায়, এবং চিকিৎসা-বিধি, জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

লক্ষণসমূহ

ক্ষয়রোগ হইয়াছে, ইহা যত সত্বর জানা যাইবে, উহার আরোগ্যের সম্ভাবনাও ততই অধিক। কাজেই সকলেরই ইহার প্রথম লক্ষণগুলি অবগত হওয়া আবশ্যক।

যে সকল লোকের বুক চ্যাপটা ও অনুচ্চ এবং কাঁধ সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহারা সহজে ক্ষয়রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। শরীরের ওজন একটু একটু করিয়া ক্রমশঃ কমিতে থাকা এ ব্যাধির একটী প্রধান লক্ষণ। রোগের প্রথমে গায়ের চামড়ার রঙ্ পাণ্ডুর বা মলিন হয়, এবং মাঝে মাঝে গাল খুব রক্তিম দেখা যায়। ঘন ঘন সর্দ্দি কাশির আক্রমণ হওয়া আর একটি প্রথম লক্ষণ। ক্ষয়রোগ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি প্রথম প্রথম কোন রোগ হইয়াছে কিনা বুঝিতে পারে না, কিন্তু সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, এবং কয়েক সপ্তাহ মধ্যে বিকালে বিকালে একটু একটু জ্বর ও সকালে সন্ধ্যায় একটু খক্ খক্ কাশি প্রকাশ পাইয়া থাকে। আবার কিছু দিন পরে রাত্রিকালে ঘর্ম্ম এবং কাশির সঙ্গে রক্ত দেখা যায়। বুকে বেদনা কখন থাকে, কখন থাকে না। ক্ষুধা না থাকাও একটী প্রথম লক্ষণ। এতদ্ব্যতীত মেজাজের পরিবর্ত্তন, রোগের প্রথম অবস্থাতেই প্রকাশ পায়; যেমন,—যে ব্যক্তি বেশ প্রফুল্লচিত্ত ও প্রিয় স্বভাব, সে সহসা স্ফূর্ত্তিহীন ও একেবারে খিট্‌খিটে হইয়া পড়ে।

রোগীর কাশি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহাতে ক্ষয়রোগের জীবাণু দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। সহস্রগুণ বাড়াইলে রোগ জীবাণুগুলি কিরূপ দেখা যায়, তাহার চিত্র ২১ অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। ক্ষয়রোগের আশঙ্কা হইলেই, একজন চিকিৎসক দ্বারা কাশি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, যে উহাতে উক্ত রোগের জীবাণু রহিয়াছে কিনা; কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, অনেক লোকের কাশিতে ক্ষয়রোগের জীবাণু দেখা না গেলেও, শরীরে বাস্তবিক ক্ষয়রোগ হইতে পারে। সেই জন্য কাশিতে জীবাণু পাওয়া না গেলেও, ক্ষয়রোগের অন্যান্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলেই চিকিৎসা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

ফুস্‌ফুসের ক্ষয়রোগের (যক্ষ্মার) সাধারণ লক্ষণগুলিই উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা অন্যান্য অঙ্গও আক্রান্ত হইতে পারে। এই রোগ গলায় হইতে পারে, এবং তাহা হইলে উপরি-উক্ত লক্ষণগুলি ব্যতীত স্বর ভঙ্গ এবং গলাধঃকরণ কালে বেদনা অনুভূত হয়। হাড়ের ক্ষয়রোগ অনেক সময় দেখা যায়। ইহাতে উরু সন্ধি আক্রান্ত হইয়া এক পা খর্ব্ব হইয়া পড়ে। মেরুদণ্ডে এই রোগ হইলে, পৃষ্ঠ কুব্জ, অথবা পৃষ্ঠের এক পার্শ্ব বক্র হইয়া যায়। শিশুদিগের মধ্যে গলগণ্ডের আকারে আর এক জাতীয় ক্ষয়রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। গলার সম্মুখদিকে ও পশ্চাদভাগে উভয় দিকেই মাংশপিণ্ড বাড়িয়া উঠে। এইরূপ অবস্থায় শিশু সাধারণতঃ ফ্যাকাশে ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; এবং প্রায়ই চক্ষে ও কর্ণে বেদনা হয়।

ক্ষয়রোগের জীবাণু কিরূপে শরীরে প্রবেশ করে?

১। আমাদের নিশ্বাস বায়ুর সঙ্গে উহারা ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে।

২। খাদ্য বস্তুর সঙ্গে উহারা শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। অনেক গরু ও অন্যান্য পশু ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়। সেই সমুদয় পশুর মাংস ভক্ষণ বা দুগ্ধ পান করিয়া অনায়াসে ক্ষয়রোগ হইতে পারে। তারপর উক্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিগণ বাজারের বা রান্নাঘরের জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করিলে, তাহাদের হাত মুখ ও নাসিকা হইতে রোগ জীবাণু খাদ্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত হয়,

এই প্রকারে রোগ জীবাণু বিস্তৃত হয়

এবং উহা ভক্ষণ করিয়া সুস্থ দেহ ব্যক্তিগণ ক্ষয়রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে।

৩। চামড়ার কোন আহত বা ক্ষত স্থানের মধ্য দিয়াও রোগ জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিতে পারে।

ক্ষয়রোগের বিস্তার প্রতিরোধ

ক্ষয়রোগ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির ইহা জানা উচিত যে তাহার কাশি ও থুথু দ্বারা রোগ বিস্তার হইয়া থাকে। তাহার কাশিবার ও হাঁচিবার সময়ে মুখ ও নাসিকা হইতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা বাহির হয়। ঐ সমুদয় ক্ষুদ্র কণিকায় ক্ষয়রোগের বহু জীবাণু রহিয়াছে, এবং উহারা ধূলি ও বাতাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া, সুস্থ দেহ ব্যক্তিগণের নিশ্বাসের সহিত তাহাদের ফুস্‌ফুসে

প্রবেশ করিয়া ক্ষয়রোগ বিস্তার করে। ক্ষয়রোগ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তিগণের থুথু অসংখ্য রোগ জীবাণু পরিপূর্ণ। এই জন্য যে স্থানে থুথু ফেলিলে উহা শুষ্ক হইয়া ধূলিতে পরিণত হইবার আশঙ্কা থাকে, এইরূপ স্থানে কখনও তাঁহারা থুথু ফেলিবেন না, কারণ রোগীদের থুথু দ্বারা অধিকাংশ স্থলে সহজেই যে এই রোগ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যাঁহারা ক্ষয়রোগে ভুগিতেছেন তাঁহারা কখনও মুখে বা নাসিকার সম্মুখে রুমাল বা কাগজ প্রভৃতি কিছু না ধরিয়া কাশিবেন না বা হাঁচিবেন না।
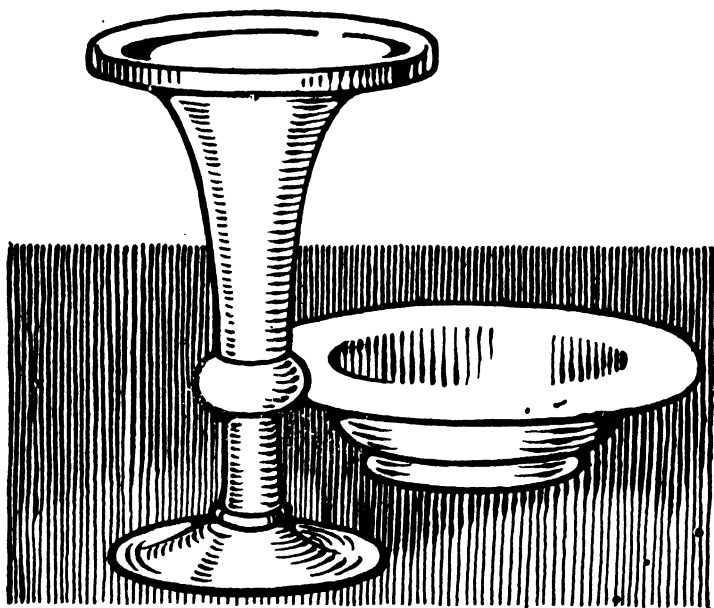
দুই প্রকারের পিক্‌দানি

কাগজ ব্যবহার করিলে, উহা পরক্ষণেই পুড়াইয়া ফেলিবেন। রুমাল ব্যবহার করিলে, উহা শুধু ঐ নিমিত্তই রাখিয়া দিবেন, কখনও সাধারণ রুমালের ন্যায় ব্যবহার করিবেন না। ব্যবহারের পরে উক্ত রুমাল পুড়াইয়া ফেলিবেন বা সিদ্ধ করিয়া লইবেন।

রোগী নিজ গৃহে থুথু ফেলিবার জন্য একটী ঢাকনীদার পিক্‌দান ব্যবহার করিবেন। উক্ত পিক্‌দানের বহির্ভাগ পরিচ্ছন্ন রাখিবেন ও যাহাতে উহার উপরে মাছি বসিয়া চারিদিকে রোগ জীবাণু বিস্তার করিয়া অন্য কাহাকেও রোগাক্রান্ত করিতে না পারে, এই জন্য সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবেন।

কোন ক্ষয়রোগীকে গৃহের বাহির হইতে হইলে, তাহার থুথু ফেলিবার জন্য, পকেটে করিয়া লওয়া যায় এরূপ একটী পাত্র (Pocket flask) সঙ্গে করিয়া লইতে হইবে। বাজারে এই জন্য বহুপ্রকার পাত্র আছে। টিনের একপ্রকার পাত্র আছে, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। ঐ পাত্রের মাপে একখানি কাগজ ভাঁজ করিয়া, ঐ পাত্রের মধ্যে রাখিতে হইবে। পরিষ্কার করিবার সময় ঐ কাগজখানি বাহির করিয়া পুড়াইয়া ফেলিলেই হইল। এই পকেট পিক্‌দানী প্রতিদিন বা একদিন অন্তর অন্তর দশ মিনিট করিয়া জলে সিদ্ধ করিতে হইবে।

ক্ষয়রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কখনও অপরের ভক্ষ্য বস্তু স্পর্শ করিবেন না।

রোগী কখনও নিজ থুথু গিলিয়া ফেলিবেন না। এইরূপ করিলে রোগ জীবাণুর সংখ্যা রোগীর অন্ত্র মধ্যে বাড়িতে থাকিয়া রোগীর মৃত্যুকাল আসন্ন করিয়া দিবে।

ক্ষয়রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ

ক্ষয়রোগীর থুথু দ্বারাই এই রোগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত হয়। রাস্তায়, দোকানে, থিয়েটারে, বায়স্কোপে, হাটে বাজারে, ট্রামে, গাড়ীতে, ষ্টেশনে সর্ব্বত্র যে ধূলিকণা উড়িতেছে, তন্মধ্যে ক্ষয়রোগীর শুষ্ক থুথুও মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং ক্ষয়রোগের জীবাণু উহাতে বর্ত্তমান। মানুষের দেহে যে উক্ত জীবাণু অল্পাধিক প্রবেশ করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু দেহ যদি সুস্থ এবং সবল হয়, এবং নাসিকায় যদি সর্দ্দি না থাকে, তবে দেহের সতেজ রক্ত উহাদিগকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ। কিন্তু দেহ যদি অপ্রচুর ও সামান্য খাদ্য গ্রহণ করিয়া বা অতিরিক্ত পরিশ্রম, অথবা কোন প্রকার অত্যাচার দ্বারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে রোগ জীবাণু বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত উহার আর শক্তি থাকে না। যাহারা কোন প্রকার মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে, অন্যান্য লোকদের অপেক্ষা তাহাদের ক্ষয়রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা অধিক, এবং একবার আক্রান্ত হইলে আরোগ্য হইবার আশাও উহাদের খুবই কম।

তামাক ব্যবহার করিলে ফুস্‌ফুস্ ও গলদেশ পীড়িত হয় বলিয়া, তামাক-সেবী সহজেই ক্ষয়রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে।

সহর, বন্দর, প্রভৃতি যে সমুদয় স্থানে বসতি খুব ঘন, সেই সকল স্থানে এই রোগ দ্বারা লোক সহজেই আক্রান্ত হইতে পারে; কিন্তু গ্রামে বা অন্য যে স্থানে বসতি ঘন নহে, সেই সকল স্থানে বাস করিলে ক্ষয়রোগ দ্বারা সংক্রামিত হইবার আশঙ্কা খুব কম।

বাসগৃহের অবস্থার উপরে স্বাস্থ্য অনেকাংশে নির্ভর করে। ঘর ছোট অথচ লোক সংখ্যা অধিক হইলে সেই গৃহে বিস্তর পীড়া হইবে। সাধারণ

আয়তন বিশিষ্ট কক্ষে কখনও দুই বা তিন জনের অধিক শয়ন করা উচিত নহে এবং ঐরূপ কক্ষে বড় বড় দুই তিনটা জানালা না থাকিলে, ঐরূপ সংখ্যক লোকেরও একত্র শয়ন করা কখনও উচিত নহে। প্রত্যেক কক্ষের দেওয়ালে অন্ততঃ দুইটী বড় বড় জানালা রাখা প্রয়োজন।

রাত্রিকালে জানালা খোলা রাখিতে হইবে, কারণ জানালা বন্ধ রাখিলে ঘরের বাতাস দূষিত হইয়া স্বাস্থ্য হানি করে।

যে সকল ঋতুতে ধূলির মাত্রা খুব বেশী হয়, সেই সকল ঋতুতে কোন ধূলিপূর্ণ স্থান ঝাঁট দিবার পূর্ব্বে জল ছিটাইয়া লইবেন।

ক্ষয়রোগ নিবারণ করিতে হইলে, নিজ নিজ গৃহ ও উহার চতুঃপার্শ্ব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে, কারণ তাহা হইলে মাছির উপদ্রব হইবে না; মাছি ক্ষয়রোগের বীজ ইতস্ততঃ বহন করিয়া থাকে। মাছি সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ ৪৮শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

ক্ষয়রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত থালাবাটি, চামচে, তোয়ালে প্রভৃতি গরম জলে ফুটাইয়া না লইয়া কখনও অপর কাহারও ব্যবহার করা উচিত নহে। দুগ্ধ ও মাংস দ্বারা এই রোগ বিস্তৃত হয় বলিয়া, সুসিদ্ধ না করিয়া ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নহে।

কোন কোন বিশেষ ব্যবসায়ে যাহারা লিপ্ত থাকে, তাহারা অনেক সময়ে ক্ষয়রোগে সহজে আক্রান্ত হয়। যাহারা সিগারেট প্রস্তুত করে, চাউলের কলে কাজ করে, বা পাথর কাটাই ব্যবসায় করে, তাহারা ধূম ও ধূলিপূর্ণ বায়ু নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া, প্রায়শঃই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যাহারা নুইয়া কাজ করে, যেমন দর্জ্জি, ঝুড়ি বা চুপরি নির্ম্মাতা, ছাপাখানায় যাহারা অক্ষর সাজায় (Compositor) প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই রোগ বিশেষ পরিমাণে দেখা যায়। স্কুল কলেজের অনেক ছাত্রও অবনত হইয়া বহুক্ষণ লেখা পড়া করে, কিন্তু গৃহের বাহিরে যাইয়া মোটেই ব্যায়াম করে না বলিয়া সহজেই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

ক্ষয়রোগের প্রতীকার

ক্ষয়রোগ হইলেই যেন কেহ নিরাশ না হন। এই রোগ আরোগ্য হইতে পারে। কেহ এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে, যত সত্বর তাহার চিকিৎসা আরম্ভ হইবে, ততই তাহার আরোগ্য লাভ অধিক নিশ্চিত। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় যে যে লক্ষণ এই অধ্যায়ের প্রথমে বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ পাইবামাত্র সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ক্ষয়রোগ দূর করিবার এক মাত্র উপায়—শরীরের সামর্থ্য বাড়াইয়া তোলা, তাহা হইলে শরীরই, রোগের জীবাণু প্রতিরোধ এবং ক্রমশঃ বিনষ্ট করিতে

সমর্থ হইবে। ইহা অতি ধীরে ধীরে হইয়া থাকে; এই জন্য উক্ত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইলে রোগীর মনে রাখিতে হইবে যে দুই এক সপ্তাহে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নহে। শরীরের সামর্থ্য বাড়াইয়া রোগের প্রতীকার করিতে হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে:—সকল সময় প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পরিমিত স্বাস্থ্যকর খাদ্য, গৃহের বাহিরে মুক্ত বায়ুতে অধিক সময় যাপন, বিশ্রাম করা, এবং সকল প্রকার উৎকণ্ঠা ত্যাগ করা।

কেবল ক্ষয়রোগের চিকিৎসার জন্য কয়েক স্থানে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সম্ভব হইলে ক্ষয়রোগীর এইরূপ হাসপাতালে যাওয়া যুক্তিযুক্ত।

ক্ষয়রোগীকে এইরূপে খোলা বাতাসে রাখিতে হয়

কয়েকটী বড় বড় সহরে কেবল ক্ষয়রোগীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তারখানা আছে। এই সকল ডাক্তারখানার মধ্যে কতকগুলিতে দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে ও বিনা পারিশ্রমিকে ঔষধ ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

ক্ষয়রোগ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি গৃহের বাহিরে যাইতে অসমর্থ হইলে, নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই, যে প্রকার উপদেশ নিম্নে প্রদত্ত হইল, তদনুযায়ী চলিতে থাকিলে গৃহে বসিয়াই আরোগ্য লাভ সম্ভব হইতে পারে।

রোগীর নিজের নিমিত্ত একটী পৃথক কক্ষ থাকা কর্ত্তব্য, এবং তথায় অপর কেহ বাস করিতে পারিবে না। উক্ত কক্ষে বড় বড় জানালা থাকিবে, এবং জানালাগুলি দিবা রাত্র সকল সময়েই খোলা রাখিতে হইবে। রোগীর জন্য একখানি বেশ ভাল বিছানা রাখিয়া দিবেন। দিনের বেলা রোগী

গৃহের বাহিরে কোন গাছতলায় বা অপর কোন ছায়াযুক্ত স্থানে বিছানা পাতিয়া শয়ন করিবেন। প্রতি বড় গেলাসের এক এক গ্লাস জলে বড় চামচের এক এক চাম্‌চে "কার্ব্বলিক এ্যাসিড" অথবা "ক্লোরাইড্ অব লাইম্" মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা রোগীর ঘরের মেঝে ও দেওয়াল, পরিষ্কার করিবেন।

প্রতিদিন রোগীর বিছানা পত্র কয়েক ঘণ্টা রৌদ্রে দিবেন।

রোগীকে যতদূর সম্ভব পুষ্টিকর ও উত্তম খাদ্য দিতে হইবে। ক্ষয়কাশের রোগীর পক্ষে ডিম, দুধ, দুধের সর, ভালরূপে সিদ্ধ করা ভাত, টাট্‌কা শাক-সব্‌জি, ও ফলমূল অতিশয় উপকারী খাদ্য। উপযুক্ত খাদ্য কি কি, এবং কিরূপে উহা প্রস্তুত করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বারংবার স্নান করিয়া শরীর পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। কাপড় চোপড় সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

সকালে ও রাত্রিকালে দাঁত মাজিয়া, দাঁত পরিষ্কার রাখিবেন। দাঁত পরিষ্কার রাখিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ক্ষয়কাশের রোগীর জ্বর থাকিলে কোন প্রকারে নাড়াচাড়া করা উচিত নহে। জ্বর না থাকিলেও যাহাতে কোন প্রকার ক্লান্তি বোধ বা জ্বর হয় এরূপ বেশী চলাফিরা করিবেন না।

রোগীর পরিবারস্থ অপর কেহ যাহাতে তাহার ব্যাধি দ্বারা সংক্রমিত না হয়, তৎপ্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রোগীর আহারের বাসন, পরিচ্ছদ, গামছা ও বিছানাদি পৃথক্ রাখিবেন; পরিবারস্থ অপর কেহ যেন কোন মতে ঐ সকল ব্যবহার না করেন। ঐ সমুদয় ধৌত মার্জ্জনা করিবার সময় গৃহের অন্যান্য বাসন ও বস্ত্রাদির সহিত ঐগুলি মার্জ্জনা বা ধৌত করিবেন না।

ক্ষয়রোগী কখনও কোন শিশুকে আদর বা চুম্বন বা অপরের খাদ্য দ্রব্যাদি স্পর্শ করিবে না।

রোগীর গৃহ হইতে যতদূর সম্ভব মাছি দূর করিবার চেষ্টা করিবেন। বিশেষতঃ মাছি যেন কোন মতেই রোগীর থুথুর উপরে বসিতে না পারে এই জন্য পিক্‌দান সকল সময় আবৃত রাখিবেন।

সর্ব্বদা বেশ স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকা ক্ষয়রোগ আরোগ্য করিবার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিলে বহু ফল দর্শায়; কারণ একমাত্র ঈশ্বরই মানুষের সকল প্রকার ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন। যদি কেহ নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া মৃত্যু সুনিশ্চিত বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহার মৃত্যু প্রায় সুনিশ্চিত।

কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার রোগীকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত রোগীর কোন ঔষধ গ্রহণ করা উচিত নহে। ক্ষয়রোগে কড্‌লিভার অয়েল উপকারী হইলেও উহা অনেকটা পথ্যের মত। "মল্ট একস্‌ট্রাক্ট" মিশ্রিত, কড্‌লিভার অয়েলও এই রোগে বিশেষ ফলদায়ক। উহা দৈনিক কি পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত, তাহা বোতলের গায়ে কাগজে লিখিত আছে। আহারের সময় দৈনিক তিন বার ছোট চামচের এক চাম্‌চে প্রতিবারে গ্রহণ করাই যথেষ্ট।

রোগীর প্রতিদিন মলত্যাগ করা আবশ্যক। (২৯শ অধ্যায়ের নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য।) শরীর হইতে বিষাক্ত দূষিত পদার্থ ধৌত করিতে সাহায্য করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে জলপান করা অতিশয় প্রয়োজন।

কাশির মাত্রা কষ্টদায়ক হইলে, ৩৬শ অধ্যায় বর্ণিত, সর্দ্দি ও ব্রঙ্কাইটিসের চিকিৎসা-বিধি অনুযায়ী চিকিৎসা করিতে হইবে।

ক্ষয়রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের কখন কখন প্রাতঃকালে কাশির বেগ হইয়া থাকে। ইহা নিবারণের জন্য প্রতিদিন সকালে আহারের পূর্ব্বে পনের গ্রেণ পরিমাণ (চা চামচের চারি ভাগের এক ভাগ) খাইবার সোডা মিশ্রিত এক গেলাস অতি গরম দুধ অথবা অতি গরম জল পান করিবেন।

রোগীর জ্বর হইলে, অল্প পরিমাণ ঠাণ্ডা জল দ্বারা তাঁহাকে আধ ঘণ্টা বা কিছু বেশীকাল স্পঞ্জ করিয়া দিবেন (১২২ ও ১২৩ পৃষ্ঠার স্পঞ্জিং দেখুন)।

মুখ দিয়া রক্ত পড়িলে রোগী চুপ করিয়া থাকিবেন। ভারী কোন বস্তু উত্তোলন করিলে, অথবা জোরে চলাফিরা বা ব্যায়াম করিলে অনেক সময়ে ঐরূপ রক্ত পড়িতে পারে। রক্তের মাত্রা খুব বেশী হইলে, বরফ জলে এক খণ্ড কাপড় ভিজাইয়া বুকের সম্মুখভাগে দিতে থাকিবেন। কাপড় যাহাতে সর্ব্বদা শীতল থাকে সেই জন্য মাঝে মাঝে উঠাইয়া লইয়া আবার ভিজাইয়া লইবেন, বরফ পাওয়া না গেলে একখানি কাপড় ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া লইয়া পরে উহার দুই কোণ দুই হাতে ধরিয়া বাতাসে কিছুকাল দোলাইতে থাকিবেন। এইরূপে উহা অতিশয় শীতল হইবে।

কেহ ক্ষয়রোগ হইতে সারিয়া উঠিলেও সর্ব্বদা তাহার মনে রাখা উচিত যে পুনরায় ঐ রোগ হইতে পারে; পুনরায় যাহাতে ঐ রোগ দ্বারা আক্রান্ত না হন, তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে; যথারীতি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করিবেন, এবং এই অধ্যায়ের প্রথমাংশে উল্লিখিত ক্ষয়রোগ সংক্রমনের বিষয়গুলি পরিহার করিবেন।

৩৯শ অধ্যায়

ম্যালেরিয়া

(Malaria)

ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া অতিশয় ব্যাপক, এবং প্রতিবৎসরে সহস্র সহস্র লোক ইহা দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই রোগের আক্রমণ অতি সহজেই নিবারণ করা যাইতে পারে; কারণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কেবল যে মশক একবার কোন ম্যালেরিয়া ব্যাধিগ্রস্ত লোককে দংশন করিয়াছে সেই মশক অপর কোন লোককে দংশন করিলেই সে ব্যক্তির ম্যালেরিয়া হইবে।

ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে যে ম্যালেরিয়া জীবাণু বৃদ্ধি পায়, তদ্দ্বারাই ঐ রোগের সৃষ্টি হয়। ম্যালেরিয়া গ্রস্ত কোন লোককে কোন মশক দংশন করিয়া তাহার রক্ত চুষিয়া লয়। এই রক্তে ম্যালেরিয়া জীবাণু থাকে; তাই ঐ মশক অপর কোন লোককে দংশন করিয়া তাহার দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়, ফলে তাহারও শীতকম্প করিয়া জর আইসে।

সকল প্রকার মশকই ম্যালেরিয়ার বিষ বহন করে না। যে জাতীয় মশক এই ব্যাধি বহন করিয়া থাকে, তাহাদিগের আকৃতি এবং কোন বস্তুর উপরে বসিবার স্বাভাবিক ভঙ্গী দেখিয়া, তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায়। ম্যালেরিয়াবাহী মশক ও সাধারণ মশকের পার্থক্য চিত্র দ্বারা সহজে বুঝা যাইবে।

ম্যালেরিয়াবাহী মশকের সংখ্যা অন্যান্য মশকের ন্যায় অধিক নহে, তথাপি অন্যান্য মশক যে স্থানে থাকে, সাধারণতঃ উহারাও সেই স্থানে অবস্থান করে।

ম্যালেরিয়া বিস্তারের প্রতিরোধ

ম্যালেরিয়া বিস্তারের প্রতিরোধ করিবার জন্য, কেবল মশক বিনষ্ট করা আবশ্যক। মশক যাহাতে ডিম পাড়িতে না পারে, তাহা করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার হইবে। মশক কেবল জলেই ডিম পাড়িতে পারে। স্ত্রীমশকগুলি পুকুরে, ধান্যক্ষেত্রে, জলের ডোবায়, বাল্‌তিতে, কলসীতে, খালিটিনে, নারিকেলের মালায় অথবা যাহাতে জল দাঁড়াইতে পারে, এই প্রকার স্থানে ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিমগুলি দুই তিন দিনের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকায় পরিণত হয়। পুকুরে বা ডোবার মধ্যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকার আকৃতি ও তাহাদের গতিবিধি সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। দুই সপ্তাহের মধ্যে ডিম্বকীটগুলি পূর্ণাকৃতি মশকে পরিণত হয়।

মশকের বৃদ্ধি পাওয়া বা ডিম পাড়া বন্ধ করিবার জন্য পুকুর এবং খানা ডোবা প্রভৃতি জল নিষ্কাশন করা আবশ্যক। মশক কখনও স্রোতের জলে ডিম পাড়িতে পারে না। ড্রেন, পরিখা প্রভৃতি গভীর ভাবে খনন করা প্রয়োজন; পরিখার দুইধারে ঢালু না থাকিয়া যেন লম্বাভাবে থাকে, এবং যাহাতে ঘাস ও আগাছা জন্মিতে না পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অনেক স্থলে বর্ষাকালে জল নিষ্কাশন করা সম্ভব নহে, এবং এই জন্য পুকুরে ও ডোবায় জল জমিয়া থাকে। পুকুরের জল দূর করা সম্ভব না হইলে, উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছ ছাড়িয়া দিবেন বা হাঁস পালিবেন; কারণ মাছ ও হাঁস উভয়েই
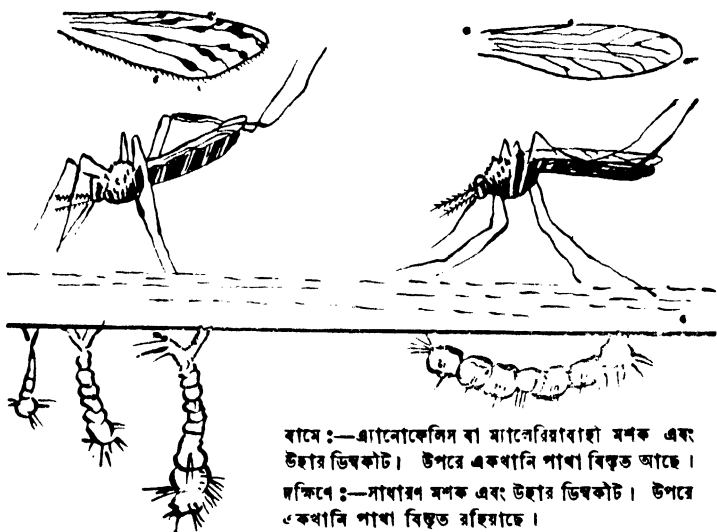
বামে :—এ্যানোফেলিস বা ম্যালেরিয়াবাহী মশক এবং উহার ডিম্বকীট। উপরে একখানি পাখা বিস্তৃত আছে।
দক্ষিণে :—সাধারণ মশক এবং উহার ডিম্বকীট। উপরে একখানি পাখা বিস্তৃত রহিয়াছে।

মশকের ডিম্বকীট খাইয়া ফেলে, ও এইরূপে মশকের সংখ্যা আর বাড়িতে পারে না। ডোবায়, পুকুরে বা জলপূর্ণ কোন স্থানে মশক নিবারণের নিমিত্ত জলের উপরে কেরোসিন ছিটাইয়া দিলে বেশ উপকার হয়। কারণ জলের উপরে উক্ত তৈল ছিটাইয়া দিলে যে স্তর পড়িবে তাহাতে ডিম্বকীটগুলি বাতাস না পাইয়া মরিয়া যাইবে। এই উদ্দেশ্যে খুব বেশী পরিমাণ তৈলের আবশ্যক হইবে না। বড় এক পিপা জলের মশকডিম্ব নষ্ট করিতে বড় এক চামচে তৈল যথেষ্ট। ২০ ফিট দীর্ঘ এবং ২০ ফিট প্রশস্ত একটা ডোবার নিমিত্ত একটা বড় গেলাস পরিপূর্ণ তৈল হইলেই চলিতে পারে। দুই এক দিন অন্তর বৃষ্টি হইলে, সপ্তাহে এক দিন মাত্র পুকুরে কেরোসিন ছড়াইয়া দিলেই চলিবে।

মশক যে স্থানে ডিম পাড়ে, সেই স্থান হইতে অধিক দূরে কখনও উড়িয়া যায় না। এই জন্য বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে ২০০ ফিটের মধ্যে যে যে স্থানে বদ্ধ জল বা ডোবা খানা আছে, সেই সকল স্থানে কেরোসিন ছড়াইয়া দিলে মশক নিবারণ করা যাইতে পারে। গৃহের চারিপার্শ্বে যেন কোথায়ও পুরাতন টিনে, হাঁড়ি কলসীতে বা বাঁশের মধ্যে জল জমিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ছাতের কিনারায় পয়োনালী থাকিলে তাহা দুই এক সপ্তাহ অন্তর পরিষ্কার করিয়া দিবেন, যেন তথায় জল জমিতে না পারে।

ম্যালেরিয়া নিবারণের আর একটী উপায়, রাত্রিকালে মশারী টাঙ্গাইয়া শয়ন করা। যে মশক দ্বারা ম্যালেরিয়া বিস্তৃত হইয়া থাকে তাহা দিনের বেলা কদাচিৎ কামড়াইয়া থাকে; সাধারণতঃ সূর্য্যাস্তের পরে উহারা কামড়ায়। মশারী সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক এবং উহা প্রতিরাত্রে খাটাইয়া ভাল করিয়া চারিদিক গুঁজিয়া দিয়া শয়ন করিবেন। বিদেশে ভ্রমণ কালে নিজ নিজ মশারী অবশ্যই সঙ্গে লইবেন, এবং প্রতি রাত্রে টাঙ্গাইয়া শুইবেন; শিশুদিগকেও মশারী টাঙ্গাইয়া দিবেন।

লক্ষণসমূহ

ম্যালেরিয়ার সাধারণ লক্ষণগুলি প্রায় সকলেরই জানা আছে; শীতকম্প-সহ জ্বর, ঘর্ম্ম ও মাথাধরা। সাধারণতঃ শীতকম্প হইবার পূর্ব্বে রোগীর দুর্ব্বলতা বোধ হইবে। এতদ্ব্যতীত মাথাধরা, বমি বমি ভাব এবং বমনও থাকিতে পারে। ছোট ছোট শিশুদের ম্যালেরিয়ার সময়ে তড়কাও হইতে পারে। শীতকম্পের পরে জ্বর ১০৩° বা ১০৪° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। জ্বর দুই তিন ঘণ্টা থাকিবার পর রোগীর ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ করে; তৎপরে জ্বর থামিয়া যায়। প্রতিদিন জ্বরের আক্রমণ হইতে পারে; তবে সাধারণতঃ একদিন বা দুই দিন অন্তর জ্বরের আক্রমণ হইয়া থাকে। আবার কখনও বা অনিয়মিত ভাবে—যেমন সপ্তাহের মধ্যে বা মাসের মধ্যে দুই একবার মাত্র জ্বর হয়।

ম্যালেরিয়া নানা রকমের। অনেক রোগীর ম্যালেরিয়ায় টাইফয়েডের লক্ষণ দেখা যাইতে পারে; কোন কোন স্থলে রোগীর খুব মাথাধরাই হয়ত প্রধান লক্ষণ হয়। অল্প বয়স্ক বালকবালিকাগণের কখন কখন ম্যালেরিয়ায় পেটে অসুখ হয়, এবং ক্রমশঃ তাহাদের দেহ শীর্ণ হইয়া যায়।

প্রতীকার

কুইনাইন্ ম্যালেরিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা ফলদায়ক ঔষধ। যে সকল রোগীর দুইদিন বা তিনদিন অন্তর কোন নির্দ্দিষ্ট সময় জ্বর আসিয়া থাকে, তাহাদিগকে

নিম্নলিখিত উপায়ে কুইনাইন্ দেওয়া ভাল। যে দিন শীতকম্প হইবার আশঙ্কা, তার পূর্ব্বদিন্ অপরাহ্ণে "এপ্‌সম্ সল্ট" অথবা "ক্যাষ্টর অয়েল" দ্বারা একটা জোলাপ লইবেন। অপরাহ্ণ তিনটার সময় শীতকম্পের সম্ভাবনা হইলে পূর্ব্বাহ্ণ ৯টায় ১৫ গ্রেণ কুইনাইন্ খাইবেন। তারপর দ্বিতীয় বার যখন জ্বর আসিবার সম্ভাবনা, তাহার ছয় ঘণ্টা পূর্ব্বে আবার ১৫ গ্রেণ কুইনাইন্ খাইবেন; এইরূপে দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত কুইনাইন্ খাইতে থাকুন। একমাত্রা কুইনাইনেই হয়ত ম্যালেরিয়া দূর হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া, কুইনাইন্ প্রয়োগ করা বন্ধ করিবেন না। কারণ তাহা হইলে কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই, পুনরায় ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইবে। শরীরের সমুদয় ম্যালেরিয়া জীবাণু বিনষ্ট করিবার জন্য কয়েক মাত্রা কুইনাইন্ খাওয়া আবশ্যক।

শীতকম্প হইবার যদি সময় স্থির না থাকে, তবে সকাল বেলা আহারের পর ১০ গ্রেণ এবং রাত্রির আহারের পর ১০ গ্রেণ কুইনাইন্ খাইবেন। এইরূপে এক সপ্তাহ বা দশ দিন কাল প্রতিদিন দুইবার করিয়া প্রতিবারে ১০ গ্রেণ পরিমাণ কুইনাইন্ খাইতে থাকুন। তারপর আরও দুই তিন সপ্তাহ বা তদধিক কাল দৈনিক দুইবার করিয়া প্রতিদিন ৫ গ্রেণ পরিমাণে খাইতে থাকিবেন।

শিশুদিগের ম্যালেরিয়া হইলে প্রতিবারে এক গ্রেণ করিয়া দৈনিক পাঁচ বার কুইনাইন্ দেওয়া উচিত। এক হইতে তিন বৎসর বয়স্ক শিশুদিগকে, দৈনিক পাঁচবার, প্রতিবারে এক বা দুই গ্রেণ পরিমাণ দিতে পারা যায়। তিন হইতে দশ বৎসর বয়স্ক শিশুদিগকে, এইরূপ দিবসে পাঁচবার, প্রতিবার দুই বা তিন গ্রেণ পরিমাণ দেওয়া কর্ত্তব্য।

ছয় বৎসর বয়স্ক বালকবালিকার ম্যালেরিয়া নিবারণ কল্পে দৈনিক দুই গ্রেণ কুইনাইন্ দেওয়া যাইতে পারে। তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া কুইনাইন ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ উহাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

৪০শ অধ্যায়

বসন্ত ও টীকা-প্রদান

(Small-pox and Vaccination)

যাবতীয় সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে বসন্ত একটী অতিশয় ভীষণ রোগ। মানবজাতি যত প্রকার স্পর্শাক্রমক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে বসন্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্পর্শাক্রমক। বসন্তের প্রাদুর্ভাব কালে যাহাদের টীকা দেওয়া হয় নাই, তাহাদের শতকরা দুই একজন ব্যতীত প্রায় সকলেই উহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ স্ত্রী সকলেরই এই রোগ হয়। পুরাকাল হইতেই সকল দেশের মানুষই এই রোগকে যত ভয় করে, আর কোন রোগকে সেইরূপ ভয় করে না; কারণ ইহা শুধু স্পর্শ-সংক্রামক নহে, কিন্তু যখন এই রোগ যাহাদের টীকা দেওয়া হয় নাই, তাহাদের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়, তখন মৃত্যু সংখ্যা শতকরা পঁচিশ হইতে পঞ্চান্ন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বসন্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেও, বসন্তের দাগে তাহার মুখ বিকৃত হয় অথবা এক চক্ষু বা উভয় চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়।

চিকিৎসকগণ সকলেই বলিয়া থাকেন যে, এক প্রকার ক্ষুদ্র জীবাণু দ্বারাই বসন্ত রোগ উৎপন্ন হয়, কিন্তু এযাবৎ কোন্ বিশেষ জীবাণু দ্বারা ইহা হয়, তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। বসন্ত রোগীর মুখ ও নাসিকা হইতে নির্গত লালা ও কফ্, এবং আরোগ্য হইবার সময় গাত্র হইতে স্খলিত শুষ্ক মামড়ি ও আঁইশ বড়ই দূষিত, ও ইহা নিশ্চিত সংক্রামক। যাহাদের টীকা হয় নাই, এইরূপ একশত ব্যক্তির মধ্যে যদিও আটানব্বই কি নিরানব্বই জনের বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তথাপি যাহারা মদ্য তামাক প্রভৃতি কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে না, এবং যাহারা বেশ পবিত্র জীবন যাপন করে, তাহাদের অমিতাচারী এবং স্খলিত চরিত্র লোকদের অপেক্ষা সহজে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা।

লক্ষণসমূহ

বসন্তরোগ দেহে প্রবেশ করিবার প্রায় বারদিন পরে, বসন্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ছোট বালকবালিকাদিগের রোগের প্রারম্ভে মাথাধরা শীতকম্প এবং পিঠে ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দারুণ বেদনা হইতে পারে। প্রথম দিন জ্বর ১০৩° ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইতে পারে। সাধারণতঃ চতুর্থ দিবসে বসন্তের গুটি সর্ব্বপ্রথমে কপালে এবং হাতের কব্জির উপরিভাগে প্রকাশ পাইয়া থাকে। গুটি প্রথমে ক্ষুদ্র লাল ব্রণের আকারে থাকিয়া দুই একদিনের মধ্যে বড় হয়,

এবং দুগ্ধের ন্যায় সাদা তরল পদার্থে পূর্ণ হইয়া উঠে, তারপর পুনরায় এই এক দিনের মধ্যে উক্ত দুগ্ধবৎ তরল পদার্থ পূঁজে পরিণত হয়।

প্রতীকার

বসন্ত আরোগ্য করিবার নিশ্চিত কোন চিকিৎসা নাই। যত্ন পূর্ব্বক শুশ্রূষা করা সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। রোগীকে শান্তভাবে বিছানায় শোয়াইয়া রাখিবেন। রোগীর কক্ষের দ্বারগুলি একেবারে বন্ধ না রাখিয়া, যাহাতে

এডওয়ার্ড জেনার তাঁহার পুত্রকে টীকা প্রদান করিতেছেন

রোগী প্রচুর পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ু পাইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। রোগীকে যথেষ্ট পরিমাণ সুসিদ্ধ শীতল জল পান করিতে দিবেন। জ্বর খুব বেশী হইলে রোগীকে ঠাণ্ডা জল দ্বারা স্পঞ্জ করিয়া দিতে হইবে। প্রতিদিন অথবা একদিন অন্তর একদিন "এপ্‌সম্ সল্ট" বা অন্য কোন উত্তম ঔষধ দ্বারা জোলাপ দিবেন।

বসন্তের ফোস্কা বা গুটির জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিবেন। অতি সূক্ষ্ম কোমল কার্পাস বস্ত্রখণ্ড শতকরা দুইভাগ কার্ব্বলিক এ্যাসিড্ মিশ্রিত শীতল জলে ভিজাইয়া লইয়া, তদ্দ্বারা সর্ব্বদা রোগীর মুখ ও হাত মুছাইয়া দিবেন। গুটিগুলি শুকাইয়া গিয়া তদুপরি খোসা পড়িলে, সেই সমুদয়ে ভ্যাসলিন্ প্রয়োগ করিবেন। বালকবালিকাদিগকে গুটিগুলি চুলকাইতে দিবেন না, কারণ তাহা হইলে বসন্তের দাগ খুব গভীর হইয়া যাইবে।

রোগীর চক্ষুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। বোরিক এ্যাসিড মিশ্রিত ঠাণ্ডা জলে (বোরিক এ্যাসিড্ সলিউসনে—৫০শ অধ্যায় ১নং ব্যবস্থা পত্র) এক টুকরা সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া লইয়া দুই এক ঘণ্টা অন্তর চক্ষুর পাতা মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবেন। চক্ষুর পাতা ভালরূপে বোরাসিক সলিউসন্ দ্বারা মুছিয়া ও শুষ্ক করিয়া পাতার প্রান্তভাগে একটু ভ্যাসলিন্ মাখাইয়া দিবেন। প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর অথবা দুই বা এক ঘণ্টা অন্তর চক্ষুর মধ্যে উপরি-উক্ত "বোরাসিক সলিউসন্" ফোঁটা ফোঁটা ঢালিয়া দিবেন।

মুখ ধৌত ও কুলকুচি করিবার ঔষধ (৫০শ অধ্যায় ৯নং ব্যবস্থা পত্র) ব্যবহার করিয়া সর্ব্বদা মুখ ও গলমধ্য পরিষ্কার রাখিবেন।

টীকা প্রদান

১৭৯৬ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে বসন্ত রোগ আরোগ্য করিবার কোন পন্থাই কেহ জানিতেন না; ইহা নিবারণের কোন উপায়ও তখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ঐ বৎসর জেনার নামক একজন ইংরেজ চিকিৎসক, বসন্ত রোগ হইতে রক্ষা পাইবার উপায়—টীকা প্রদানের প্রণালী আবিষ্কার করেন।

যে ক্ষুদ্র জীবাণু মানুষের মধ্যে বসন্ত রোগের সৃষ্টি করে, তাহাই গরুর মধ্যে গো-বসন্ত উৎপন্ন করিয়া থাকে। বসন্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত বাছুরের শরীর হইতে বীজ লইয়া মানুষকে টীকা দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা টীকা দেওয়া হইলে পর, যে স্থানে টীকা দেওয়া হয় সেই স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটী উঠিয়া থাকে। সেই সঙ্গে জ্বর হয়। এইরূপে টীকা দিবার ফলে মানুষ স্বল্প বা বহুদিনের জন্য বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে; এমন কি রোগীর সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করিলেও বসন্ত হয় না।

জেনার কর্তৃক টীকা প্রদানের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ উক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন; ফলে বিগত একশত বৎসরে পাশ্চাত্য দেশসমূহে বসন্ত রোগে মৃত্যুর হার অনেক কমিয়া গিয়াছে। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে জার্ম্মানীতে একটী আইন প্রচারিত হয় যে, সকলেরই দুইবার টীকা লইতে হইবে।

সেই আইন অনুসারে সকল শিশুকেই এক বৎসর হইবার পূর্ব্বে টীকা দিতে হইত, এবং বার বৎসর বয়সে পুনরায় টীকা দিতে হইত। সেই বৎসর হইতে জার্ম্মানীতে বসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় নাই। জার্ম্মানীতে লোক সংখ্যা পাঁচ কোটী চল্লিশ লক্ষ, ইহার মধ্যে শিশু ও বয়স্ক সর্ব্ব সমেত কেবল দশ জন বৎসরে বসন্ত রোগে মারা যায়।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলা নগর ও উহার উপকণ্ঠে বসন্ত রোগ নিবারণ করিবার জন্য, কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বে টীকা দিবার কোনই চেষ্টা করেন নাই; ফলে প্রতি বৎসর শুধু এই রোগে ছয় হাজারেরও অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত। তারপর যখন হইতে টীকা প্রদানের নিমিত্ত বাধ্যতামূলক আইন করা হইল, তখন হইতে ঐ অঞ্চলে বৎসরে বসন্ত রোগে একটীরও মৃত্যু হয় নাই।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জাপানে বসন্তের অতিশয় ভীষণ প্রকোপ ছিল। সেই বৎসরে জাপানের রাজসরকার এই আইন পাশ করিলেন যে, তিন মাস বয়স হইবার পূর্ব্বেই শিশুকে টীকা দিতে হইবে, এবং তৎপর বৎসর একবার ও পুনরায় দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে একবার অবশ্যই টীকা প্রদান করিতে হইবে। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত জাপানে বসন্ত রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে, এবং বর্ত্তমান কালে জাপানীদের মধ্যে ঐ রোগে অতি অল্প লোকেরই মৃত্যু হইয়া থাকে।

গো-বীজ দ্বারা টীকা দেওয়া বসন্ত রোগ নিবারণের একমাত্র উপায়। এক বৎসর বয়সের পূর্ব্বে একবার, এবং পুনরায় বিশ বৎসর বয়সে বালকবালিকাকে টীকা দেওয়া প্রত্যেক মাতাপিতার একান্ত কর্ত্তব্য।

জলবসন্ত

জলবসন্ত সংক্রামক ব্যাধি, তবে ইহা সচরাচর বিপদজ্জনক নহে। প্রথমে গায়ে মাথায় ও হাতের কব্জীতে গুটিকা বাহির হয়। এ গুটিকা দেখিতে অনেকটা মসূরিকা অর্থাৎ আসল বসন্তের মত। শিশুকে ঐ অবস্থায় যত জল চাহে, তত জল পান করিতে দিতে হইবে; এবং প্রতিদিন একবার গরম জলের ডুস্ দিতে হইবে (২০শ অধ্যায় দেখুন)।

গুটিকাগুলি ফোস্কায় পরিণত হইবার পরে, ফোস্কার উপরে "ভ্যাসেলিন্" মাখিয়া দিবেন (১১নং ব্যবস্থা পত্র দ্রষ্টব্য)। ফোস্কাগুলি কখনও চুলকাইবেন না, তাহা হইলে দাগ হইতে পারে। ১নং ব্যবস্থা পত্রের ঔষধ দ্বারা প্রতিদিন তিন বার চক্ষু ধৌত করিয়া দিবেন।

৪১শ অধ্যায়

প্রমেহ [গনোরিয়া] ও উপদংশ

(Gonorrhoea and Syphilis)

গনোরিয়া বা প্রমেহ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে, প্রথমে মূত্রনালী ফুলিয়া উঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ শ্বেত বা হল্‌দে পূঁজের ন্যায় পদার্থ নিঃসৃত হইতে থাকে। প্রমেহ রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তির সহিত সঙ্গম করিলে, প্রমেহ জীবাণু দেহে প্রবেশ করিয়া উক্ত রোগের সৃষ্টি করে। এই রোগ গ্রাম অপেক্ষা সহরেই খুব বেশী। প্রমেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের তোয়ালে প্রভৃতি ব্যবহার করিলে, অথবা তাহাদের মূত্র দ্বারা দূষিত কোন স্থানে বসিলে এই রোগ হইতে পারে; কিন্তু এই প্রকার রোগীর সংখ্যা খুবই কম।

প্রায় সকল স্থানেই অবৈধ সহবাস দ্বারা প্রমেহ রোগের সৃষ্টি হয়, সুতরাং পবিত্র জীবন যাপন করিলেই, এই রোগের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

লক্ষণসমূহ

অবৈধ সহবাসের পর তিন হইতে সাত দিনের মধ্যে সাধারণতঃ রোগের অবস্থা আরম্ভ হয়। মূত্রনালীতে চুলকানি, জ্বালা ও তীব্র যন্ত্রণা, প্রস্রাবের সময় জ্বালা, এবং মূত্রনালী হইতে জলবৎ পদার্থ নিঃসৃত হওয়া ইহার লক্ষণ। উক্ত জলীয় স্রাব অল্পকাল পরেই ঘন হল্‌দে অথবা শ্বেতবর্ণ হইয়া পড়ে।

উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে এই ব্যাধি দুই মাসের মধ্যেই আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ জননেন্দ্রিয় সাংঘাতিক ফুলিয়া উঠে, এবং তজ্জন্য হয়ত বহু মাস বা বৎসর ধরিয়া কষ্ট পাইতে হয়। এই রোগ হইতে হৃৎপিণ্ড, সন্ধি-স্থল, হাড়, যকৃৎ, ও বৃক্কদ্বয়ের পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। এই সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রোগাক্রান্ত হইলে, মৃত্যুও হইতে পারে। প্রমেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের চক্ষু প্রায়ই প্রমেহ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। যত প্রকার চক্ষু রোগ আছে, তন্মধ্যে ইহা দ্বারা যে রোগ সৃষ্ট হয়, তাহা অতি সাংঘাতিক, এবং সাধারণতঃ রোগীকে অন্ধ করিয়া ফেলে।

প্রতীকার

চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্তব্য। রোগী কোন প্রকার চলাফিরা করিবেন না। সম্ভব হইলে বিছানায় শুইয়া থাকা উচিত। প্রচুর পরিমাণে

জলপান করিবেন। জলের সঙ্গে লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া লইলে ভাল হয়। প্রতিদিন একমাত্রা "এপ্‌সম্ সল্ট" অথবা "সোডিয়াম্ সাল্‌ফেট্" গ্রহণ করিবেন। বেদনার উপশম করিবার ও পরিষ্কার রাখিবার জন্য দৈনিক তিন বার কিছু-ক্ষণের জন্য জননেন্দ্রিয় গরম জলে ভিজাইয়া রাখিবেন। স্রাব-দ্বারা কলুষিত সকল প্রকার কাপড়, তুলা ও কাগজ পুড়াইয়া ফেলিবেন, এবং ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সেই হাত তখনই ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবেন; নতুবা চক্ষে রোগ জীবাণু প্রবেশ করিয়া, চক্ষু অন্ধ করিয়া দিবে। অর্দ্ধ গেলাস জলে ছোট চামচের অর্দ্ধ চামচে পরিমাণ "সোডা বাইকার্ব্বনেট্" অর্থাৎ খাবার সোডা, অথবা "পটাশিয়াম্ সাইট্রেট্" মিশ্রিত করিয়া দৈনিক তিন বার পান করিবেন। এই ঔষধ আহারের এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা পরে সেবন করিতে হইবে। ফুলা এবং বেদনা কমিয়া গেলে মূত্রনালীতে দুইবার পিচ্‌কারী দ্বারা "আর্‌জিরল্" প্রবিষ্ট করাইয়া দিবেন। শতকরা ১৫ ভাগ "আর্‌জিরলের" একটী বোতল আনিবেন। ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঔষধ দিবার একটী যন্ত্র (a medicine-dropper) দ্বারা, মূত্রনালী মধ্যে অর্দ্ধ চামচে পরিমাণ উক্ত ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দিবেন। প্রত্যেকবার আর্‌জিরল্ প্রবেশ করাইয়া দিবার পরে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট কাল অঙ্গুলি দ্বারা জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগ চাপিয়া ধরিয়া রাখিবেন, যেন ঔষধ পড়িয়া না যায়। এতদ্ব্যতীত, প্রতিদিন আহারের পরে তিনবার পাঁচ গ্রেণ কবাব চিনির উদ্বায়ী তৈল (oleoresin of cubebs), অথবা ১০০ গ্রেণ "কোপাইবা বল্‌সাম্" (copaiba balsam) বটিকার আকারে খাইতে দিবেন। রোগ দূর করিবার জন্য, কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া, উপরি-উক্ত ঔষধসমূহ ব্যবহার করিতে হইবে।

প্রকৃত কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। খবরের কাগজে যাহারা প্রমেহ ও উপদংশ চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ বলিয়া প্রকাশ করে, কখনও তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন না। ঐ প্রকারে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচারিত কোন ঔষধ সেবন করিবেন না। ঐ জাতীয় ডাক্তার ও ঔষধ উভয়েই মিথ্যা চাতুরী মাত্র; উহারা রোগীর উপকার না করিয়া যথেষ্ট অপকারই সাধন করিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকদিগের প্রমেহ

অনেক লোক বিবাহের পূর্ব্বেই প্রমেহ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাই বিবাহ করিবার পরে তাহাদের স্ত্রীগণে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। বহু স্ত্রীলোক স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ কোন চিকিৎসককে এই রোগের কথা বলে না, তাই উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া একেবারে স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া দেয়।

লক্ষণসমূহ

প্রস্রাব করিবার সময় দারুণ জ্বালা ও যন্ত্রণা— ইহাই প্রথম লক্ষণ। বারবার প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা হয় এবং প্রস্রাব দ্বার হইতে শ্বেত ও হরিদ্রাভ স্রাব হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের প্রমেহ হইবার কিছুকাল পরে সাধারণতঃ জরায়ুর ব্যাধি উৎপন্ন হয়। ইহার ফলে শ্বেত প্রদর হইয়া থাকে (৪২শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। প্রমেহ রোগের ফলে স্ত্রীলোক অনেক স্থলে বন্ধ্যা হয়; শুধু ইহাই নহে, ক্রমাগত বহুবৎসর ধরিয়া তাহারা রোগ যাতনা ভোগ করে। স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয়ে যত প্রকার অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক প্রমেহ জনিত রোগের নিমিত্ত।

চিকিৎসা বিধি

বিছানায় শুইয়া থাকিতে হইবে, শ্বেত প্রদরের চিকিৎসার ন্যায় যোনি ধৌত করিবার নিমিত্ত ডুস্ ব্যবহার করিবেন (৪২শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য); প্রত্যহ উষ্ণ আকটি স্নান (২০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) করিবেন, এতদ্ব্যতীত পুরুষের প্রমেহ রোগে যে যে ঔষধ খাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাও খাইবেন।

স্ত্রীলোকদিগের প্রমেহ অতি সাংঘাতিক রোগ; সুতারং কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা উহার চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য।

উপদংশ (Syphilis)

উপদংশ বা সিফিলিস্ এক প্রকার জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং প্রায় সকল স্থলেই, উক্ত রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ সহবাসের ফলে এই রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জননীর উপদংশ রোগ থাকিলে, গর্ভস্থ সন্তানেরও উপদংশ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। পৃথিবীতে যত প্রকার সাংঘাতিক ব্যাধি আছে, তন্মধ্যে ক্ষয়রোগ ও উপদংশ অতিশয় ভয়ঙ্কর, এবং এই দুইয়ের মধ্যে শেষোক্ত ব্যাধির প্রকোপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

সহবাস দ্বারা উপদংশ রোগের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু অন্যান্য উপায়েও এই রোগ সংক্রামিত হইতে পারে; যেমন উপদংশ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে চুম্বন, তাহার কোন ক্ষত স্থানের সহিত আকস্মিক সংস্পর্শ; অথবা তাহার ব্যবহৃত ধূমপানের সরঞ্জাম কিংবা তাহার ব্যবহৃত বাটী, চামচে, থালা প্রভৃতির ব্যবহার ইত্যাদি।

লক্ষণসমূহ

জননেন্দ্রিয়ে অথবা যে স্থানে বিষ লাগে, তথায় একটী ক্ষুদ্র স্ফোটক অথবা ঘা প্রথমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সহবাসের পরে পাঁচ সপ্তাহ মধ্যে উহা প্রকাশ

পাইবে। ক্ষুদ্র স্ফোটকটীর উপর একটী কাঁচা অথচ শক্ত ঘা দেখা দেয়। এই ক্ষত প্রকাশ পাইবার পরে উরু-সন্ধিতে বাগি হয়।

প্রথম ক্ষত বা ক্ষতাঙ্কুর দৃষ্ট হইবার পর ছয় বা সাত সপ্তাহের মধ্যে, রোগীর সর্ব্বাঙ্গে তাম্রবর্ণ এবং হামের ন্যায় এক প্রকার ক্ষুদ্র স্ফোটক প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত মাথাধরা, বমনোদ্বেগ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণও থাকিতে পারে। এই সঙ্গে গলদেশে বেদনাও হইতে পারে। বগলের চামড়ায় এবং গুহ্যদ্বারে সপূঁজ গুটিকা প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্থানে স্থানে মাথার চুল খসিয়া পড়ে। সকল প্রকার উপদংশ রোগেই উপরি-উক্ত সমুদয় লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

রোগ কয়েক মাস বা কয়েক বৎসর থাকিবার পরে, উহা তৃতীয় অবস্থায় উপনীত হয়। শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে গভীর ক্ষত হইয়া থাকে। নাসিকা গলিত হইয়া খসিয়া পড়ে, এবং উহার ছিদ্র ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। উপদংশ রোগের ফলে মাথার খুলির এবং অন্যান্য অঙ্গের টুক্‌রা টুক্‌রা হাড় খসিয়া পড়িতে থাকে। উপদংশ দ্বারা মস্তিষ্ক, স্নায়ু, হৃৎপিণ্ড ও রক্তকোষের নানাপ্রকার সাংঘাতিক ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে।

চিকিৎসা

রোগীর উপদংশ রোগ হইয়াছে কিনা তাহাই নিশ্চিতরূপে সর্ব্বপ্রথমে স্থির করিতে হইবে, কারণ রোগের চিকিৎসা যত শীঘ্র আরম্ভ হইবে, তত সহজে উহা আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। অভিজ্ঞ চিকিৎসক ব্যতীত আর কেহ এই রোগ নির্দ্ধারণ করিতে পারে না।

ডাক্তার ভ্যাসারম্যান্ নামক জনৈক চিকিৎসক কিছুকাল পূর্ব্বে একটী পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা উক্ত রোগ সহজে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

উপদংশ রোগের নিমিত্ত "স্যাল্‌ভারসান্" (Salvarsan) ("৬০৬") উৎকৃষ্ট ঔষধ। "মার্কারী" এবং "আইওডাইড্ অব্ পটাশ্" দ্বারাও সুফল পাওয়া যায়। চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত ঐ সমুদয় ঔষধ ব্যবহার করিবেন না।

উপদংশ রোগাক্রান্ত অবিবাহিত ব্যক্তির কখনও দুই বৎসর কাল সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসা না করিয়া, এবং রোগের সমুদয় লক্ষণ সম্পূর্ণ দূর করিবার পরেও এক বৎসর কাল অপেক্ষা না করিয়া বিবাহ করা উচিত নহে। ইহার পূর্ব্বে বিবাহ করিলে সে তাহার স্ত্রী ও কোন সন্তান হইলে তাহাতে উক্ত রোগ সংক্রমিত করিয়া দিবে। এমন কি, বহু বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যক্তির প্রমেহ বা উপদংশ রোগ ছিল, এবং বর্ত্তমানে যাহার কোন লক্ষণ নাই, বিবাহ করিবার পরে তাহার পত্নীতেও উক্ত রোগ সংক্রমিত হইতে পারে।

৪২শ অধ্যায়

স্ত্রীরোগসমূহ

পঞ্চদশ অধ্যায়ে স্বাভাবিক ঋতুস্রাব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের এই ঋতুস্রাব সম্পর্কীয় নানাপ্রকার ব্যাধি হইতে পারে, যেমন,—রজোরোধ, ঋতুশূল, অতিরজঃ, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত বালিকার ঋতু আরম্ভ হইবার কালে হরিৎপীড়া বা মৃৎপাণ্ডু (chlorosis) নামক একটী পীড়া হইয়া থাকে।

রজোরোধ

উষ্ণপ্রধান দেশে বালকবালিকাদিগের নয় দশ বৎসর বয়সেও রজঃস্রাব আরম্ভ হইতে পারে। কিন্তু পনের বৎসর না হওয়া পর্য্যন্ত রজঃস্রাব আরম্ভ না হওয়াও অসম্ভব নহে। ষোল বা তদধিক বয়সে রজঃস্রাব না হইলে, বালিকাকে কোন হাসপাতালে বা চিকিৎসকের নিকটে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। তবে বালিকার স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে, এবং শরীর ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইতে থাকে, এমতাবস্থায় বিলম্বে অর্থাৎ ১৭ বা ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত রজঃস্রাব না হইলে চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। অনেক সময়ে যোনিমুখ বন্ধ থাকিবার জন্য বালিকাদিগের যথা সময়ে রজঃস্রাব আরম্ভ হয় না, অথচ পরিমিত সময় অন্তর অন্তর তলপেটে বেদনা বোধ করিতে থাকে। পরীক্ষার পরে যোনিমুখ বন্ধ দেখিলে, বালিকাকে কোন চিকিৎসালয়ে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

যে বালিকার রজঃস্রাব আরম্ভ হয় নাই, সে যদি খুব কৃশ, অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি একটু কাশি থাকে, এবং মাঝে মাঝে জ্বর ভাব বোধ হয়, তবে মনে করিতে হইবে যে সম্ভবতঃ সেই বালিকা ক্ষয় রোগে ভুগিতেছে। ক্ষয়রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার রজঃস্রাব হইবে না।

অনেক সময়ে হরিৎপীড়ার নিমিত্ত যথাসময়ে রজঃস্রাব হয় না। এই রোগের চিকিৎসা-বিধি নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে।

জরায়ু ও ডিম্বকোষ ক্ষুদ্র ও অপরিস্ফুট হইলে রজোরোধ হইয়া থাকে। চিকিৎসক পরীক্ষা দ্বারা তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

রজঃস্রাব আরম্ভ হইবার পরেও কয়েক মাস ধরিয়া বিনা রোগেই হয়ত উহা বন্ধ থাকিতে, অথবা অনিয়মিত হইতে পারে। এক স্থান হইতে অন্য

স্থানে বাস করিতে গেলে, জলবায়ুর বৈষম্যের নিমিত্ত অনেক সময়ে কয়েক মাসের জন্য রজোরোধ হয়। এই সময়ে সাধারণতঃ তাহার স্বাস্থ্য ভাল থাকে, এবং শরীরে ওজন বাড়িতে থাকে।

কোন কোন রোগ হইলে, ঋতু বন্ধ হইয়া যায়। টাইফয়েড, স্কার্লেট্ ফিভার এবং এই প্রকার অন্যান্য ব্যাধির আক্রমণের পরে সাধারণতঃ তিন হইতে ছয় মাস কাল রজোনিবৃত্ত হইয়া থাকে।

বালিকাদিগের হস্তমৈথুনের ফলেও, রজোরোধ হইতে পারে। উক্ত কু-অভ্যাস ত্যাগ করিলে উহার প্রতীকার হয়।

ঋতুমতী নারীর গর্ভাবস্থা না হইলেও, অন্যান্য কারণে, যথা,—অতিশয় ভয় পাইলে বা খুব ঠাণ্ডা লাগিলেও, কিছুকাল সহসা রজোবন্ধ থাকিতে পারে। এতদ্ব্যতীত পিঠে কোমরের নীচে, অতিশয় বেদনা বোধ হয়, এবং যে সময়ে রজোস্রাবের সম্ভাবনা, সেই সময়ে উক্ত বেদনা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

প্রতীকার

যখন নানা কারণে রজোরোধ হইতে পারে, তখন প্রত্যেক স্থলেই সম্ভব হইলে সেই সকল কারণ দূর করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। বিবাহিত স্ত্রীলোকের রজোরোধ অন্তঃসত্ত্বা হইবার নিমিত্ত হইতে পারে, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

রজোস্রাব সঞ্চারিত করিতে নিম্নলিখিত প্রণালীগুলি ফলদায়ক হইতে পারে। বালিকার যদি শরীরের পুষ্টিসাধন না হয়, তবে তাহাকে উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হইবে। তাহাকে কঠিন পরিশ্রম করিতে দিবেন না। মুক্ত বায়ুতে দৈনিক ব্যায়াম ও প্রতি রাত্রিতে আট কি নয় ঘণ্টা ঘুম তাহার পক্ষে অতিশয় আবশ্যক। এইরূপ অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিবার সম্ভাবনা আছে, তজ্জন্য ২৯শ অধ্যায় বর্ণিত প্রণালী অনুযায়ী চিকিৎসা করা উচিত। যে বালিকার পূর্ব্বে কখনও রজোস্রাব হয় নাই, তাহাকে চিকিৎসা করিবার সময় উষ্ণ জল দ্বারা অন্তর্ধৌত করিয়া দিবেন। তৎপরে দশ মিনিট কাল ১১০° ডিগ্রি পরিমাণ উষ্ণ জল দ্বারা আঁকটি স্নান (Sitz bath) করাইবেন। পা গরম জলে ডুবাইয়া রাখিয়া মাথায় ঠাণ্ডা জলপটি দিতে হইবে (২০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ৫০শ অধ্যায়ের ১৯ নং ব্যবস্থা পত্রের ঔষধ দৈনিক তিন বার আহারের পর খাইতে দিবেন। অতিরিক্ত ভয় বা ঠাণ্ডা লাগিবার নিমিত্ত রজোরোধ হইলেও উষ্ণ আঁকটি স্নান ও অন্তর্ধৌত আবশ্যক।

অতিরক্তঃ

জরায়ুর কোন প্রকার ব্যাধির নিমিত্ত সাধারণতঃ অতিমাত্রায় রজঃ নিঃসরণ হইয়া থাকে। প্রসবান্তে, অথবা গর্ভপাতের পর ঝিল্লীর (ফুলের) কোন অংশ

অভ্যন্তরে থাকিয়া গেলে, অথবা জরায়ুমুখ ছিঁড়িয়া গেলে, অনেক সময়ে অতিরিক্ত রজঃস্রাব হয়। কখন কখন প্রসবকালীন অপরিচ্ছন্নতার জন্য, অথবা মাসিক ঋতুকালে নোংরা কাগজ বা নেকড়া ব্যবহার করিবার ফলে, জরায়ুতে রোগ জীবাণু প্রবেশ করে। জরায়ু এইরূপে রোগগ্রস্ত হইলে রজঃস্রাব অতিরিক্ত এবং বেদনাদায়ক হইয়া থাকে।

এই প্রকার রোগে গৃহ-চিকিৎসা ফলদায়ক না হইতে পারে। এই কারণে রোগিণীকে কোন হাসপাতালে প্রেরণ করা, অথবা কোন উপযুক্ত চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা কর্তব্য। তাহা সম্ভব না হইলে, উষ্ণ জল দ্বারা যোনি ধৌত করিবার নিমিত্ত ডুস্ ব্যবহার করিবেন (২০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। যতটা গরম সহ্য করা যায়, ডুসে ব্যবহৃত জল ততটা গরম হওয়া আবশ্যক; এবং ডুস্ দিবার পরে জননেন্দ্রিয়ের বহির্ভাগ ও উরুদ্বয় ভালরূপে শীতল জল দ্বারা স্পঞ্জ করিয়া দিবেন। ঋতুকালে সম্পূর্ণ বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক।

কষ্ট রজঃ বা ঋতুশূল

ঋতুকালে অস্বস্তি বোধ অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু অতিশয় বেদনা অনুভূত হইলে, রোগ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বেদনার সহিত অতিমাত্রায় রজঃস্রাব হইয়া থাকে। উক্ত বেদনা পিছন দিকে, কোমরে, বা পার্শ্বে হইতে পারে। কখন কখন তলপেটে চাপ বোধ হয়, অথবা বোধ হয় যেন জরায়ুর চারিদিকে কামড়াইতেছে। এই বেদনা সব সময় থাকে না। মাঝে মাঝে উপস্থিত হয়।

প্রতীকার

প্রায় সকল ঋতুশূল আরোগ্য করিবার জন্য হাসপাতালে যাওয়া, অথবা কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ জরায়ুর দোষে এইরূপ হয়, আর জরায়ুর চিকিৎসা কেবল চিকিৎসকেই করিতে পারেন।

ইহার প্রতীকারকল্পে গৃহে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে:—ঋতুকাল উপস্থিত হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে "উষ্ণপাদ মজ্জন" (foot bath) এবং যোনিতে ডুস্ লইবেন। পর দিবসও উষ্ণ "আকটি স্নান" করিবেন। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে উষ্ণ জল দ্বারা অন্ত্রধৌত করিয়া দেওয়া আবশ্যক (২০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে এই সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঋতুকালে তলপেটে সেঁক দেওয়া, বা গরম জলপূর্ণ বোতল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রচুর পরিমাণে গরম জল পান করিলে উপকার হইবে।

শ্বেতপ্রদর (Leucorrhoea)

শ্বেতপ্রদর রোগে যোনি হইতে এক প্রকার সাদা স্রাব নিঃসৃত হয়। ইহার সঙ্গে দুর্ব্বলতা, পিঠে বেদনা, জরায়ুতে অস্বাচ্ছন্দ্য এবং যোনির চারিদিকে

চুলকানি প্রভৃতি উপসর্গ থাকে। শ্বেতপ্রদর রোগের চিকিৎসার ভার কোন চিকিৎসকের উপর অর্পণ করা কর্তব্য।

অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, স্বল্প ও অপুষ্টিকর খাদ্য, অতিরিক্ত সঙ্গম, হস্তমৈথুন, জরায়ুর কোন ব্যাধি প্রভৃতির কোন একটী কারণে শ্বেতপ্রদর হইয়া থাকে। গনোরিয়া অনেক সময়ে এই রোগের কারণ হয়।

রোগের কারণ নির্দ্দেশের উপরে চিকিৎসা নির্ভর করিবে। যোনিতে উষ্ণজলের ডুস্ ব্যবহার এই রোগে গৃহ চিকিৎসার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ১২০ ডিগ্রি ফারেন্‌হাইট্ উষ্ণ, সাড়ে চারি কি পাঁচ সের পরিমাণ জলের সহিত ছোট আট চাম্‌চে "বোরাসিক্ এ্যাসিড্," অথবা ছোট এক চাম্‌চে "পারম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাশ্" মিশ্রিত করিয়া ডুসের নিমিত্ত জল প্রস্তুত করিবেন। "পটাশিয়াম্ পারম্যাঙ্গানেট্" ব্যবহার করিতে হইলে, উহা প্রথমে এক পাইট জলে বেশ ভালরূপে নাড়াচাড়া করিয়া গলাইয়া লইয়া অবশিষ্ট জলের সহিত মিশাইবেন। প্রতিদিন এই প্রক্রিয়া করিবেন। সপ্তাহে তিন দিন উষ্ণজল দ্বারা অস্ত্রধৌত করিবেন (২০শ অধ্যায় দেখুন)।

হরিৎ রোগ (Chlorosis)

বালিকাদিগের ঋতুস্রাব যখন আরম্ভ হওয়া উচিত, ঠিক তখন তাহাদের এই রোগ হইয়া থাকে। রক্তে কোন প্রকার দোষ উপস্থিত হইলে এই রোগ হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় শরীরের ওজন হ্রাস হয় না, বালিকা বেশ মোটা ও মাংসলও থাকিতে পারে; কিন্তু গায়ের বর্ণ এরূপ হইয়া যায়, যাহা হইতে এই রোগের নাম হরিৎ রোগ হইয়াছে। ক্ষুধা-বোধ খুব কম থাকে, এবং রোগিণীর অম্ল বস্তু খাইবার খুব প্রবৃত্তি হয়।

প্রতীকার

রক্তে লৌহের অভাব হইলে এই রোগ হয়; রোগিণীকে উত্তম খাদ্য দিতে হইবে। হরিৎ রোগাক্রান্ত বালিকাদিগের কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, তাই ২৯শ অধ্যায়ে লিখিত প্রণালী অনুযায়ী চিকিৎসা করিবেন। ৪০শ অধ্যায়ের ২০ নং ব্যবস্থা পত্রের ঔষধ খাইতে দিবেন। প্রথম সপ্তাহে উক্ত ঔষধের একটী করিয়া পিল দৈনিক তিন বার দিবেন; দ্বিতীয় সপ্তাহে দৈনিক তিন বার দুইটী করিয়া পিল এবং তৃতীয় সপ্তাহে দৈনিক তিন বার তিনটী করিয়া পিল দিবেন। দৈনিক তিন বার তিনটী করিয়া পিল এক মাস বা ততোধিক কাল দিতে হইবে।

জননেন্দ্রিয়ের বহির্ভাগের রোগ

যোনি মুখে চুলকানি, জ্বালা বা ক্ষত প্রভৃতি ব্যাধি পরিচ্ছন্নতার অভাবে হইয়া থাকে। জননেন্দ্রিয়ের বহির্ভাগ বার বার ধৌত করা উচিত। জননেন্দ্রিয়ের

বহির্ভাগে ওষ্ঠাধরের ন্যায় যে ভাঁজ করা অংশ দৃষ্ট হয়, তাহার অভ্যন্তর পরিষ্কার রাখিতে যত্ন লওয়া উচিত। যোনিমুখে চুলকানি, অথবা উহা স্ফীত বা লাল হওয়া সাধারণতঃ হস্তমৈথুন, গনোরিয়া, শ্বেতপ্রদর অতিরিক্ত প্রস্রাব, অথবা ঋতুকালে মোটা কাগজ বা নোংরা নেকড়া ব্যবহার করার জন্য হইতে পারে।

প্রতীকার

প্রথমে রোগের কারণ দূর করিতে হইবে। যোনি হইতে কোন পদার্থ নিঃসরণ হওয়ার ফলে রোগ হইয়া থাকিলে, ঐ স্রাব বন্ধ করিতে হইবে। রোগের কারণ যদি হস্তমৈথুন হয়, তবে উক্ত কু-অভ্যাস ত্যাগ না করিলে, রোগ সারিবে না।

অনেক সময়ে উকুণ জন্মিলে, ঐরূপ হইয়া থাকে; ইহা নিবারণের জন্য ৫০শ অধ্যায়ের ২১নং ব্যবস্থা পত্রের ঔষধ ব্যবহার করুন। এই সঙ্গে গুহ্যদ্বারে ও তলপেটের নিম্নভাগে চুলকানি হইলে, ক্ষুদ্র ক্রিমিই উহার কারণ বুঝিতে হইবে; তাহা হইলে ৩৫শ অধ্যায়ে বর্ণিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

যে অংশে চুলকানি হয়, সেই অংশ ২২নং ব্যবস্থা পত্রের ঔষধ দ্বারা ধৌত করিলে, বিশেষ উপকার হইবে। উক্ত ঔষধ দ্বারা ধৌত করিবার পর ২৩ নং অথবা ১১ নং ব্যবস্থা-পত্রের ঔষধ দ্বারা ঘষিতে হইবে। ফুস্কুড়ি থাকিলে সেগুলির মুখ গালিয়া "টীংচার অব্ আইওডিন্" প্রয়োগ করিবেন।

জরায়ু (Uterus) ও ডিম্বকোষের (Ovaries) ব্যাধি

পিঠে বেদনা, তলপেটের নিম্নভাগে সবেগে বেদনা, তলপেট ফুলিয়া উঠা, জ্বর, যোনি হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ নিঃসরণ, ও অন্যান্য বহু লক্ষণ জরায়ু ও ডিম্বকোষের কোন না কোন ব্যাধির নিমিত্ত হইয়া থাকে। উল্লিখিত যাবতীয় প্রক্রিয়া করিয়া দেখিবার পরেও যদি ঐ সমুদয় লক্ষণ দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, তবে পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য রোগিণীকে কোন হাসপাতালে প্রেরণ, অথবা কোন সুচিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। কেননা উপরি-উক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশক কোন কোন ব্যাধি অতিশয় সাংঘাতিক, চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে, সত্বর মৃত্যু হইতে পারে।

বন্ধ্যাত্ব (Sterility)

বিবাহিত জীবনের প্রথম হইতেই, অথবা কখনও দুই একটা সন্তান প্রসবের পরে, সন্তান উৎপাদনের শক্তি না থাকিতে পারে। বিবাহিত জীবনের প্রথম হইতেই সন্তান উৎপাদনের শক্তি না থাকিলে, জননেন্দ্রিয়ের কোন অঙ্গের অপূর্ণ-

তার নিমিত্ত ঐরূপ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। স্বামী অথবা স্ত্রী এই উভয়ের কাহারও কোন রোগের নিমিত্ত বন্ধ্যাত্ব হইতে পারে। স্বামীর বীর্য্য লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে যে উহাতে সজীব শুক্র-কীট আছে কিনা; পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে এক শত বন্ধ্যাত্বের ষোলটী পুরুষের নিমিত্ত হয়।

স্ত্রীলোকদিগের বন্ধ্যাত্বের যত দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা অধিকাংশ স্থলেই প্রমেহ ও উপদংশ প্রভৃতি রোগের নিমিত্ত হইয়াছে। অবৈধ সহবাসের ফলে প্রথমে স্বামীর ঐ সকল রোগ জন্মে এবং পরে উহা স্ত্রীতে সংক্রমিত হয়।

স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু বা ডিম্বকোষের কোন সাংঘাতিক ব্যাধির নিমিত্ত কখন কখন বন্ধ্যাত্ব হইয়া থাকে। কখন কখন অস্ত্র-চিকিৎসার দ্বারা ঐরূপ অবস্থার প্রতীকার হইতে পারে। যেমন,—পূর্ব্বে সন্তান প্রসবের সময়ে জরায়ু ছিন্ন হইয়া থাকিলে, উহা পুনরায় ঠিক করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, অথবা জরায়ুতে বা ডিম্বকোষে কোন প্রকার অর্ব্বুদ হইলে তাহাও ফেলিয়া দেওয়া সম্ভব।

কোন কোন স্থলে সাংঘাতিক কোন রোগের নিমিত্ত বন্ধ্যাত্ব হয়, তাই সাধারণ গৃহ-চিকিৎসার ফলে তাহা আরোগ্য হইতে পারে না।

প্রথমতঃ অতিরিক্ত সঙ্গমের ফলে অনেক সময়ে সন্তান উৎপাদনের শক্তি হ্রাস পায়। ঋতুকালের পূর্ব্বে বা পরে (২৩শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) উপযুক্ত সময়ে প্রতিমাসে এক বার কি দুই বারের অধিক স্ত্রী সঙ্গম বিধেয় নহে।

কখন কখন জরায়ু অথবা যোনি দ্বার হইতে কোন নিঃসৃত পদার্থ শুক্র-কীট নষ্ট করিয়া ফেলে, তাই গর্ভসঞ্চার হইতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় দৈনিক "বোরিক্ এ্যাসিড্" মিশ্রিত উষ্ণ জল দ্বারা যোনি দ্বারে ডুস্ দিলে বেশ উপকার হইবে। ডুসের নিমিত্ত তিন সের আন্দাজ জলে অর্দ্ধ আউন্স "বোরাসিক এ্যাসিড্" মিশ্রিত করিবেন। যত গরম সহ্য করা যায় জল ততটা গরম করিবেন। সহবাসের সময়ে ও তাহার পর কয়েক দিন ডুস্ দেওয়া বন্ধ রাখিবেন। সহবাসের পরে স্ত্রীর কয়েক ঘণ্টা বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া থাকিয়া বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে, তাহাকে সকল নিয়মাদি পালন করিতে হইবে, এবং উত্তম ও পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে হইবে; এবং সর্ব্বদাই ক্লান্ত থাকে এরূপ কঠিন পরিশ্রম যেন তাহাকে করিতে দেওয়া না হয়।

৪৩শ অধ্যায়

চর্ম্মরোগ ও কুষ্ঠ

খোস

চর্ম্মের নীচে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট আশ্রয় লয়, তাহাতে খোস হয়। সাধারণতঃ অঙ্গুলির ফাঁকে, হাতের কব্জিতে, অথবা নাভি বা স্তনের চারিদিকের চামড়ায়, প্রথমে খোস আরম্ভ হয়।

লক্ষণসমূহ

প্রথমে চুলকানি হয়, পরে চুলকাইবার ফলে, চর্ম্মের উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি হয়, এবং স্থানে স্থানে লাল গোটা গোটা পড়িয়া থাকে। এই রোগ একই পরিবারে একজন হইতে অপর সকলের মধ্যে দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে।

এই রোগ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, যাহার খোস হইয়াছে কখনও তাহার বিছানার উপরে বসিবেন না বা শয়ন করিবেন না। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বিছানার চাদর বা পোষাক বা তোয়ালে হইতেও এই রোগ হইতে পারে।

প্রতীকার

প্রথমে রোগীর গরম জল ও সাবান দ্বারা ভালরূপে শরীর ধৌত করিয়া ফেলিবেন। তিন ভাগ গন্ধক গুঁড়া (সাল্‌ফার্), এবং সাত ভাগ "ভ্যাসলিন্" অথবা খাঁটি নারিকেলের তৈল মিশ্রিত করিয়া, একটা মলম প্রস্তুত করিবেন। "সাল্‌ফার্" এবং তৈল ভালরূপে মিশাইয়া দিতে হইবে। একখানা লম্বা ছুরির ফলক দ্বারা এক টুক্‌রা কাচের উপরে তৈলের সহিত সাল্‌ফার্ মিশ্রিত করিয়া, মলম প্রস্তুত করিতে হইবে। শরীরের যে যে স্থানে খোস আছে, সেই সমুদয় স্থানে তিন দিন ধরিয়া প্রাতে ও রাত্রে উক্ত মলম লাগাইতে হইবে। এই তিন দিন পরিধানের কাপড় বা বিছানা পরিবর্ত্তন করিবেন না। তিন দিবস পরে গরম জল ও সাবান দ্বারা স্নান করিয়া পরিষ্কার কাপড় বিছানাদি ব্যবহার করিবেন। ময়লা কাপড় ও বিছানার চাদর প্রভৃতি ভালরূপে গরম জলে সিদ্ধ না করিয়া পুনরায় ব্যবহার করিবেন না। এইরূপে পাঁচড়ার জীবাণু নষ্ট করা যায়।

উকুণ

যাহারা পরিচ্ছন্ন থাকেন না, এবং ময়লা কাপড়-চোপড় পরেন, তাহাদের দেহে ও মস্তকে উকুণ হয়। দেহ পরিষ্কার রাখিবার জন্য নিয়মিত স্নান করিলে ও পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরিলেই উকুণ হয় না।

শরীরে উকুণ থাকিলেই চুলকানি হয়, ও চুলকাইতে চুলকাইতে শরীরের নানা স্থানে ক্ষত হইয়া যায়, পোষাকের ভাঁজ ও সেলাইয়ের মধ্যে উকুণ দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক মিনিট সিদ্ধ করিলেই উহা মরিয়া যায়।

জননেন্দ্রিয়ের লোমপূর্ণ স্থানে এক প্রকার উকুণ দৃষ্ট হয়, ঐগুলি কখন কখন দেহের অন্যান্য স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। এই গুলি বিনষ্ট করিবার জন্য, সপ্তাহে একবার করিয়া কয়েক সপ্তাহ, এক আউন্স জলে দুই গ্রেণ "করোসিভ্ সাব্লিমেট্" (Corrosive Sublimate) মিশ্রিত করিয়া উক্ত অঙ্গ ধৌত করিয়া দিবেন। "করোসিভ্ সাব্লিমেট্" অতিশয় বিষাক্ত, তাই খুব সাবধানে উহা ব্যবহার করিবেন। ৫০শ অধ্যায়ের ২১নং ব্যবস্থা পত্রের ঔষধ ব্যবহার করিলেও উকুণ নষ্ট হইয়া যাইবে।

মাথার উকুণ

মাথার চুলে উকুণ হইলে উৎকৃষ্ট কেরোসিন্ এবং বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল সমান অংশে একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন বিকাল বেলা দুই তিন দিন ধরিয়া মাথায় ঘষিবেন। চুলে এই তৈল মাখিয়া মাথায় একখানি কাপড় জড়াইয়া রাখিবেন। প্রত্যহ সকালে গরম জল ও বিশুদ্ধ সাবান্ দ্বারা মাথা ধুইয়া ফেলিবেন। উক্ত তৈল মাথায় মাখিয়া কেহ কখন প্রদীপ বা আগুনের নিকটে যাইবেন না। মাথায় ঘা হইলে একটু ভ্যাস্লিন্ বা নারিকেলের তৈল মাখাইয়া দিবেন।

উকুণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্ব চুলের উপরে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগকে দেখিতে চুলের উপরে ছোট ছোট সাদা গুটির মত। ঐগুলি নষ্ট করিতে হইলে, সপ্তাহে দুইবার শিকা (Vinegar) দ্বারা মাথার চুল ধুইয়া ফেলিবেন। শিকা ব্যবহার করিবার পরে, একখানি ভাল সরু দাঁতের চিরুণী দ্বারা মাথা আঁচড়াইবেন।

ছারপোকা

ছারপোকা শুধু কামড়াইয়া জ্বালাতন করে না, কিন্তু উহারা কতিপয় সাংঘাতিক ব্যাধিও বিস্তার করিয়া থাকে। বিছানা ও কাপড়-চোপড় ভালরূপে সিদ্ধ করিলে, উহারা বিনষ্ট হয়। চৌকি বা খাটের ফাটালে ও ছিদ্রে ছারপোকা থাকিলে, এক ভাগ কার্ব্বলিক এ্যাসিড্ [অথবা "ক্রিশোল" (Cresol) বা "আইজাল" (Izal) বা "স্যানিটাস্" বা ফিনাইল] দশ ভাগ জলে মিশ্রিত করিয়া ফাটালে ও ছিদ্রে দিবেন। তারপিন্ তৈল দ্বারাও উক্ত কার্য্য সাধিত হইবে।

বয়স ফোড়া-ব্রণ

মুখের উপরে, কাঁধে, ও পিঠের উপরে "বয়স ফোড়া" দেখা দিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার কাল ব্রণ হয়; উহা দেখতে অনেকটা বয়স ফোড়ার মত, কিন্তু মাথায় একটী কাল দাগ পড়ে।

প্রতীকার

মিঠাই, ফুলুরি বা কচুরি, কাফি, তামাক, মদ প্রভৃতি একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। সকালে শয্যা ত্যাগ করিয়াই এক বাটী গরম জল পান করিবেন। দিনের মধ্যে কয়েক গেলাস জল পান করিবেন। জলের সহিত লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া লইলে, সত্বর আরোগ্য লাভ সম্ভব হইবে। দৈনিক স্নানের পর তোয়ালে দ্বারা বেশ করিয়া গা ঘষিবেন। প্রতিদিন অবশ্যই মলত্যাগ করা আবশ্যক। দরকার হইলে "ক্যাস্‌কারা ট্যাবলেট্‌" বা অপর কোন সারক ঔষধ ব্যবহার করিবেন। একটী সূচের অগ্রভাগ দিয়াশলাইয়ের কাঠির আগুনে পুড়াইয়া তদ্দ্বারা ব্রণগুলি গালিয়া দিবেন। গরম জল দ্বারা বেশ করিয়া মুখ ধুইয়া এবং শুকাইয়া লইয়া দৈনিক তিন বার একটী মলম মালিস করিবেন। বড় দুই চাম্‌চে "ষ্টার্চ্চ" এবং ঐ পরিমাণ "ভ্যাস্‌লিন্‌" লইয়া, অর্দ্ধ চাম্‌চে গন্ধক চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া মলম প্রস্তুত করিতে হইবে।

ঘামাচি

গ্রীষ্মকালে শিশুগণ, এমন কি বয়স্কগণও ঘামাচি দ্বারা উত্যক্ত হন। অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইলে ঘামাচি উঠিয়া থাকে।

প্রতীকার

শীতল জল দ্বারা শরীর "স্পঞ্জ" করিয়া লইয়া কিছু "ট্যাল্‌কাম্‌ পাউডার" ছড়াইয়া দিউন। "ট্যাল্‌কাম্‌ পাউডার" পাওয়া না গেলে "ষ্টার্চ্চ" অথবা ময়দার গুঁড়া ব্যবহার করিবেন। অর্দ্ধ গেলাস জলের সহিত বড় তিন চাম্‌চে খাবার সোডা মিশ্রিত করুন; পরে উহাতে, ১৫ কি ২০ ফোঁটা "কার্ব্বলিক এ্যাসিড্‌" যোগ করিবেন। ইহা দ্বারা স্পঞ্জ করিলে, জ্বালা চুলকানি নিবারিত হইবে।

পামা (Ecxema)

শরীরের নানা স্থানে চর্ম্মের উপরে খণ্ড খণ্ড ক্ষতের আকারে পামা হইয়া থাকে। উহা লাল হইলে অতিশয় চুলকানি হয়, এবং উহা হইতে জলের মত রস নির্গত হইতে থাকে। পরে ক্ষতের উপরে মাম্‌ড়ি পড়ে। পামার নিমিত্ত অনেক সময় শরীরের চামড়া কাটিয়া যায়। সাধারণতঃ ইহা মুখে, মাথায় এবং অস্থি সন্ধিগুলির চামড়ার ভাঁজে হইয়া থাকে।

প্রতীকার

এই চর্ম্ম রোগের চিকিৎসা বড়ই কঠিন। মদ, মাংস ও তামাক ত্যাগ করিলে উক্ত রোগ আরোগ্য হইতে পারে। প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে জল পান

করিতে হইবে। প্রতিদিন ফল খাওয়া ভাল। লেবুর রসযুক্ত পানীয় জল বিশেষ উপকারী। দৈনিক নিয়মিত মল ত্যাগ হওয়া আবশ্যক। রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আরোগ্য লাভ করা দুষ্কর।

ক্ষত স্থানে জল বা সাবান ব্যবহার করিবেন না। বিশুদ্ধ নারিকেলের তৈল বা তরল "ভ্যাসলিন্" মাখিয়া মামড়ি উঠাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবেন। ক্ষত-স্থান চুলকান উচিত নহে। ছোট শিশুদের পামা হইলে, কয়েক ভাঁজ কাপড় দ্বারা তাহাদের হাত জড়াইয়া রাখিবেন, যেন তাহারা ক্ষতস্থান চুলকাইতে না পরে।

পামা হইবার প্রথমাবস্থায়, পূর্ণ এক গেলাস জলে, বড় এক চামচে সোডা মিশ্রিত করিয়া, উক্ত জল দ্বারা, যে স্থানে চুলকানি হইয়াছে, সেই স্থানে স্পঞ্জ করুন; পরে উহার উপরে "ট্যাল্‌কাম্ পাউডার," অথবা ময়দার গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া ভালরূপে ব্যাণ্ডেজ করুন।

ক্ষতস্থান আর্দ্র হইলে ও উহার উপরে মামড়ি পড়িলে, ছোট দুই চামচে "জিঙ্ক অক্সাইড," ঐ পরিমাণ শ্বেতসার (ষ্টার্চ্চ) বড় এক চামচে "ভ্যাসেলিন্" বা বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল, একত্র মিশাইয়া মলম আকারে ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবেন।

শরীরের কোন অঙ্গে পামা যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, এবং ক্ষতস্থান যদি শুষ্ক এবং আঁইসের ন্যায় আবরণ মুক্ত হইয়া পড়ে, তবে বড় চামচের অর্দ্ধ চামচে তরল আল্‌কাতরার সহিত বড় দুই চামচে জিঙ্ক মলম মিশ্রিত করিয়া উক্ত স্থানে প্রয়োগ করিবেন। কোন কোন রোগীর পক্ষে খোসে ব্যবহৃত গন্ধকের মলমও বিশেষ উপকারী।

দাদ

শরীরের যে কোন স্থানে দাদ হইতে পারে। রান্নাকরা বাসি ভাতের উপরে এক প্রকার ছাতা পড়ে; উক্ত ছাতার ন্যায় দেখিতে এক প্রকার জীবাণু দ্বারা দাদের সৃষ্টি হয়।

যাহাদের দাদ হইয়াছে, তাহাদের সংস্পর্শে আসিলে, অথবা তাহাদের কাপড়-চোপড় বিছানা পত্রাদি বা তোয়ালে প্রভৃতি ব্যবহার করিলে দাদ হয়। এই রোগ সহজেই ছড়াইয়া পড়ে; তাই বালকবালিকাদিগের দাদ হইলে, উহা আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে স্কুলে পাঠান উচিত নহে।

প্রথমে ক্ষুদ্র এক খণ্ড লাল বা পিঙ্গল রঙ্গের ক্ষতের ন্যায় দাদ আরম্ভ হয়। তারপর উহা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিছুকাল পরে ক্ষতের মধ্যভাগের রঙ শরীরের ত্বকের স্বাভাবিক রঙের ন্যায় হইতে পারে। এই অবস্থায় দাদের ক্ষত একটা আংটির মত দেখায়। দাদ বেশী চুলকায়।

প্রতীকার

রোগের তরুণ অবস্থায় প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা নিম্নলিখিত মলমটী ব্যবহার করিবেন। ছোট এক চাম্‌চে (১ড্রাম) রিসরসিন্ (Rescrcin) ১০ গ্রেণ স্যালিসিলিক এ্যাসিড, (Salycilic Acid) এবং ৮ ড্রাম্ (বড় দুই চাম্‌চে) ভ্যাসেলিন্ বা নারিকেল তৈল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবেন। সকালে তারপিন্ দিবেন।

এইরূপে ক্রমাগত দুই তিন দিন সকালে তারিপিন্ এবং সন্ধ্যায় উক্ত মলম ব্যবহার করিতে থাকিবেন।

রোগের মাত্রা অধিক হইলে, একদিন অন্তর একদিন, দৈনিক দুই তিন বার "আইওডাইন্ লিনিমেণ্ট" ব্যবহার করিবেন। আর একটা ঔষধ বিশেষ উপকারী; ২০ গ্রেণ "ক্রিসারোবিন্" (গোয়া পাউডার), ১ আউন্স (২ বড় চাম্‌চে পরিমাণ) "জিংক্ অয়েণ্টমেণ্টের" সহিত মিশ্রিত করুন। উক্ত মলম ব্যবহারে জ্বালা বোধ হইয়া থাকে, তাই উহা প্রতিদিন ব্যবহার করা উচিত নহে।

রোগীর বস্ত্রে দাদের জীবাণু লাগিয়া থাকে; তাই পরিধেয় বস্ত্রাদি ভালরূপে অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন সুসিদ্ধ ও ধৌত করিয়া লইবেন।

মাথার খুলির উপর দাদ

ছোট বালকবালিকাদিগের মাথার খুলির উপরে প্রায়ই দাদ হইতে দেখা যায়। ইহার ফলে মাথার চুল সাদা হইয়া যায়, বা পড়িয়া যায়। অনেক সময়ে বড় বড় ক্ষতও হইয়া থাকে। ইহাতে কখন কখন মাথার চুল একেবারে খসিয়া পড়ে।

প্রতীকার

চুল খুব ছোট করিয়া না কাটিলে, মাথার খুলির উপরের দাদ আরোগ্য করা যায় না। যে স্থানে ক্ষত হইয়াছে, সেই স্থান একেবারে কামাইয়া ফেলা ভাল।

গাত্র চর্ম্মে অধিক দাদ হইলে, যে ঔষধের কথা বলা হইয়াছে, মাথার উপরে দাদ হইলেও সেই ঔষধ ব্যবহার করিবেন। মাথার খুলিতে এক জাতীয় কঠিন দাদ হইয়া থাকে; এই ঔষধ ব্যবহারে দাদ আরোগ্য না হইলে কোন চিকিৎসক দেখান কর্ত্তব্য; তাহা না হইলে, রোগ বাড়িয়া মাথায় টাক পড়িতে পারে।

ঘা, স্ফোটক

অধিকাংশ বালকবালিকারই শরীরের কোন না কোন অঙ্গে, কোন প্রকার ঘা দেখিতে পাওয়া যায়। পরিচ্ছন্নতার অভাবই এই সকল ঘা হইবার কারণ। বালকবালিকাদিগকে নিয়মিত স্নান করাইলে, শরীরে ঘা উৎপাদনকারী জীবাণু থাকিতে পারে না।

বালকবালিকাদিগের যাহাতে ঘা বা পাঁচড়া প্রভৃতি না হইতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের শরীর ও কাপড়-চোপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন, এবং তাহাদিগকে যেন মশা মাছি প্রভৃতিতে কামড়াইতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

শিশুদিগকে মাটিতে বা ধূলিময় রাস্তায় শুইতে বা বসিতে দিলে, শরীরে কোন প্রকার ঘা বা চুলকানি হইবার খুবই সম্ভাবনা।

শিশুদিগের শরীরের কোন স্থান আঁচড়াইয়া বা ছেঁচিয়া গেলে, আহত স্থান ভালরূপে ধৌত করিয়া দিবেন। ধৌত করিবার পরে ক্ষতস্থান শুষ্ক করিয়া একটু "বোরাসিক এ্যাসিড্" পাউডার জড়াইয়া দিউন, অথবা একটু "টিংচার অব্ আইওডিন্" প্রয়োগ করুন। ক্ষত হইতে কোন জলীয় রস বাহির হইলে "টিংচার অব্ আইওডিন্" দিবেন না। আহত স্থানে "বোরাসিক্ এ্যাসিড্ পাউডার," অথবা উক্ত টিংচার অব্ আইওডিন্ দিলে উহা ঘায়ে পরিণত হইতে পারিবে না।

বালকবালিকাদিগের গায়ে ফুস্কুড়ি উঠিলে, উল্লিখিত বয়স ফোড়ার চিকিৎসা প্রণালী মত চিকিৎসা করিতে হইবে। শিশুদিগকে উহা চুলকাইতে দিবেন না, কারণ তাহা হইলে ক্ষত হইবে।

চামড়ার উপরে ছোট ছোট ফোড়া হইলে, একটী বাঁশের কাঠি খুব সরু মুখ করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা বা সূচ দ্বারা ঐগুলি গালিয়া দিবেন। উক্ত বাঁশের কাঠিটী বা সূচটী "টিংচার অব্ আইওডিন্" বা ফুটন্ত জলে ডুবাইয়া না লইয়া ব্যবহার করিবেন না। ফোড়া গালিয়া চিপিয়া পূঁজ বাহির করিয়া ফেলিয়া, এক টুকরা বাঁশের কঞ্চির অগ্রভাবে কিছু তুলা জড়াইয়া একটা মাজ্জনী প্রস্তুত করুন। এই মাজ্জনী "টিংচার অব্ আইওডিনে" ডুবাইয়া লইয়া ফোড়ার উপরে ঔষধ দিউন। তৎপরে এক টুকরা পরিষ্কার নেকড়া অথবা কিছু তুলা ফোড়ার উপরে রাখিয়া, অন্য একখানি পরিষ্কার নেকড়া দ্বারা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবেন।

শরীরে স্ফোটক হইলে, একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরি দ্বারা তাহা গালিয়া ফেলিবেন, ছুরিখানি প্রথমে কয়েক মিনিট জলে ফুটাইয়া লইবেন। তারপর পূর্ব্ববর্ত্তী প্যারায় যে প্রকার প্রণালী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই অনুযায়ী প্রতীকার করুন। রোগীর যদি পুনঃ পুনঃ স্ফোটক হয়, তবে তাহাকে দৈনিক তিন বার প্রতিবারে ১ গ্রেণের চারিভাগের ১ ভাগ "কাল্‌সিয়াম্ সাল্‌ফাইড" দিবেন।

শরীরে বড় কোন ঘা হইলে, এক গেলাস জলে ছোট এক চাম্‌চে "লাইসল্" লইয়া তদ্দ্বারা উহা ধৌত করিবেন। ক্ষত ধৌত করিবার জন্য আর একটী ঔষধও ব্যবহার করা যাইতে পারে; বড় দুই চাম্‌চে জলে কয়েক দানা "প্যার-ম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাশ্" মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষত ধৌত করিবেন তৎপরে উহার উপরে কিছু "বোরাসিক এ্যাসিড পাউডার" ছিটাইয়া দিবেন।

শিশুদিগের মুখের উপর বা ঘাড়ে কোন প্রকার ঘা হইলে, "হোয়াইট্ প্রেসিপিটেট্"এর মলম দ্বারা বেশ উপকার পাওয়া যাইবে।

শরীরের কোন অঙ্গে বড় একখানি কাঁচা ঘা হইলে, পরিষ্কার বস্ত্র খণ্ড তিন চারি ভাঁজ করিয়া বড় এক চামচের এক চামচে লবণ মিশ্রিত এক গেলাস জলে উহা ডুবাইয়া লইয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবেন। উক্ত ভিজা কাপড়ের উপরে একখণ্ড "অয়েল পেপার" রাখিয়া উহার উপরে ব্যাণ্ডেজ করিবেন। প্রতি ঘণ্টায় লবণ মিশ্রিত জলে কাপড় খণ্ড ভিজাইয়া লইবেন। এই প্রক্রিয়াটী বিশেষ উপকারী।

কুষ্ঠ

ক্ষয়রোগের জীবাণুর মত কোন জীবাণু দ্বারা কুষ্ঠ রোগ হয়। কুষ্ঠ রোগীর শরীরের ক্ষতস্থানে এবং তাহার নাসিকা নিঃসৃত সর্দ্দিতে এই রোগের জীবাণু পাওয়া যায়।

কোন প্রকার খাদ্য যেমন মাছ প্রভৃতি খাইবার জন্য যে কুষ্ঠ হয় না, ইহা নিশ্চয়রূপে জানা গিয়াছে। কোন প্রকার ইতর প্রাণীর সংস্পর্শেও এই রোগ হয় না; কেবল যাহার কুষ্ঠ হইয়াছে তাহার সংস্পর্শেই কুষ্ঠ হইয়া থাকে।

উকুণ, ছারপোকা, মাছি প্রভৃতি কয়েক প্রকার কীট পতঙ্গ দ্বারা কুষ্ঠ বিস্তৃত হইতে পারে।

পরিবারের কোন এক জনের কুষ্ঠ হইলে, অপর সকলেরও ঐ রোগ হয়। ইহাতেই বুঝা যায় কুষ্ঠ রোগীর খুব কাছাকাছি থাকিলে এই রোগ খুব শীঘ্রই বিস্তৃত হইয়া যায়। যাহারা বহুজনাকীর্ণ অপরিষ্কার স্থানে বাস করে, এবং নিয়মিত স্নান করে না এবং বস্ত্রাদি ধৌত করে না, তাহাদেরও সাধারণতঃ এই রোগ হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ

দুই প্রকার কুষ্ঠ আছে, কিন্তু ঐ দুই প্রকার কুষ্ঠ একই প্রকার জীবাণু দ্বারা হইয়া থাকে। মাথাধরা ও শরীরের বিভিন্ন অংশে বেদনাসহ জ্বর, কুষ্ঠ রোগের প্রথম লক্ষণ। বেদনা না হইয়া শরীরের বিভিন্ন অংশ শীতল ও অবশ বোধ হইতেও পারে। ঘাম আর একটী প্রাথমিক লক্ষণ। হাত, পা, মাথা প্রভৃতি যে কোন একটী অঙ্গে, অথবা সমস্ত অঙ্গে ঘাম হইতে পারে। পরে মুখে বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব্রণের ন্যায় বাহির হয়, এবং চর্ম্ম বিশেষতঃ কপাল, গাল, নাক, কাণ ও ওষ্ঠের চর্ম্ম পিণ্ডাকারে ফুলিয়া উঠে। দাড়ি, গোঁপ ও ভ্রূর চুল প্রায়ই পড়িয়া যায়, পরে চোখের পাতা, নাক, হাত পায়ের আঙ্গুল এবং শরীরের অন্যান্য অংশ খসিয়া পড়িয়া যায়।

আর এক প্রকার কুষ্ঠ রোগে, প্রধানতঃ স্নায়ুমণ্ডল আক্রান্ত হয়, ও বোধ-শক্তি লোপ পায়। কিন্তু বোধশক্তি লুপ্ত হইবার পূর্ব্বে বিঁধিলে বা পুড়িলে যেরূপ যন্ত্রণা হয়, সেইরূপ যন্ত্রণা বোধ হইয়া থাকে। পরে বিশেষতঃ হাতে ও পায়ে এই যন্ত্রণা অধিক বোধ হইয়া থাকে। তৎপরে চামড়ার উপরে কতকগুলি দাগ দেখা যায়। প্রথমে ঐ দাগগুলি লাল হইতে পারে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যে উহাদের মধ্যস্থল সাদা হইয়া উঠিবে ও সে স্থানের বোধশক্তি থাকিবে না, চুল পড়িয়া যাইবে, খুসকি ও মরামাস জমিয়া উঠিবে। ক্রমে হাত পায়ের মাংস পেশী অবশ হইয়া যাইবে। অধিকন্তু, হাত পায়ের আঙ্গুল এবং শরীরের অন্যান্য অংশ খসিয়াও পড়িতে পারে।

চিকিৎসা

কুষ্ঠ হইবামাত্র সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীকে খবর দিতে হইবে। প্রায় সকল গভর্ণমেণ্টেরই কুষ্ঠীদের জন্য হাঁসপাতাল আছে, এই সকল হাঁসপাতালে খুব যত্ন লওয়া হয়, এবং উৎকৃষ্টরূপে চিকিৎসা করা হয়, সেখানে অর্থাদি কিছুই দিতে হয় না। হাঁসপাতালে গেলে রোগীর আরোগ্য হইবার আশা থাকে। প্রথম অবস্থাতেই শীঘ্র শীঘ্র কুষ্ঠ রোগ ধরাপড়া আবশ্যক, কারণ তাহা হইলে ইহা রোধ করিবার অধিক আশা করা যায়। অতএব কুষ্ঠের কোন প্রকার চিহ্ন দেখিলেই হাঁসপাতালে যাওয়া উচিত।

৪৪শ অধ্যায়

চক্ষুরোগ ও কর্ণরোগ

চক্ষে কয়লার গুঁড়া বা অন্য কিছু পড়া

চক্ষে কয়লার গুঁড়া বা ধূলিকণা প্রবেশ করিলে কখনও চক্ষু রগড়াইবেন না, অথবা রুমাল বা কাপড় দ্বারা উহা মুছিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবেন না। রোগীকে বিছানায় শোয়াইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী দ্বারা চক্ষুর পাতা ফাঁক করিয়া চক্ষু মধ্যে "বোরিক এ্যাসিড্ সলিউশন্" ঢালিয়া দিউন। উহাতে কয়লার গুঁড়ি বা ধূলিকণা ধুইয়া যাইবে।

এইরূপে উহা দূরীভূত না হইলে, চক্ষের উপরের পাতা উল্টাইয়া ফেলিবেন। রোগীকে নীচের দিকে চাহিতে বলিবেন। হাত ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী দ্বারা চক্ষুর পাতা ও পিছি চাপিয়া ধরিবেন, তারপর একটী ছোট পেন্সিল বা এক টুকরা বাঁশের ক্ষুদ্র কাঠি দ্বারা ঐ পাতা চাপিয়া ধরিয়া নীচের পাতা উপরের দিকে ও বাহিরের দিকে টানিয়া উল্টাইয়া দিউন (চিত্র দেখুন) পরে পরিষ্কার কাপড়ের সাহায্যে উহা বাহির করুন। ধূলিকণা দূরীভূত হইবার পরে চক্ষুর মধ্যে কয়েক ফোঁটা "বোরিক এ্যাসিড" ঢালিয়া দিবেন, বেদনা কমিয়া যাইবে।

চক্ষুতে চুণের গুঁড়ি প্রবেশ করিলে ছোট এক চামচে সির্কা (ভেনিগার) অর্দ্ধ গেলাস জলে মিশ্রিত করিয়া চক্ষু ধুইয়া দিবেন।

চক্ষু স্ফীত হওয়া

গরম জল দ্বারা প্রথমে চক্ষুর পাতার শুষ্ক মামড়িগুলি ধুইয়া ফেলিবেন। চক্ষুর শিথিল লোমগুলি ফেলিয়া দিবেন। চারি গ্রেণ "ইয়েলো অক্সাইড অব্ মার্কারী," চারি ড্রাম (বড় চামচের এক চামচে) "ভ্যাসেলিনের" সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রতি রাত্রে একটু একটু লাগাইয়া দিবেন।

চক্ষুর আঞ্জনী

চক্ষুর পাতার উপরে এক প্রকার ক্ষুদ্র ফুষ্করি হয়, তাহাকে আঞ্জনী বলে। চক্ষে পুনঃ পুনঃ আঞ্জনী হইতে থাকিলে, কোন চক্ষু চিকিৎসককে দেখান কর্ত্তব্য, হয়ত চশমা ব্যবহার করা প্রয়োজন হইতে পারে।

প্রতীকার

খুব গরম জল দ্বারা চক্ষুর পাতা ধুইয়া ফেলিবেন। আঞ্জনীর উপরের লোমগুলি টানিয়া ফেলিবেন। তারপর "টিংচার অব্ আইওডিনে" একটী কাঠি ডুবাইয়া লইয়া সেই স্থানে লাগাইয়া দিবেন। আঞ্জনীর মধ্য হইতে পূঁজ বাহির হইতে থাকিলে, চক্ষুর প্রান্তভাগ ফুলিয়া উঠিলে যে মলমের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাই প্রয়োগ করিবেন।

বামে :—চক্ষের নীচের পাতা উল্টাইয়া উহার ভিতরে প্রবিষ্ট পদার্থ দূরীকরণ প্রণালী।

দক্ষিণে :—চক্ষের উপরের পাতা উল্টাইয়া ময়লা বাহির করণ। দন্ত খুঁটিবার কোন শলাকার একপ্রান্তভাগে কিছু তুলা জড়াইয়া একটী তুলিকা প্রস্তুত করিতে হয়। একটী ম্যাচের কাঠি দ্বারা চক্ষের পাতা চাপিয়া ধরিতে হইবে।

চক্ষু উঠা

অনেক কারণে চক্ষু উঠিতে পারে; ধূলি বা বালুকণা প্রবেশ করিলে, অঙ্গুলি দ্বারা রগড়াইলে, ময়লা কাপড় বা রুমাল দ্বারা চক্ষু মুছিলে, দূষিত জলে মুখ ধুইলে, যাহাদের চক্ষু উঠিয়াছে তাহাদের ব্যবহৃত কাপড় চোপড় বা অন্যান্য জিনিষ ব্যবহার করিলে, শিশুদিগের চক্ষের উপরে মাছি পড়িতে দিলে, চক্ষু উঠিয়া থাকে।

তামাক, সিগারেট্, মদ প্রভৃতি মাদকীয় দ্রব্য সেবনে চক্ষুর ক্ষতি করে ও নানাপ্রকার চক্ষু রোগ হইয়া থাকে। শিশুর চক্ষের মল যদি খুব ঘন, সাদা বা

হল্‌দে হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে প্রমেহ-জীবাণু জনিত ঐ রোগ হইয়াছে। এই প্রকার চক্ষুর ব্যাধি অতি সাংঘাতিক এবং ইহাতে অনেকের চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ রোগীকে কোন চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে রাখিতে হইবে। এইরূপ রোগে কোন চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা না করাইলে নিশ্চয়ই চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। নবজাত শিশুগণের মধ্যে এই রোগ খুবই প্রবল। জন্মিবার পরেই শিশুর চক্ষে কয়েক ফোঁটা "আর্‌জিরল্‌ সলিউশন্‌" দিলে, ইহা নিবারিত হইবে (৫০শ অধ্যায়ের ৩নং ব্যবস্থাপত্র দ্রষ্টব্য)।

সকল প্রকার চক্ষু উঠাই অতিশয় সংক্রামক; রোগীর তোয়ালে, রুমাল, সাবান প্রভৃতি ব্যবহার করিবার ফলে, পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে উহা ছড়াইয়া পড়ে। এই জন্য যাহার চক্ষু উঠিয়াছে তাহার ব্যবহৃত কোন দ্রব্য অপর কেহ ব্যবহার করিবেন না। যিনি চক্ষু রোগে আক্রান্ত রোগীর শুশ্রূষা করিবেন, তিনি প্রতিবার উহা স্পর্শ করিবার পরেই ভালরূপে গরম জল ও সাবান দ্বারা হস্তাদি ধৌত করিয়া লইবেন। মাছি দ্বারাও এই রোগ যথেষ্ট বিস্তৃত হয়, কাজেই যাহাতে শিশুর চক্ষে মাছি না পড়ে, তাহা করিতে হইবে।

প্রতীকার

এক বাটি জলে বড় দুই চাম্‌চে "বোরিক এ্যাসিড" মিশ্রিত করিয়া একটি সলিউশন্‌ প্রস্তুত করিবেন। পরিষ্কার বোতলে এই ঔষধটা রাখিতে হইবে। বোতল হইতে ঔষধ বাহির করিয়া, পুনরায় বোতলে কিছু জল দিয়া রাখিবেন, বোতলে যে ঔষধের গুঁড়া জমিয়া থাকে, তাহা জলে সম্পূর্ণ না মিশা পর্য্যন্ত এই-রূপ করিতে হইবে। তিন চারি ঘণ্টা অন্তর অন্তর চক্ষুর মধ্যে উক্ত ঔষধ ফোঁটা কাটা যন্ত্র দ্বারা ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দিবেন। একটা আই "বাথ্‌" অর্দ্ধ পূর্ণ করিয়া চক্ষুতে লাগাইয়া পিছনের দিকে মাথা কাৎ করিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিলেই ঔষধ চক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিবে। আইবাথটা কয়েক মিনিট চক্ষের উপরে ধরিয়া রাখিতে হইবে। "বোরিক এ্যাসিড্‌ সলিউশন্‌" ব্যবহার করি-বার পরে প্রতি চক্ষে এক ফোঁটা করিয়া "আর্‌জিরল্‌ সলিউশন্‌" (শতকরা ১০ মাত্রা) দিবেন।

"বোরিক এ্যাসিড" অথবা "আর্‌জিরল্‌" পাওয়া না গেলে এক পেয়ালা জলে ছোট এক চাম্‌চে লবণ মিশাইয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। জলে লবণ মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিয়া লইবেন, এবং ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে শীতল করিয়া লইবেন।

যে কোন প্রকার চক্ষু রোগের চিকিৎসায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অতীব প্রয়োজনীয়।

ট্রাকোমা (Trachoma) বা চক্ষুর শ্লৈষ্মিক আবরণে দানাদার অবস্থা

উপরি-উক্ত চক্ষু ব্যাধি অতিশয় সাংঘাতিক। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চক্ষুর পাতা টানিয়া ভিতর দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে পাতার নীচে ছোট ছোট দানার ন্যায় বহু ব্রণ রহিয়াছে। চক্ষু উঠার যে চিকিৎসা-বিধি নির্দেশ করা হইয়াছে, এই ক্ষেত্রেও তাহাই প্রযোজ্য; কিন্তু এতদ্ব্যতীত "কপার্ সাল্‌ফেট্ সলিউশন্" এবং অন্যান্য ঔষধও ব্যবহার করা প্রয়োজন হইতে পারে। এই রোগ অতিশয় স্পর্শাক্রামক। চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক।

নিকটে বা দূরে না দেখা ঃ চক্ষে বেদনা

চক্ষু হইতে এক ফুট দূরে এই পুস্তকখানি রাখিয়া পড়িতে পারিলেই স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ঠিক আছে বুঝিতে হইবে। উহা অপেক্ষা নিকটে বই আনিয়া পড়িতে হইলে, চশমা লওয়া আবশ্যক। পড়িতে পড়িতে অক্ষরগুলি পরস্পর ঘুড়িয়া যাওয়া, চক্ষুর গোলকে বেদনা, চক্ষুর ঠিক উপরে বেদনা, মাথাধরা প্রভৃতি উপসর্গ দ্বারা দৃষ্টি ক্ষীণতা প্রকাশ পায়। এই সমস্ত রোগ দূর করিবার জন্য কোন চক্ষু চিকিৎসকের নিকট যাইয়া, পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত চশমা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দেশে দেশে ঘুরিয়া যাহারা চশমা ফেরি করিয়া বেড়ায় তাহারা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

কর্ণরোগ

বধিরতা

কর্ণরন্ধ্র প্রায় এক ইঞ্চি গভীর। উহার শেষ প্রান্তে একখানা ছোট পর্দা থাকে, তাহাকে "কর্ণপটহ" বলে (১৩শ অধ্যায়ের চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই রন্ধ্রের মধ্যে কর্ণমল জমা হইয়া বধিরতা উৎপন্ন করিতে পারে। সহসা বধিরতা উপস্থিত হইলে, সাধারণতঃ কর্ণমল উপস্থিত হইয়াই এইরূপ হইয়া থাকে।

কর্ণমল দূর করিবার জন্য বড় তিন চারি চামচে গরম জলের সহিত ছোট এক চামচে সোডা মিশ্রিত করিয়া সলিউশন্ করিবেন। বাম কর্ণের ময়লা দূর করিতে হইলে, রোগীকে ডান কাতে শয়ন করাইয়া দিয়া তাহার কর্ণে গরম ঔষধ ঢালিয়া দিবেন। কর্ণমল তরল করিতে উক্ত গরম জল কিছুকাল কাণের মধ্যে রাখিতে হইবে। তারপর উহা বাহির করিবার জন্য একটী ক্ষুদ্র পিচ্‌কারীর সাহায্যে ঔষধ কাণের মধ্যে ছিটাইয়া দিতে হইবে। পিচ্‌কারীর অভাবে একটী সরু কাঠিতে তুলা জড়াইয়া লইবেন। কাঠির শেষ ভাগ যেন তুলা দ্বারা

অবশ্যই জড়ান থাকে। কর্ণের ভিতরে উহা প্রবেশ করাইয়া দিয়া কিছুক্ষণ ঘুরাইতে থাকুন; পরে উহা বাহির করিয়া খণ্ড খণ্ড কর্ণমল ফেলিয়া দিবেন। কাঠি যেন কোন মতে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ণপটহে আঘাত না করে। কেননা অতি অল্প আঘাতেই কর্ণপটহের ক্ষতি হয়।

ধীরে ধীরে যে বধিরতা উপস্থিত হইয়া দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, তাহা সাধারণতঃ নাসিকা, কণ্ঠ ও মধ্য কর্ণের কোন ব্যাধির নিমিত্ত হইয়া থাকে। ১৩শ অধ্যায়ের চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে গলা ও কাণের মধ্যে একটী পথ রহিয়াছে। সর্দ্দি হইলে বা গলদেশে বেদনা হইলে, ইহার জীবাণু কর্ণে প্রবেশ করিয়া বধির করিয়া দিতে পারে। টন্‌সিল্ বা টন্‌সিল্ সমষ্টি ফুলিয়া উঠিয়া এবং এডিনয়েড্‌স্ অনেক সময়ে বধিরতার সৃষ্টি করে (৩৬শ অধ্যায়ে বর্ণিত চিকিৎসা প্রণালী দ্রষ্টব্য)। এই প্রকার বধিরতা আরোগ্য করিবার জন্য নাসিকায় ও গলদেশে ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এক গেলাস জলে ছোট এক চামচে খাইবার সোডা ও ছোট এক চামচে লবণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা দৈনিক তিনবার নাসিকা পরিষ্কার করিতে হইবে। ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উহা গরম করিয়া লইবেন। উক্ত ঔষধ দ্বারাই দৈনিক তিনবার কুলকুচি করিতে হইবে

কর্ণে পোকা বা অপর কিছু প্রবেশ করিলে কি করা কর্ত্তব্য

কর্ণে পোকা প্রবেশ করিলে কর্ণ মধ্যে কয়েক ফোঁটা নারিকেল তৈল অথবা চিনাবাদামের তৈল ঢালিয়া উহা মারিয়া ফেলিবেন এবং তারপরে এই অধ্যায়ের প্রথমাংশে উল্লিখিত পিচকারী ব্যবহার করিয়া উহাকে বাহির করিয়া ফেলিবেন। পোকা দেখিতে পাওয়া গেলে, ক্ষুদ্র একটী চিম্‌টা দ্বারা উহা টানিয়া বাহির করা যাইতে পারে।

কাণের মধ্যে শিমের বীজ পাথরের টুকরা, বা অপর কোন শক্ত বস্তু প্রবেশ করিলে, কাণ নীচু করিয়া এদিক ওদিক টানিতে থাকুন, এবং রন্ধ্র-মুখের চামড়া মাঝে মাঝে চাপিয়া দিউন। এইরূপ করিলে অনেক সময়ে উহা বাহির হইয়া যাইতে পারে। কোন প্রকার বীজ বা ডাইল কাণের ভিতরে গেলে সামান্য একটু মদ ঢালিয়া দিবেন, যেন উহা ফুলিয়া উঠিতে না পারে; উপরি-উক্ত পন্থাগুলি দ্বারা ফল না পাইলে, চিকিৎসক ডাকিয়া পরামর্শ করা কর্ত্তব্য; কারণ অনেক সময়ে কাণের মধ্য হইতে কিছু বাহির করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় বিষম ক্ষতি হইয়া থাকে।

কাণে বেদনা

নাসিকা ও গলায় ঠাণ্ডা লাগিবার ফলে, কর্ণের মধ্য ভাগ ফুলিয়া অনেক সময়ে কাণে বেদনা হয়। টন্‌সিল্ বা টন্‌সিল্ সমষ্টি ফুলিয়া উঠিয়া ও এ্যাডিনয়েড্‌স্ হইয়াও কাণে বিষম বেদনা হইতে পারে। খুব জোরে নাক ঝাড়িলেও কাণে বেদনা হওয়া সম্ভব। জলে ডুবাইবার ও সমুদ্রের জলে স্নান করিবার ফলে অনেক সময়ে কাণে বেদনা হয়।

প্রতীকার

বিছানায় শয়ন করিয়া গরমজল পূর্ণ রবারের ব্যাগ বা বোতলের উপরে, যে কাণে বেদনা সেই কাণ রাখিয়া দিবেন। দুই ঘণ্টা অন্তর, যত গরম সহ্য করা যায়, সেইরূপ গরমজল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া কাণে দিতে থাকিবেন, এবং পরে শুষ্ক তুলা দ্বারা উহা শুকাইয়া ফেলিবেন।

বার ঘণ্টা বা ততোধিক কাল কাণে বেদনা থাকিলে চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্ত্তব্য।

কাণ পাকা বা কাণে পূঁজ

কাণে বেদনার পর কাণ হইতে পূঁজ পড়িতে থাকিলে, ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কাণে পূঁজ জমা হইয়া রহিয়াছে, এবং কর্ণপঠহ ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

একটা সরু কাঠিতে পরিষ্কার তুলা জড়াইয়া লইয়া প্রতিদিন দুইবার কাণ পরিষ্কার করিয়া লইবেন। তারপর তুলার একটা মার্জ্জনী প্রস্তুত করিয়া উহা গরম "বোরিক এ্যাসিড্ সলিউশনে" (চোখ উঠায় যাহা ব্যবহার করা হইয়াছে) ভিজাইয়া লইয়া রন্ধ্র-পথ ভালরূপে মার্জ্জনা করিয়া দিবেন। ইহার পরে শুষ্ক তুলা দ্বারা কাণের মধ্য মুছিয়া লইয়া কিছু "বোরিক এ্যাসিড্ পাউডার" ভিতরে ছড়াইয়া দিবেন। কাগজের একটী নল প্রস্তুত করিয়া কাণের মধ্যে সহজে উক্ত পাউডার ছড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কাগজের নলের একদিকে কিছু পাউডার লইয়া, ঐ দিক কাণের মধ্যে দিয়া, অপর দিক দিয়া ফুঁ দিয়া উহা ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। প্রতিদিন এই প্রক্রিয়াটী করিবেন। কাণের যে যে স্থান বাহিয়া পূঁজ পড়িতে থাকে, সেই সেই স্থানের ক্ষত নিবারণ করিবার জন্য "ভ্যাসেলিন্" অথবা নারিকেল তৈল মাখিয়া দিবেন।

যাহাদের কাণ পাকা রোগ আছে, তাহারা যদি কখনও কাণের পশ্চাদ্ভাগে কোন বেদনা বোধ করে, তবে বুঝিতে হইবে যে রোগ খুব সাংঘাতিক হইয়াছে, এবং তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের হস্তে রোগীর ভার অর্পণ করিতে হইবে। অন্যথা শীঘ্রই রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

৪৮শ অধ্যায়

আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতীকার

আকস্মিক দুর্ঘটনা এবং আঘাত লাগা প্রভৃতি দৈনিক ব্যাপার। প্রত্যেক বৃহৎ পরিবারের এমন দিন কাটে না, যে দিন কাহারও না কাহারও কোন অঙ্গ কাটিয়া না যায়, বা আঘাত না লাগে, বা চক্ষে কিছু না পড়ে, বা বেদনা না হয়, বা অপর কিছু দুর্ঘটনা না ঘটে। এই সকল অনেক সময়ে সাংঘাতিক হয়, যেমন শরীরের কোন অঙ্গের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়, অথবা কোন স্থান গভীর ভাবে কাটিয়া প্রচুর রক্তপাত হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় অনেই শুধু হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ব্যতীত অপর কোন উপায়ে আহত ব্যক্তির সাহায্য করিতে পারেন না। কিন্তু আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইলে, কি করা কর্ত্তব্য সেই সম্বন্ধে সকলেরই অল্প বিস্তর জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য। কারণ সাময়িক কোন প্রতীকার দ্বারা হয়ত একজন লোকের জীবন রক্ষা পাইতে পারে।

ব্যাণ্ডেজ করা

প্রায় সকল প্রকার আঘাতেই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আবশ্যক, এই জন্য শরীরের বিভিন্ন স্থানে কেমন করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হয়, তাহা সকলেরই জানা কর্ত্তব্য। অতি পরিষ্কার কাপড় দ্বারা ব্যাণ্ডেজ প্রস্তুত করিবেন। হাতের বা পায়ের ব্যাণ্ডেজ দুই ইঞ্চি চওড়া হওয়া প্রয়োজন। আঙ্গুলের নিমিত্ত ব্যাণ্ডেজে এক ইঞ্চির কম চওড়া কাপড় লাগিবে। কতকগুলি ব্যাণ্ডেজ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত রাখা কর্ত্তব্য। ব্যাণ্ডেজগুলি গুটাইয়া পরিষ্কার কাপড়ে বা কাগজে জড়াইয়া রাখিয়া দিবেন। কিরূপে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হয়, তাহা পরবর্ত্তী চিত্রগুলিতে দ্রষ্টব্য।

আঘাত লাগা

কোন লোক পড়িয়া গেলে, অথবা তাহার কোন অঙ্গে আঘাত লাগিলে, শরীরের চামড়া অক্ষত থাকিয়া হয়ত মাংস থেঁৎলাইয়া যাইতে, অথবা রক্ত বহা কতিপয় নাড়ী ছিন্ন হইতে পারে। এই জন্যই আঘাত লাগিবার পরে কালশিরা পড়িয়া থাকে।

চিকিৎসা

আঘাত লাগিবার পরক্ষণেই বরফ বা ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করিবেন। বরফ পাওয়া না গেলে, খুব গরম জলে একখানা রুমাল বা তোয়ালে নিংড়াইয়া লইয়া,
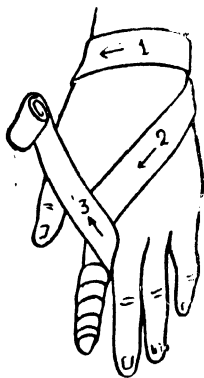
আঙুল ব্যাণ্ডেজ করা—
সংখ্যা অনুসারে
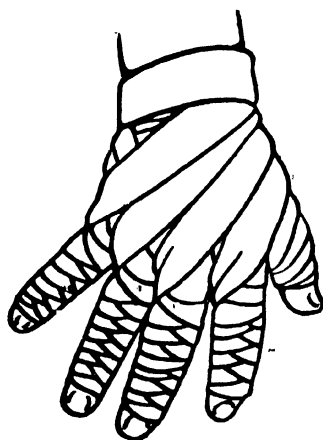
প্রত্যেক আঙুল পৃথক্‌ভাবে ব্যাণ্ডেজ করা
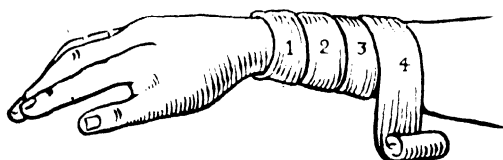
কব্জির ব্যাণ্ডেজ—সংখ্যা অনুসারে
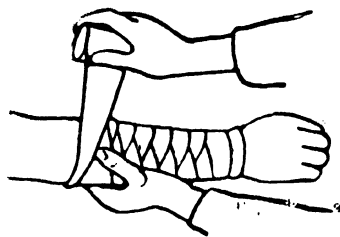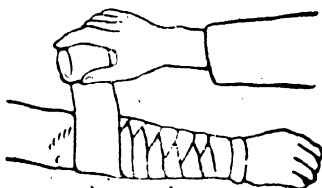
বাহুর ব্যাণ্ডেজ—কব্জিতে আরম্ভ করিয়া চিত্র অনুসারে ক্রমে ঊর্দ্ধে বাঁধিতে হইবে
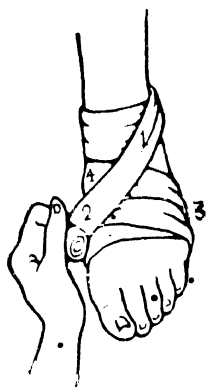
পায়ের ব্যাণ্ডেজ—সংখ্যা অনুসারে

মাথার ব্যাণ্ডেজ—চিত্র অনুসারে কাপড় কাটিয়া সংখ্যা অনুযায়ী বাঁধিতে হইবে
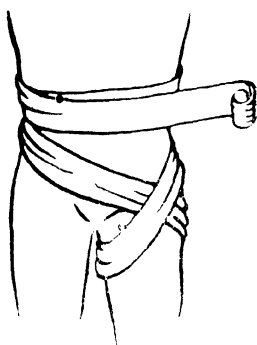
উরুর ব্যাণ্ডেজ—নিম্নের চিত্রানুসারে কাপড় কাটিয়া, উপরের চিত্রানুসারে বাঁধিতে হইবে

চক্ষুর ব্যাণ্ডেজ
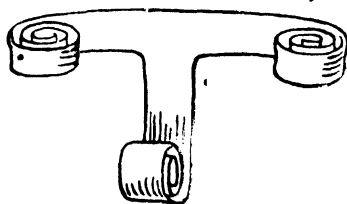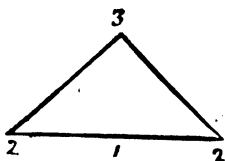
মাথায় তিন কোণা ব্যাণ্ডেজ

মাথায় তিন কোণা ব্যাণ্ডেজ—পার্শ্বচিত্র

বামে :—হাত ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য তিন কোণা ব্যাণ্ডেজ

নিম্নের চিত্রদ্বয়—স্কন্ধের ও উপরের বাহুর ব্যাণ্ডেজ
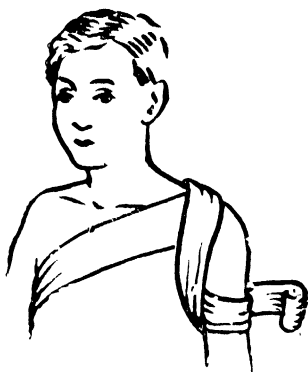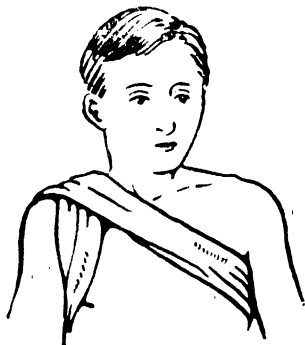
উহা আহত স্থানে প্রয়োগ করিবেন। উষ্ণ কাপড় খানি বার বার গরম জলে ডুবাইয়া লইবেন, অথবা একটা বোতল অতিশয় গরম জল পূর্ণ করিয়া উক্ত কাপড়খানির উপরে রাখিবেন।

আহত স্থান শরীরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা উর্দ্ধে ধরিয়া রাখুন। ইহাতে বেদনার অনেক উপশম হইবে। ঐস্থানের চামড়া ছিঁড়িয়া গেলে "টিংচার অব্ আইওডিন" লাগাইয়া দিবেন, অথবা কিছু "বোরাসিক এ্যাসিড পাউডার" ছড়াইয়া দিয়া একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবেন।

চামড়া বিদীর্ণ ও কর্ত্তিত হওয়া

চামড়া আঁচড়াইয়া গেলে অথবা সামান্য কাটিয়া গেলে, সেই স্থানে কিছু "টিংচার অব্ আইওডিন্" লেপন করিয়া "বোরাসিক এ্যাসিড পাউডার ছড়াইয়া দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আইওডিন্ দিবার পরে প্রথমে কিছু জ্বালা করিবে বটে, কিন্তু তাহা অল্পকাল মাত্র। আহত স্থান অপরিষ্কৃত থাকিলেও, "টিংচার অব্ আইওডিন্" দিবার পূর্ব্বে উহা ধুইয়া ফেলিবেন না।

আঘাত ক্ষুদ্র হইলে একবার ঔষধ দিলেই চলিবে। কিন্তু আঘাত বড় হইলে, এবং দ্বিতীয় দিনে আহত স্থানের চারিদিকে লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিলে, ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ফেলিবেন, এবং পুঁজ জমা হইয়া থাকিলে অর্দ্ধ বাটী গরম জলে ক্ষুদ্র এক চামচে "বোরাসিক্ এ্যাসিড" মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা উক্ত স্থান ধুইয়া ফেলিবেন। ধৌত করিবার পরে উক্ত ঔষধে এক টুকরা বস্ত্র ভিজাইয়া লইয়া, আহত স্থানে উহা রাখিয়া একটী ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবেন। এই বস্ত্র টুকরা প্রতি ঘণ্টায় "বোরাসিক্ এ্যাসিড সলিউশন্" দ্বারা ভিজাইয়া দিলে, অল্পকাল মধ্যেই আরোগ্য হইবে। "বোরিক্ এ্যাসিড" পাওয়া না গেলে, জলে উক্ত পরিমাণ সাধারণ লবণ মিশাইয়া লইবেন। আহত স্থান ধৌত করিবার জন্য অন্যান্য ঔষধও ব্যবহার করা যাইতে পারে। অর্দ্ধ বাটী গরম জলে কয়েক দানা "পটাশিয়াম্ পারম্যাঙ্গানেট্" অথবা ১০ হইতে ২০ ফোঁটা "লাইসল্" বা "কার্ব্বলিক এ্যাসিড" মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা বেশ সুফল লাভ করা যাইতে পারে।

অধিক রক্তপাত হইলে

কোন আহত স্থান হইতে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রচুর রক্ত পড়িতে থাকিলে, একখানি পরিষ্কার কাপড় খুব গরম জলে ডুবাইয়া লইয়া ঐ স্থানের উপরে চাপিয়া ধরুন। জল খুব গরম হওয়া আবশ্যক, নতুবা কোন ফল হইবে না।

কোন ক্ষত স্থান হইতে বেগে রক্ত পড়িতে থাকিলে, রোগীকে শয়ন করাইয়া দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ক্ষতস্থানের উপরের কোমল স্থান চাপিয়া ধরুন।
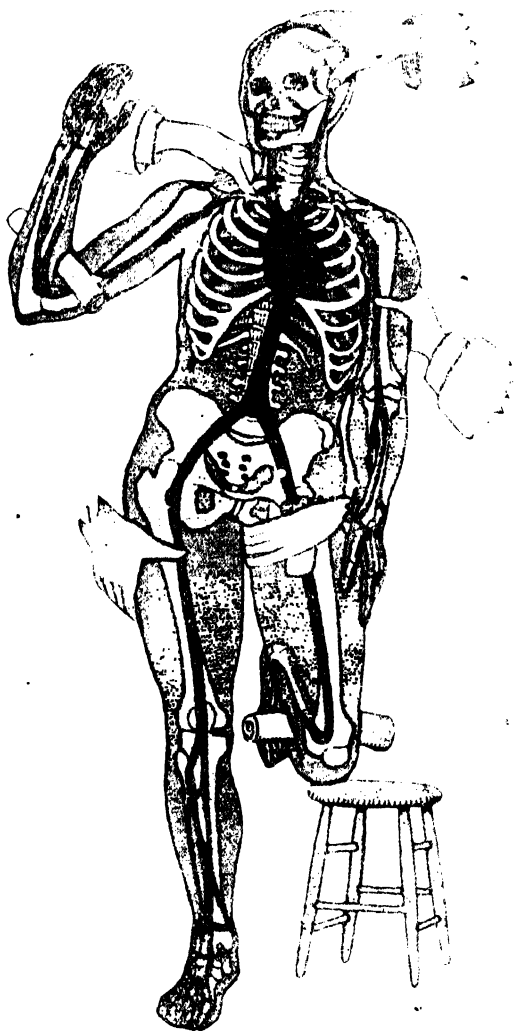
রক্ত পড়া বন্ধ করিতে হইলে কোন্ কোন্ স্থানে চাপ দিতে হইবে উপরের চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল

হাত বা পা কাটিয়া গেলে, ক্ষতস্থানের উপরে একখানি ভাঁজ করা কাপড় বা রুমাল ঢিলাভাবে বাঁধিয়া দিয়া একটা কাঠের বা বাঁশের সাহায্যে উহা পাকাইতে থাকুন, ইহাতে রক্ত বন্ধ হইবে। ঐ কাপড়ের ভাঁজে ক্ষুদ্র একটা পাথরের নুড়ি বা কর্ক, ঠিক ক্ষত স্থানের উপরে রাখিয়া দিলে, রক্ত বন্ধ করা আরও সহজ হইবে। উক্ত কাপড় খুব শক্ত করিয়া পাকাইতে হইবে (চিত্রে দেখুন)। যে হাত বা পা হইতে রক্ত পড়িতেছে, তাহা একটু উঁচু করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা হইলে ঐ হাতে রক্ত খুব কম যাইবে। রক্ত পড়া থামিয়া গেলে পাকান কাপড় খণ্ড খুলিয়া ফেলিবেন, কিন্তু উহা ধীরে ধীরে অল্প অল্প করিয়া ঢিলা করিয়া লইবেন, কারণ তাড়াতাড়ি খুলিয়া দিলে পুনরায় রক্ত পড়া আরম্ভ হইতে পারে।
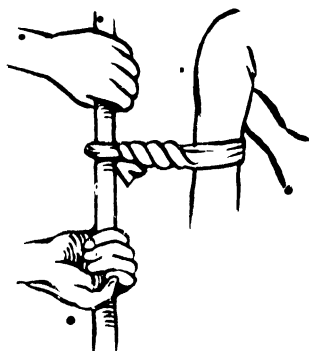
কাপড় দ্বারা হাত ও পা হইতে রক্ত পড়া নিবারণ

শক্ত করিয়া কাপড় পাকাইবার পরে, রক্তপ্রবাহ কমিয়া গেলে, একটী কাঠির আগায় তুলা জড়াইয়া তদ্দ্বারা একটা মার্জ্জনী প্রস্তুত করতঃ, ক্ষতস্থানে "টিংচার অব্ আইওডিন্" লাগাইয়া দিবেন। রক্ত পড়া থামিলে ক্ষতস্থানের উপরে পূর্ব্বে কয়েক মিনিট গরম জলে ফুটাইয়া লওয়া হইয়াছে এইরূপ একখানি কাপড় কয়েক ভাঁজ করিয়া ক্ষতস্থানের উপরে রাখিয়া দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবেন।

মাথার আঘাতের রক্ত বন্ধ

মাথার উপরে আঘাত লাগিলে ক্ষতস্থানের উপরে একখণ্ড পাতলা কাপড় "টিংচার অব্ আইওডিনে" ভিজাইয়া লইয়া রাখিয়া দিবেন, তৎপরে কয়েক ভাঁজ কাপড় গদির মত প্রস্তুত করিয়া উক্ত নেকড়ার উপরে রাখিয়া একটু জোরে বাঁধিয়া দিবেন।

মুখ ও গলা হইতে রক্তস্রাব

ওষ্ঠের কোন স্থান কাটিয়া গেলে, হাত ভালরূপে ধুইয়া ফেলিয়া মুখের মধ্যে তর্জ্জনী ঢুকাইয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ক্ষতস্থান জোরে চাপিয়া ধরিলে রক্ত পড়া বন্ধ হইবে।

মুখমণ্ডলের কোন স্থান হইতে রক্ত পড়িলে, রক্ত থামাইবার জন্য তাহার গলা এমন ভাবে চাপিয়া ধরিবেন যেন তাহাকে গলা টিপিয়া মারিতে উদ্যত

হইয়াছেন। ইহা ছাড়া, ক্ষতস্থানের উপরে একটা কাপড়ের গদি রাখিয়া চাপ দিতে থাকিবেন, এবং পরে বাঁধিয়া দিবেন।

বগল হইতে রক্ত পড়া

স্কন্ধে বা বগলে আঘাত লাগিয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে, অপর অঙ্গুলিগুলি অংশফলকের পিছনে রাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কণ্ঠাস্থির পশ্চাতে মাঝামাঝি স্থানে জোরে চাপিয়া ধরিবেন (২৮০ পৃষ্ঠার চিত্র দেখুন)।

ক্ষত দূষিত হইলে তাহার প্রতীকার

কোন ক্ষত ক্রমশঃ স্ফীত, লাল ও যন্ত্রণাদায়ক হইতে থাকিলে, এবং উহাতে পূঁজ জন্মিলে, অর্দ্ধবাটি গরম জলে ছোট এক চামচে "বোরাসিক এ্যাসিড" মিশ্রিত করিয়া কয়েক ভাঁজ কাপড় উহাতে ভিজাইয়া লইয়া ক্ষতস্থানের উপরে রাখিয়া দিবেন। উক্ত কাপড় পুনঃ পুনঃ ঔষধ দ্বারা ভিজাইয়া দিবেন, যেন সকল সময় উহা ভিজা থাকে। ক্ষতস্থানে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক কাপড় প্রথমে জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে ভুলিবেন না। "বোরাসিক এ্যাসিড" দ্বারা সিদ্ধ কাপড়ের উপরে এক টুক্‌রা "অয়েল ক্লথ" অথবা পরিষ্কার কলার পাতা রাখিয়া দিলে, কাপড়খণ্ড সহজে শুষ্ক হইবে না। "বোরাসিক এ্যাসিড" পাওয়া না গেলে, তৎপরিবর্তে সাধারণ লবণ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

হাত বা পায়ের কোন ক্ষতে পূঁজ জন্মিলে, নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যাইবে। ক্ষতযুক্ত হাত বা পা রাখা যায় এইরূপ দুইটী বড় বাল্‌তি সংগ্রহ করিয়া, একটী অতি উষ্ণ এবং অপরটী অতি শীতল জল দ্বারা পূর্ণ করুন। প্রতি গেলাস জলে ছোট এক চামচে লবণ, এই হিসাবে গরম জলে লবণ মিশাইয়া দিবেন। গরম জল যত বেশী গরম, এবং ঠাণ্ডা জল যত বেশী ঠাণ্ডা হইবে ততই ভাল। যে হাত বা পায়ে বেদনা, সেই হাত বা পা প্রথমে গরম জলের বাল্‌তিতে এক মিনিট বা তদধিককাল ডুবাইয়া রাখিয়া, পরক্ষণেই কয়েক সেকেণ্ডকাল ঠাণ্ডা জলের বাল্‌তিতে ডুবাইয়া দিবেন। কুড়ি মিনিট বা কিছু বেশীক্ষণ এই প্রক্রিয়া করিতে থাকুন। গরম জল অতিশয় গরম রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে ফুটন্ত জল মিশাইয়া লইতে হইবে। এইরূপে ঠাণ্ডা জলও ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে বদলাইয়া লইবেন।

মচ্‌কান

সন্ধিস্থান সহসা মোচ্‌ড়াইয়া গেলে যে আঘাত লাগে, তাহাকে মচ্‌কান (Sprain) বলে। সাধারণতঃ হাতের কব্জি বা পায়ের গোড়ালি মচ্‌কাইয়া থাকে।

সাংঘাতিক ভাবে মচ্‌কাইলে চিকিৎসক ডাকা কর্ত্তব্য; কারণ আঘাত প্রাপ্ত স্থানের অস্থি ভাঙ্গিয়া যাওয়াও সম্ভব হইতে পারে।

মচ্‌কাইবার পরে প্রথমেই, অতিশয় গরম জলে (যতটা সহ্য হয়) আধ ঘণ্টা বা একটু বেশী সময় আহত অঙ্গ ডুবাইয়া রাখিবেন। পরে "এ্যাড্‌হিসিভ্‌ প্লাষ্টার" (Adhesive Plaster) দ্বারা, অথবা কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ দ্বারা উক্ত অঙ্গ জোরে বাঁধিয়া দিবেন। যে স্থান মচ্‌কাইয়া গিয়াছে তাহারই নিম্নভাগ হইতে ব্যাণ্ডেজ করিতে আরম্ভ করিবেন। হাত মচ্‌কাইয়া গেলে অঙ্গুলির নিম্নভাগ হইতে কব্জির দিক দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিতে আরম্ভ করিবেন। দ্বিতীয় দিনে ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ফেলিয়া আহত অঙ্গ পনের কি বিশ মিনিট কাল গরম জলে ডুবাইয়া রাখিবেন। গরম জলে উক্ত অঙ্গ ডুবাইয়া রাখিবার সময় উহা ধীরে ধীরে ঘষিতে থাকিবেন। নীচে হইতে উপর দিকে, এবং উপর হইতে নীচের দিকে ঘষিতে হইবে।

হাড় ভাঙ্গা

কোন অঙ্গের হাড় ভাঙ্গিয়া গেলেই চিকিৎসক ডাকা কর্ত্তব্য। আঘাত পাইবার পরেই চিকিৎসক পাওয়া না গেলে কি করা কর্ত্তব্য, নিম্নে তাহাই লিখিত হইল। ইহা হইতে চিকিৎসকের আগমনের পূর্ব্বে যে যে প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, তাহা জানিতে পারা যাইবে।

কোন অস্থি ভাঙ্গিয়া গেলে রোগীকে শান্তভাবে বিছানায় শোয়াইয়া রাখুন। একখানা কাঠ ভাঙ্গিয়া গেলে, উহার ভগ্ন দুই মুখের টুক্‌রাগুলি যেরূপ তীক্ষ্ণভাবে বাহির হইয়া থাকে, অস্থি ভগ্ন হইলেও ভগ্ন হাড়ের দুই মুখে, সেইরূপ তীক্ষ্ণ হাড়ের টুক্‌রা বাহির হইয়া থাকে। তাই ভগ্ন অঙ্গ নাড়া চাড়া করিলেই হাড়ের নিকটবর্ত্তী মাংসে আঘাত লাগিয়া অতিশয় যন্ত্রণা দান করে।

অস্থিভঙ্গ হইবার পরে রোগীকে অন্যত্র সরাইবার পূর্ব্বে, যেরূপ হউক একখানি "স্প্লিণ্ট" (Splint) তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিবেন, যেন ভগ্ন অস্থি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া যন্ত্রণা না হইতে পারে।

হাত বা পায়ের কোন স্থানের হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে কয়েকখানা দুই তিন ইঞ্চি চওড়া বাঁশের চটা তৈয়ার করুন। হাতের অস্থি ভঙ্গের নিমিত্ত ব্যবহার করিতে হইলে বাঁশের টুক্‌রা খানি এক ফুট লম্বা হওয়া আবশ্যক। পায়ের নিমিত্ত আবশ্যক হইলে, উহা পায়ের পাতা হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক।
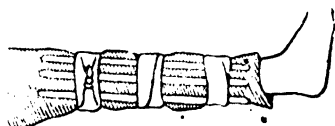
ভগ্ন পদে কাষ্ঠখণ্ড ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা

ভগ্নবাহুতে বা পদে "স্প্লিণ্ট্" দিতে হইলে, প্রথমে ধীরে ধীরে ভগ্ন অঙ্গ সোজা ভাবে টানিয়া লইয়া, ভগ্ন স্থান চাপিয়া ধরিবেন, এবং দুই ভগ্ন প্রান্ত যতদূর সম্ভব যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া, হাড়খানি সোজা করিয়া দিবেন। এই সমুদয় বেশ ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিতে হইবে, যাহাতে বেদনা না লাগে। তার-পর ভগ্ন অঙ্গের উপরিভাগে পুরু তুলা অথবা গদির মত পুরু করিয়া কয়েক ভাঁজ পুরু কাপড় জড়াইয়া দিবেন। তুলা বা কাপড় জড়ান শেষ হইলে, বাঁশের কয়েকখানি চটা তদুপরি স্থাপন করিয়া বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিতে হইবে (২৮৩ পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য)। এইরূপে "স্প্লিণ্ট্" (Splint) বাঁধা শেষ হইলে পর রোগীকে গৃহে বা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে পারেন।

ভগ্ন অস্থি যোড়া লাগিতে প্রায় তিন সপ্তাহ বা অধিক কাল লাগিতে পারে, এই জন্য কিছু বেশী কাল উক্ত "স্প্লিণ্ট্" রাখিয়া দিতে হইবে।

যৌগিক হাড় ভাঙ্গা

যৌগিক হাড ভাঙ্গিয়া চামড়া ফুড়িয়া বাহির হইলে, ঐ ক্ষত বিষাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই অধিক, কারণ গভীর তন্তুসমূহের নিকটে ময়লা ও জীবাণু খুব বেশী আকৃষ্ট হয়, কাজেই খুবই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সম্ভব হইলে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাকিতে হইবে। ঘায়ের চিকিৎসার ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিতে হয়, দেহের যে ক্ষত নীরোগ করিবার শক্তি আছে, সেই শক্তি কার্য্য করিতে আরম্ভ না করা পর্য্যন্ত একটী নল দ্বারা ক্ষতের ময়লা ও জীবাণু বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপে ভগ্ন স্থানের চিকিৎসা খুব সতর্কতার সহিত করিতে হইবে।

অস্থি-সন্ধিচ্যুত (Dislocation)

হাড়ের প্রান্তভাগ স্থানচ্যুত হইলে, সন্ধিস্থল সঞ্চালিত করা যায় না। এই লক্ষণ দ্বারা অস্থিভঙ্গ বা অস্থি সন্ধিচ্যুতির পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়।

স্থানচ্যুত অস্থি যথাস্থানে ফিরাইয়া আনাই ইহার প্রতীকারের লক্ষ্য। অধিকাংশ স্থলেই এমতাবস্থার চিকিৎসকের সহায়তা আবশ্যক। সুতরাং কোন অঙ্গের অস্থি-সন্ধিচ্যুতি হইলে চিকিৎসক ডাকাই কর্ত্তব্য। যত সত্বর চিকিৎসকের সাহায্য লাভ করা যাইবে, তত সত্বর ইহা আরোগ্য হইবে। বিলম্বে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইতে পারে।

দন্তশূল

যে দাঁতে বেদনা সেই দাঁতের উপরে কোন ছিদ্র থাকিলে প্রথমে উহার ভিতরের সঞ্চিত ময়লা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবেন। অল্প পরিমাণ শোষক তুলায়

(Absorbent cotton) "ক্রিয়োসোট্" অথবা লবঙ্গের নির্য্যাস (Oil of cloves) মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ছিদ্রটী বন্ধ করিয়া দিবেন। দাঁত খুঁটনি দ্বারা ছিদ্রের মধ্যে তুলাটুকু ভরিয়া দিবেন। "ক্রিয়োসোট্" যেন কোনরূপে উদরস্থ না হয়, সে বিষয় সাবধান হইবেন। তুলায় দুই এক ফোঁটা "কার্ব্বলিক এ্যাসিড" মিশাইয়া দাঁতের গোড়ায় ছিদ্র মধ্যে ভরিয়া দিলেও বেদনার উপশম হইবে। অনেক সময়ে ছিদ্র মধ্যে "সোডা বাইকার্ব্বনেট্" (খাবার সোডা) ভরিয়া দিলেও যন্ত্রণা সারিয়া যাইবে।

বস্ত্রাদি দ্বারা অগ্নির তাপ নষ্ট করণ

রোগীকে সত্বর কোন কম্বল, কোট—নিকটে যে কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়—যারা জড়াইয়া মাটিতে ঘুরাইতে থাকুন। এইরূপে তাহার চতুষ্পার্শ্বে বস্ত্রাবদ্ধ স্থানে চাপ পড়িলে অগ্নির তাপ নষ্ট হইয়া যাইবে। রোগীকে মাটিতে শয়ন করাইয়া লইলে তাপ মস্তকের দিকে উঠিয়া শ্বাসের সহিত ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না।

দাহ বা আগুনে পোড়া

অতি সামান্য পুড়িয়া গেলে শীতল জলে দগ্ধ অঙ্গ ডুবাইয়া রাখিলে সুফল লাভ করা যাইবে। বিশ মিনিট বা ততোধিক কাল শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিয়া, পরে দগ্ধ অঙ্গের উপরে "কার্‌বোলেটেড্ ভ্যাসেলিন্" (ছোট এক চাম্‌চে ভ্যাসেলিনের সহিত দুই তিন ফোঁটা কার্ব্বলিক্ এ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া), অথবা

ফুটান নারিকেল তৈল এবং ডিম্বের শ্বেতাংশ সমভাবে মিশাইয়া মলম প্রস্তুত করিয়া দগ্ধস্থানে লেপিয়া দিবেন।

গুরুতরভাবে পুড়িয়া গেলে, রোগীর অঙ্গের বস্ত্রাদি তাড়াতাড়ি সরাইয়া ফেলিতে হইবে। তারপর "বোরাসিক্ এ্যাসিড" বা লবণ জলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া লইয়া দগ্ধ অঙ্গের উপরে মাঝে মাঝে স্থাপন করিবেন। এই অধ্যায়ের প্রথমে "ত্বক্ বিদীর্ণ ও কর্ত্তিত হওয়া" শীর্ষক অংশে ঐ প্রকার তরল ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত হইয়াছে। প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা কাল দগ্ধ অঙ্গের উপরে ঔষধ সিক্ত বস্ত্রখণ্ড রাখিয়া দিবেন; এবং যখন উহা সরাইয়া ফেলিবেন, তখন তদুপরি "বোরাসিক্ এ্যাসিডের" গুঁড়া ছড়াইয়া দিবেন। দুই চাম্‌চে "ভ্যাসিলিনের" সহিত এক চাম্‌চে "বোরাসিক্ এ্যাসিড" মিশ্রিত করিয়া একটা মলম প্রস্তুত করিবেন, এবং এক খণ্ড নেকড়ায় উহা মাখাইয়া দগ্ধ অঙ্গের উপরে দিবেন।

ফোস্কা পড়া (Scalds)

গায়ের চামড়ার উপরে ফুটন্ত জল বা অপর কোন উষ্ণ তরল পদার্থ পতিত হইলে ফোস্কা পড়ে। ফোস্কাগুলি খুব বড় না হইলে (অন্ততঃ একটী টাকার মত) কদাচ গালিয়া দিবেন না। প্রতীকারের নিমিত্ত একটী ছোট বোতলে (বড় ৪।৫ চাম্‌চে জল ধরিতে পারে এইরূপ বোতলে) ছোট এক চাম্‌চে "পিক্‌রিক্ এ্যাসিড" লইবেন। দিনের মধ্যে দুই তিনবার দগ্ধ অঙ্গে উহা লেপিয়া দিবেন, এবং তৎপরে উহার উপরে কিছু "বোরাসিক্ এ্যাসিডের" গুঁড়া ছড়াইয়া দিবেন। পরে পরিষ্কার কাপড় দ্বারা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবেন।

হাত বা পায়ে পেরেক বা বাঁশের কুঁচি বিদ্ধ হওয়া

প্রথমে যাহা বিদ্ধ হইয়াছে, তাহা টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিবেন, পরে ছোট এক টুকরা কাঠের চেলায় তুলা জড়াইয়া একটা ছোট মার্জ্জনী প্রস্তুত করিবেন। উক্ত মার্জ্জনীটী "টিংচার অব্ আইওডিনে" ডুবাইয়া লইয়া, চামড়ার মধ্যে যে গর্ত্ত হইয়াছে, তাহার তলদেশ পর্য্যন্ত ভিজাইয়া দিবেন।

সর্পদংশন

কুকুরে কামড়াইলে যেরূপ প্রতীকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সর্পদংশনেও সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয় (২৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আহত স্থান হইতে কিছু রক্ত বাহির করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। শক্ত করিয়া একটা বাঁধ দিয়া সাপের বিষদন্ত দ্বারা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র হইয়াছে তন্মধ্যে ছুরির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া দিবেন।

ছিদ্রের চারিদিকে চিপিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিবেন। আহত স্থান হইতে কয়েক মিনিট রক্ত পড়িয়া গেলে ছিদ্র মধ্যে "টিংচার অব্ আইওডিন্" মার্জ্জন করিয়া দিবেন। একখানি চামচেতে সামান্য একটু জলে কয়েক দানা "প্যার-ম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাশ্" মিশ্রিত করিয়া "টিংচার অব্ আইওডিন্"এর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। সর্প খুব বিষাক্ত হইলে আহত স্থানের মাংসের মধ্যে "প্যারম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাশ্" প্রবেশ করাইয়া দিবেন। ইহার জন্য বড় দুই চামচে জলে পাঁচ গ্রেণ "পারম্যাঙ্গানেট্" মিশ্রিত করিয়া লইবেন।

কাঁকড়া বিছা বা বিচ্ছুর দংশন

কাঁকড়া বিছায় বা বিচ্ছুতে দংশন করিলে, আহত স্থানের চামড়ায় একটী ছুঁচ দ্বারা গভীর ক্ষত করিয়া দিবেন। চামড়ার উপরে ঐরূপ আরও দশ বা বারটী ছিদ্র করিবেন তারপর উক্ত স্থান জলে ভিজাইয়া লইয়া তদুপরি কয়েক দানা "প্যারম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাশ্" ছড়াইয়া দিয়া কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিবেন।

সর্দ্দিগর্ম্মি

অনেকক্ষণ রৌদ্রে পরিশ্রম করিতে করিতে সহসা অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, সত্বর কোন ছায়াযুক্ত শীতল স্থানে লইয়া গিয়া মাথায় ও বুকে ঠাণ্ডা জল ঢালিতে হইবে। রোগীর উপরে ঠাণ্ডা জল ঢালিবার সময়ে কেহ যেন তাহার হাত ও বুকের উপরের চামড়া বেশ জোরে মর্দ্দন করেন। সর্দ্দিগর্ম্মি বড়ই ভয়ানক রোগ তাই রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য চিকিৎসক ডাকা কর্ত্তব্য।

বিষক্রিয়া

"কার্ব্বলিক এ্যাসিডের" মত ক্ষয়কারক বিষ ব্যতীত অন্য বিষ খাইলে সর্ব্বপ্রথমেই রোগীকে বমন করাইবেন। নানা উপায়ে উহা সাধন করা যাইতে পারে। গলার মধ্যে অঙ্গুলি বা পালক দিয়া সুড়সুড়ি দিতে থাকুন। এইরূপ প্রক্রিয়ায় বমন না হইলে, অল্প গরম এক গেলাস জলে বড় দুই চামচে সরিষার গুঁড়া অথবা বড় চারি চামচে লবণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবেন। ইহাতে অবশ্যই বমন হইবে।

কার্ব্বলিক এ্যাসিড্ খাওয়া

"কার্ব্বলিক এ্যাসিড" গিলিয়া ফেলিলে, রোগীকে বমন করাইতে চেষ্টা না করিয়া তাড়াতাড়ি চারি পাঁচটা কাঁচা ডিম খাওয়াইয়া দিবেন। ইহার পরে এক গেলাস জলে বড় এক চামচে "ম্যাগ্নেসিয়াম্ সাল্ফেট্" (এপ্সম্ সল্ট) অথবা "সোডিয়াম্ সালফেট্" মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবেন।

আর্সেনিক বা ইঁদুর মারা বিষ

বমন করাইবার নিমিত্ত উপরের প্রণালীগুলি অবলম্বন করিবেন। তারপর রোগীকে চারি পাচটা কাঁচা ডিম, এবং বড় একমাত্রা "ম্যাগনেসিয়াম্ অথবা সোডিয়াম্ সাল্‌ফেট্" খাইতে দিবেন।

জলমগ্ন ব্যক্তিকে বাঁচান

জল মগ্ন ব্যক্তিকে জল হইতে উপরে তুলিয়া তাড়াতাড়ি তাহার মুখ ও নাকের মধ্য হইতে জল কাঁদা বাহির করিয়া মুছিয়া ফেলিবেন। বুকে পিঠে কোন কাপড় জড়ান থাকিলে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিবেন; মুখ হাঁ করাইয়া দুই পাটি দাঁতের মধ্যে এক টুকরা কাষ্ঠ রাখিয়া দিবেন। রোগীকে উবুড় করিয়া শোয়াইয়া দিবেন। তাহার দুই বাহুর নীচে, আপনার দুই হাত রাখিয়া দিয়া, তাহার শরীরের মধ্য ভাগ উঁচু করিয়া ধরিবেন, যেন ফুস্‌ফুসের জল বাহির হইয়া যায়। নাক মুখ দিয়া জল বাহির হওয়া থামিয়া গেলে, রোগীকে শোয়াইয়া তাহার তলপেটের নীচে কতকগুলি কাপড় চোপড় গুটাইয়া রাখিয়া দিউন। তারপর আপনার দুই হাত রোগীর পিঠের উপরে রাখিয়া সজোরে চাপ দিতে থাকুন, পরে সহসা হাত ছাড়িয়া দিউন। বার বার ঐরূপ চাপ দিবেন ও ছাড়িয়া দিবেন। (যেরূপ দ্রুতভাবে আপনি শ্বাস প্রশ্বাস লইয়া থাকেন, সেইরূপ দ্রুত ঐরূপ করিবেন।) পিঠের উপরে চাপ দিবার ফলে ফুস্‌ফুস্ হইতে শ্বাস বাহির হইয়া যায়, এবং চাপ থামাইয়া দিলে ফুস্‌ফুসে বায়ু প্রবেশ করে। রোগীর জীবনের কোন চিহ্ন দেখা গেলে, কৃত্রিম শ্বাস নির্গমের এই প্রক্রিয়া এক ঘণ্টা বা ততোধিক কাল চালাইতে থাকিবেন; নিকটে অপর কেহ সাহায্য করিবার থাকিলে, রোগীর গায়ের চামড়া তাড়াতাড়ি শুকাইয়া ফেলিবার জন্য, তাহার দ্বারা রোগীর চামড়া মার্জ্জন করিয়া দিবেন; এতদ্ব্যতীত গরম জলে বোতল পূর্ণ করিয়া রোগীর দুই পার্শ্বে রাখিয়া দিউন; জল যেন খুব গরম না হয়, তাহা হইলে রোগীর গায়ের চামড়া পুড়িয়া যাইবে; কারণ মৃত-প্রায় ব্যক্তির গাত্রত্বক্ সহজেই দগ্ধ হয়।

কুকুর বা অপর জন্তুর দংশনের প্রতীকার

হাত বা পায়ের কোন স্থানে দংশন করিলে আহত স্থানের অতি সন্নিকটে উপরিভাগে একটা শক্ত দড়ি দ্বারা খুব জোরে বাঁধিয়া দিবেন। দড়ির নীচে একটা লাঠি গুঁজিয়া দিয়া বাঁধ করিয়া দিবেন। এইরূপ করিলে ক্ষতস্থান হইতে বিষ উর্দ্ধে উঠিতে পারিবে না। দড়ি দ্বারা ভাল করিয়া বাঁধিলে উপরিলিখিত পেরেক বা অপর কিছু বিদ্ধ হওয়ার চিকিৎসার প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। "আইওডিন্" ব্যবহার করিবার পরে ধীরে ধীরে বাঁধটী খুলিয়া দিবেন, একেবারে

খুলিয়া দিবেন না। যত সত্বর সম্ভব রোগীকে কোন "পাশ্চার ইনৃষ্টিটিউটে" (জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসাগারে) পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা উচিত। ক্ষিপ্ত জন্তুতে দংশন করিলে আদৌ বিলম্ব না করিয়া ঐরূপ স্থানে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

ক্ষিপ্ত কুকুরে, অথবা ক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যায় এরূপ প্রাণীতে কামড়াইলে কি করিতে হইবে তাহা নিম্নে দ্রষ্টব্য। ভারতে চারিটী "পাশ্চার ইনৃষ্টিটিউট্" আছে। বড় বড় সরকারী হাসপাতালেও ঐরূপ চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসক কিংবা ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে আপনাকে নিকটবর্ত্তী উপযুক্ত স্থানে যাইবার পরামর্শ দিবেন। পরীক্ষার জন্য কখন কখন ক্ষিপ্ত পশুর মাথাটি কাটিয়া রোগীর সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হয়।

জলাতঙ্ক

মন্তব্য:—কসৌলির পাশ্চার ইনৃষ্টিটিউট্ অব্ ইণ্ডিয়ার অস্থায়ী অধ্যক্ষ লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ই. ডি. ডব্লিউ. গ্রেগ, সি. আই. ই., এম্. ডি., ডি. এস্. সি., আই. এম. এস্. মহাশয় নিম্নলিখিত মন্তব্যটী প্রকাশ করিয়াছেন।

ক্ষত চিকিৎসা

দংশনের পর যত শীঘ্র সম্ভব ক্ষত স্থান ধুইয়া শুকাইয়া ঔষধ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পোড়াইতে হইবে। খাঁটি "কার্ব্বলিক্ এ্যাসিড্" এই উদ্দেশ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। কারণ ইহা শরীরের মধ্যে বেশ ভাল করিয়া ভেদ করিয়া যায়, অতি সত্বর বিষ নষ্ট করিয়া ফেলে, এবং ইহা শরীরের কোন অঙ্গের যন্ত্রণাদায়ক নহে, কেবল অল্পকালের জন্য ক্ষত স্থান একটু জ্বালা বোধ হয়। খাঁটি "কার্ব্বলিক এ্যাসিড্" পাওয়া না গেলে—"পার্ম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাশ্,"—দানার আকারে বা সম্পূর্ণ অম্লসিক্ত "সলিউশন্" খাঁটি "নাইট্রিক্ এ্যাসিড্" (nitric acid), "সিল্‌ভার নাইট্রেট্" (silver nitrate) প্রভৃতিও ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু খাঁটি "কার্ব্বলিক এ্যাসিডের" ন্যায় ইহা উপকারী নহে।

সম্পূর্ণরূপে ঔষধ দ্বারা পোড়ান কিরূপ এই স্থানে বর্ণনা করা আবশ্যক। কাহারও কাহার ধারণা আছে, দুইটী দাঁতের ক্ষত বেশ ভাল করিয়া পোড়াইতে, পাঁচ ছয় বর্গ ইঞ্চি চামড়া পোড়াইতে হয়, আর ক্ষত স্থানের শেষ সীমা পর্য্যন্ত কষ্টিক (ঔষধ) পৌঁছাইল কিনা দেখিবার প্রয়োজন নাই। ক্ষত স্থান ভাল

করিয়া পোড়াইতে হইলে, পর পর প্রত্যেকটী দাঁতের দাগ ভাল করিয়া পোড়াইতে হইবে; এবং যাহাতে গর্ত্তের ধারে ও তলায় সর্ব্বত্র কষ্টিক (ঔষধ) লাগে, সে বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে; কখন কখন যে সকল স্থানে বিষ লাগা সম্ভব, সেই সকল স্থানে যাহাতে সহজেই ঔষধ যাইতে পারে, সেই জন্য একটু কাটিয়া দেওয়া প্রয়োজন হয়। যেখানে স্পষ্ট দাঁতের দাগ থাকিবে সে স্থানে পরীক্ষা করিবার জন্য একটী শলাকা ব্যবহার করা উচিত।

যাহাতে অনেকটা চামড়া নষ্ট করা না হয় সে বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কারণ তাহাতে আরোগ্য হইতে বিলম্ব হইবে। দাঁতের বিষ যে সকল তন্তুতে লাগিতে পারে সেই সকল তন্তু পুড়িয়াছে কিনা তাহা দেখিলেই হইল, আর কিছুর প্রয়োজন নাই।

আমাদের বিশ্বাস যে, দংশনের এক ঘণ্টার মধ্যে যদি রোগীকে পাওয়া যায়, এবং এমন কোন অঙ্গে যদি দংশন হইয়া থাকে, যাহা কাটিয়া বাদ দেওয়া যায়, তবে যে সকল স্থানে বিষ থাকিতে পারে, সেই সকল স্থান সমেত ক্ষতস্থান কাটিয়া বাদ দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। কি পোড়ান, কি কাটিয়া বাদ দেওয়া কিছুর উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। তথাপি ইহাতে বহু বিষ নষ্ট হয়, অবশিষ্ট বিষ পাশ্চারের প্রণালী মতে চিকিৎসা করিয়া নষ্ট করিলেই চলে।

জলাতঙ্ক রোগের ক্ষিপ্রতা নিবারণের জন্য পাশ্চারের প্রণালী মতে চিকিৎসা

ক্ষতস্থান ভাল করিয়া দগ্ধ করিবার পর, বিবেচ্য বিষয় হইবে পাশ্চার ইনষ্টিটিউটে পাঠান হইবে কিনা? উপযুক্ত চিকিৎসক পাওয়া না গেলে, অথবা অন্য কোন প্রকার অসুবিধা হইলে, ক্ষতস্থানের লক্ষণ এবং অবস্থা বিশেষরূপে বিবৃত করিয়া পাশ্চার ইনষ্টিটিউটে তার করিতে হইবে। চিকিৎসার প্রয়োজন না হইলে রোগীর যাতায়াতের খরচ ও কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। পাশ্চার ইনষ্টিটিউটে তার করিবার সংক্ষিপ্ত ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

1. Pasteur Institute of India, Kasauli................Pasteur
2. Pasteur Institute of Southern India, Coonoor (Madras)..Lyssa
3. Pasteur Institute, Rangoon (Burma)...................Virus
4. King Edward VII. Memorial Pasteur Institute, Shillong (Assam)..................................Rabies

—*"Rabies and Anti-Rabic Treatment in India," pp. 9-11.*

ভারতের অধিকাংশ স্থানেই বর্ত্তমানে পাশ্চারের প্রণালী মতে কুকুর শৃগালাদির দংশনে ক্ষিপ্ততা চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে, সুতরাং যাহারা উল্লিখিত চারিটী ইন্‌ষ্টিটিউট্ হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন, তাহাদের পূর্ব্বের ন্যায় সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার আবশ্যকতা নাই। যে যে স্থানে বড় বড় সরকারী হাসপাতাল, সামরিক হাসপাতাল, মিশন হাসপাতাল, বিখ্যাত রেলওয়ে হাস্পাতাল এবং জিলা ও সেণ্টাল জেল রহিয়াছে, সেই সমুদয় স্থানে ইহার চিকিৎসা করিবার সুযোগ আছে। কুকুরে দংশন করায় ক্ষিপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকিলে প্রথমতঃ উপরি-উক্ত ব্যবস্থানুযায়ী চিকিৎসা করিতে হইবে। তৎপরে যেস্থানে পাশ্চারের প্রণালী মত চিকিৎসা করা হয়, যত সত্বর সম্ভব রোগীকে সেই প্রকার কোন নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রেরণ করিবেন। কারণ এক ঘণ্টার বিলম্বেও মহা অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। রোগীর সহিত ঐ কুকুরের মস্তিষ্কের কতকটা অংশ লইয়া যাইতে ভুলিবেন না, কেননা ইহা একটী অত্যাবশ্যক বিষয় হইলেও প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়। স্মরণে রাখিবেন সত্বর চিকিৎসা দ্বারা জীবন লাভ সম্ভব, অপর পক্ষে বিলম্বে অশেষ জ্বালায় প্রাণ নাশ ঘটিবার আশঙ্কা আছে।

৪৬শ অধ্যায়

নানাপ্রকার ব্যাধি

মুখে ঘা

২৭শ অধ্যায়ে শিশুদিগের মুখে সাধারণ ঘায়ের চিকিৎসা-বিধি প্রদত্ত হইয়াছে।

দাঁত, মুখ ও জিহ্বা অপরিষ্কার থাকিবার নিমিত্তই সাধারণতঃ বয়স্কদিগের মুখে ঘা হইয়া থাকে। গাল ও ওষ্ঠের অভ্যন্তর ভাগে শাদা শাদা ক্ষত উৎপন্ন হয়। উহা বড়ই যাতনাদায়ক।

চিকিৎসা বিধি

নয় ও ১০নং ব্যবস্থা-পত্র অনুযায়ী, ঔষধ দ্বারা মুখ পরিষ্কার রাখিবেন (৫০শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। বিশুদ্ধ "লাইসল্" অথবা "কার্ব্বলিক এ্যাসিডে" দাঁত খুঁটুনির অগ্রভাগ ডুবাইয়া লইয়া তদ্দ্বারা ক্ষতস্থানে উক্ত ঔষধ লাগাইয়া দিবেন, বিষ যেন গলাধঃকরণ না হয়, তজ্জন্য মুখ হইতে থুথু ফেলিবেন।

হিক্কা

কিছুকাল শ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিলে, হিক্কা অনেক সময়ে থামিয়া যায়। মুখের মধ্য হইতে জিহ্বা বাহির করিয়া দুই এক মিনিট ধরিয়া রাখুন, তাহা হইলেই উহা নিবারিত হইবে। এক গেলাস খুব গরম জল পান করিলেও হিক্কা থামিয়া যাইবে।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব

অনেক সময়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সাহায্যে নাসিকা ধরিয়া শুধু চাপিয়া দিলেই রক্তস্রাব নিবারিত হইতে পারে।

প্রতীকারের অপর একটী উপায় এই—এক খণ্ড বরফ নাসিকার অগ্রভাগে, এবং অপর একখণ্ড মুখের মধ্যে পূরিয়া দিবেন। আবার ঘাড়ের উপরে একখণ্ড বরফ রাখিয়া দিলেও রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়।

নাসিকার মধ্যে কিছু লবণ মিশ্রিত জল ঢালিয়া দিলেও রক্তস্রাব কখন কখন বন্ধ হইয়া যায়।

উপরি-উক্ত প্রক্রিয়াগুলি দ্বারা উপকার না হইলে কিছু শোষক তুলা লইয়া, কনিষ্ঠাঙ্গুলির শেষ পর্ব্বের আকারে কতকগুলি ছোট ছোট গুটি প্রস্তুত

করিবেন। গুটিগুলি পৃথক্‌ভাবে এক এক গাছি সূতা দ্বারা বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিবেন। প্রত্যেক গাছি সূতা ছয় কি আট ইঞ্চি লম্বা হইবে। নাকের মধ্যে উক্ত তুলার গুটিগুলি প্রায় তিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত ভরিয়া দিবেন। এই ভাবে নাসারন্ধ্র একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া ৩০ মিনিট বা তদধিককাল রাখিয়া দিবেন তারপর সময় মত সূতার প্রান্তভাগ ধরিয়া এক একটী গুটি টানিয়া বাহির করিবেন।

অন্ত্র বৃদ্ধি

অন্ত্রের কোন অংশ, উদর গহ্বরের প্রাচীরের কোন ছিদ্রপথে নামিয়া পড়িলে তাহাকে "হার্নিয়া" বলে। ইহার ফলে চামড়ার নীচে কোথাও সহসা ফুলিয়া উঠে। উহা সাধারণতঃ কুচ্‌কিতে হইয়া থাকে।

হার্নিয়া প্রতীকারের নিমিত্ত চিকিৎসক দেখান আবশ্যক। স্ফীত স্থানে চাপ দিলে মল অন্ত্র যদি উদর গহ্বরে উঠিয়া না যায়, তবে রোগীকে শয়ন করাইয়া দিবেন, এবং সত্বর চিকিৎসক ডাকিয়া আনিবেন।

হার্নিয়া রোগে কখন কখন এক প্রকার অন্ত্র সংস্থাপক পেটী ব্যবহার করা হইয়া থাকে। উক্ত পেটী উদরের চারিদিকে বেড় দিয়া বাঁধা হইয়া থাকে, এবং যে স্থান দিয়া মল অন্ত্র উদর গহ্বর হইতে বাহির হয় সেই স্থানে শক্ত ও গোলাকার একটা প্যাড্ দ্বারা চাপিয়া রাখা হয়। রোগীর শরীরের মাপ অনুযায়ী উক্ত পেটী ঠিক করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অস্ত্রোপচার এই রোগে উৎকৃষ্ট চিকিৎসা, একবার কোন সুদক্ষ অস্ত্রচিকিৎসক দ্বারা অস্ত্র করা হইলে আর কখনও উহা হয় না।

মূত্রাশয়ের পাথরী

পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব, প্রস্রাবকালীন বেদনা, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত পড়া ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর নির্গম প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে যে মূত্রাশয়ে পাথর হইয়াছে।

প্রতীকার

বিছানায় শুইয়া সম্পূর্ণ বিশ্রাম এবং প্রচুর পরিমাণে লেবুর রস মিশ্রিত জল পান করিবেন। এক কাপ জলে পনের গ্রেণ "পটাশিয়াম সাইট্রেট্" (Potassium Citrate) মিশাইয়া দৈনিক তিনবার সেবন করিবেন। উষ্ণ জলে স্নান দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। দৈনিক তিনবার দশ গ্রেণ করিয়া "ইউরো-ট্রোপিন" (Urotropin) গ্রহণ করিবেন। অত্যধিক যন্ত্রণা হইলে কোন হাস-পাতালে যাইয়া অস্ত্রচিকিৎসক দ্বারা পাথরগুলি বাহির করিয়া ফেলা উচিত।

কামলা বা নেবা বা পাণ্ডুরোগ

যকৃৎ ও পিত্তকোষের পীড়াবশতঃ গায়ের চামড়া এবং চক্ষুর শ্বেতভাগ হলদে হইয়া যায়।

কামলার সঙ্গে জ্বর থাকিলে, রোগীর বিছানায় শুইয়া থাকা উচিত পথ্য-স্বরূপ "এগ্ নগ্" (Egg nog) এবং ভাতের মণ্ড (Rice-gruel) দেওয়া যাইতে পারে। লেবুর রস মিশ্রিত জল পান করিবেন। প্রতিদিন এক মাত্রা "এপ-সম্ সল্ট" খাইবেন। দৈনিক দুইবার যকৃতেই উপরে বিশ মিনিট ধরিয়া গরম সেঁক দিবেন।

অস্থি গ্রন্থিতে এবং পিঠে বেদনা

এই উভয় প্রকার বেদনার উপশম করিতে গরম সেঁক অতিশয় উপকারী। রবারের থলিতে গরম জল পূর্ণ করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে; অথবা গরম সেঁক দেওয়া যাইতে পারে। সন্ধিস্থলে চামড়ার উপরে "অয়েল অব্ উইণ্টার-গ্রিণ" মালিশ করিলে অনেক উপকার হইবে। উক্ত তৈলে একখানি কাপড় ভিজাইয়া বেদনাযুক্ত স্থানে রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বস্ত্রখণ্ডের উপরে তৈল সিক্ত একখানি মসৃণ পাতলা কাগজ রাখিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবেন।

বাতের নিমিত্ত অস্থি গ্রন্থিতে বেদনা হইলে, ১৫ গ্রেণ "সোডিয়াম স্যালি-সিলেট্" (Sodium Salicylate) এবং ৩০ গ্রেণ "সোডা বাইকার্বনেট্" অর্দ্ধ গেলাস জলে মিশাইয়া প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবেন।

মৃগীরোগ

মৃগীরোগের আক্ষেপ এরূপ গুরুতর হয় যে রোগী পড়িয়া যায়, এবং মুখে ফেনা উঠিতে থাকে। কোন কোন সময়ে আক্ষেপ তত গুরুতর হয় না। সাধারণতঃ রোগীর কথাবার্ত্তা বলিবার সময় বা আহার করিবার সময় সহসা অর্দ্ধ মিনিট বা ততোধিক কাল অজ্ঞান হইয়া থাকে। এই প্রকার সামান্য ফিট্ বা আক্ষেপ অনেকাংশে মূর্চ্ছার মত (৪৭শ অধ্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য)।

প্রতিদিন নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। রোগী কিছুতেই মদ্য, মাংস ও তামাক ব্যবহার করিবেন না। যতদিন চিকিৎসক পাওয়া না যায় ততদিন বয়স্ক রোগীকে দৈনিক ৬০ গ্রেণ "সোডিয়াম্ ব্রোমাইড" (Sodium Bromide) খাইতে দিবেন। লেবুর রস এবং সামান্য চিনি মিশ্রিত জল প্রচুর পরিমাণে পান করিবেন।

কঠিন পদার্থ গিলিয়া ফেলা

বালকবালিকাগণ অনেক সময়ে আলপিন্, বোতাম, সিকি, দু-আনী প্রভৃতি গিলিয়া ফেলিয়া মাতা পিতার ভীতি জন্মাইয়া দেয়।

সাধারণতঃ ঐ সমুদয় পদার্থ মলের সঙ্গেই বাহির হইয়া যায়। কোন প্রকার জোলাপ না দিয়া, শিশুদিগকে রুটী, মিঠা আলু অথবা অপর কোন প্রকার মোটা আঁশ বা দানাদার বিশিষ্ট কোন শাকসব্জি খাইতে দিবেন, তাহাতে অন্ত্রে পিণ্ড পাকাইয়া মলের সহিত উহা বাহির হইয়া যাইবে।

অর্ব্বুদ বা টিউমার (Tumours)

মাথায়, ঘাড়ে, পিঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কোমল টিউমার অনেক সময়ে উঠিয়া থাকে, কিন্তু তাহা মোটেই বিপজ্জনক নহে। কিন্তু ওষ্ঠের উপরে স্তনে বা চিবুকে টিউমার হইলে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে, এবং যত সত্বর সম্ভব চিকিৎসক ডাকা প্রয়োজন; কারণ উহা বড়ই বিপজ্জনক। উক্ত টিউমার ক্যান্সার্ বা সারকোমা (Sarcoma) হইতে পারে, এবং সত্বর অস্ত্রোপচার করাই উহার একমাত্র চিকিৎসা।

৪৭শ অধ্যায়

রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা—বিশোধন

এই গ্রন্থের ১৯শ, ২০শ এবং অন্যান্য অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে রোগের প্রতীকারের জন্য ঔষধই সর্ব্বপ্রধান বস্তু নহে; বিশ্রাম, উত্তম খাদ্য, শুশ্রূষা এবং রোগ জীবাণু ও তদ্দ্বারা উৎপন্ন বিষ বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে শোণিতকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করাই সর্ব্বথা বিধেয়।

বিশ্রাম

সকল প্রকার কঠিন ব্যাধিতেই রোগীর দিন রাত্রি বিছানায় শুইয়া থাকা উচিত। অনেক লোক একটু ভাল হইতে আরম্ভ করিলেই, একেবারে শয্যা-ত্যাগ করিয়া চারিদিকে ভ্রমণ, কাজ কর্ম্ম এবং সাধারণ খাদ্য দ্রব্যাদি আহার করিতে থাকেন, এই কারণে তাহারা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন না।

কেহ পীড়িত হইলে, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের ভিড় যত কম হইবে, তত শীঘ্র সে আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে। উৎকৃষ্ট হাসপাতালে রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য খুব অল্প লোককেই অনুমতি দেওয়া হইয়া থাকে। সাক্ষাৎকারীদের দ্বারা উপকার অপেক্ষা অধিক অপকার হইয়া থাকে। তাহারা আসিয়া রোগীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে এবং তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তোলে। কখনও বা তাহারা রোগীদের সম্মুখে এরূপ খাদ্য ও ঔষধাদি উপস্থিত করে যাহা তাহাদের পক্ষে আদৌ উপকারী নহে। তদ্ভিন্ন পীড়িত ব্যক্তিদিগের দর্শকগণ রোগ বিস্তারে সহায়তা করিয়াও বিষম অনিষ্ট সাধন করে। অধিকাংশ ব্যাধিই সংক্রামক, তাই রুগ্ন ব্যক্তির করমর্দ্দন, শয্যাপার্শ্বে উপবেশন, রোগীর কক্ষের জিনিষ পত্রাদি স্পর্শ প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা তাহাদের হস্তে ও বস্ত্রাদিতে রোগ জীবাণু বহন করিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যায় এবং অন্যান্য লোক এইরূপে ঐ সমুদয় রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত রোগীর গৃহে শুশ্রূষাকারী দুই তিন জন লোক ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। শুশ্রূষাকারীদিগকে সাহায্য করিবার আবশ্যক হইলে, অপর কোন কোন ব্যক্তিকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

পীড়িত ব্যক্তির পবিত্র ও নির্ম্মল বায়ুর বিশেষ প্রয়োজন; অনেক সময়ে রোগীর গৃহে দর্শকগণ চুরুট টানিয়া বা অন্যরূপে ধূমপান করিয়া রোগীর কক্ষের বায়ু কলুষিত করিয়া ফেলেন।

প্রত্যেক রুগ্ন ব্যক্তিরই যথেষ্ট নিদ্রা আবশ্যক। কেহ যেন রোগীর গৃহে আলো জ্বালিয়া না রাখেন, বা বসিয়া না থাকেন; রোগীর নিদ্রার যাহাতে কোন ব্যাঘাত না হয়, এ জন্য সত্বর প্রদীপ নিবাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

পথ্য

রোগীর উপযুক্ত পথ্য নির্ব্বাচন, শুশ্রূষার একটী প্রধান অঙ্গ।

কোন কোন রোগে, পীড়িত ব্যক্তি সাধারণ খাদ্যই ভোজন করিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যাধিতেই, বিশেষতঃ পাকস্থলী ও অন্ত্রের ব্যাধিসমূহে বিশেষ খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইবে। যেরূপ পীড়াই হউক না কেন, রোগীকে প্রচুর পরিমাণে জলপান করিতে দিবেন। প্রথমে জল ভালরূপে ফুটাইয়া লইয়া পরে শীতল করিবেন। পাকা টাটকা ফল এবং ভালরূপে নিংড়ানো ফলের রস রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

অল্প সিদ্ধ ডিম, ডিমের পোচ, অথবা ডিমের জেলি বেশ উত্তম পথ্য; এই সমুদয় প্রস্তুত করিবার সময়ে কখনও অধিকক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিবেন না বা ভাজিবেন না অল্প পরিমাণ ফুটন্ত জল লইয়া, তন্মধ্যে ডিম ভাঙ্গিয়া দিয়া ডিমের পোচ (Poach) প্রস্তুত করা হয়। ডিমের স্বচ্ছ অংশ একেবারে সাদা হইয়া গেলে, গরম জল হইতে ডিমটী তুলিয়া লউন। ডিমের জেলি প্রস্তুত করিতে হইলে একটী ছোট পাত্রে দুই পাইট (প্রায় তিন পোয়া) পরিমাণ জল লইয়া টগ্ বগ্ করিয়া ফুটাইয়া লইবেন। এইরূপে জল ফুটিয়া উঠিলে, উনানের উপর হইতে পাত্রটী নীচে নামাইয়া জলের মধ্যে দুইটী ডিম ছাড়িয়া দিবেন। ডিম দুইটী জলের মধ্যে চারি পাঁচ মিনিট থাকিলেই উহার অভ্যন্তরভাগ পাতলা জেলির মত হইবে। এই প্রকারে প্রস্তুত ডিমের জেলি সহজেই হজম হইয়া থাকে। "এগ্ নগ্"ও সহজে হজম করা যায়। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে ডিমের শ্বেতাংশ লইয়া খুব ফেটাইতে থাকুন; অপর একটী পাত্রে ডিমের কুসুম ঐরূপে ফেটাইয়া লউন; তারপর দুইটী একত্র করিয়া একটু চিনি এবং দুই বা এক চামচে আনারসের রস মিশ্রিত করুন; অবশেষে অর্দ্ধ গেলাস দুধ বা ফলের রসে ডিম দুইটী বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া লউন।

কোন কোন স্থলে আমাশয় ও উদরাময় অথবা পাকস্থলী ও অন্ত্রসমূহের কোন কোন কঠিন ব্যাধিতে রোগীকে ডিমের জল (Egg water) ব্যতীত অপর কোন পথ্য দেওয়া সম্ভব হয় না। জল ফুটাইয়া পরে ঠাণ্ডা করিয়া লইয়া এক গেলাস জলে দুইটী ডিমের শ্বেতাংশ বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া লইবেন। তারপর একটু সুস্বাদু করিবার জন্য উহাতে সামান্য লেবু বা কমলা লেবুর রস দেওয়া যাইতে পারে।

কাঞ্জি বা ভাতের মণ্ড, অথবা গমের ময়দার মণ্ড পীড়িত ব্যক্তিদিগের—শিশু যুবক সকলেরই পক্ষে বেশ উত্তম পথ্য। সিদ্ধ করিয়া টাট্‌কা দুধ, তন্দুরে সেঁকিয়া পাক করা আলু, অধিকক্ষণ পাক করা ফল, আরারুটের মণ্ড, পাতলা রুটীর টোষ্ট প্রভৃতি পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে উপকারী।

পেঁয়াজ রসুন জাতীয় শাকসব্‌জি এবং পিঠা ও অন্যান্য নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্য রোগীর একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ব্যঞ্জন, মরিচ, আদা এবং অধিক লবণ যুক্ত খাদ্যাদিও রোগীকে ত্যাগ করিতে হইবে।

রোগীর পথ্য যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে প্রস্তুত হয়, এবং রোগীর পক্ষে হজম করা সহজ এবং ক্ষুধাবৃদ্ধিকর হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

রোগীর গৃহ

কোন কঠিন ব্যাধি হইলে রোগীর নিমিত্ত পৃথক্ কক্ষ থাকা আবশ্যক। এই কক্ষে যেন প্রচুর আলোক প্রবেশ করিতে পারে এবং দুইটী বা ততোধিক জানালা থাকে। কলেরা, বসন্ত, ডিফ্‌থিরিয়া, স্কার্লেট ফিভার প্রভৃতি রোগে, রোগীকে এরূপ গৃহে রাখিতে হইবে, যেখানে অন্য কেহ বাস করে না; কারণ, ঐ সমুদয় ব্যাধি স্পর্শাক্রামক, সুতরাং অপর যাহারা রোগীর সংস্পর্শে আসিবে, তাহাদেরও উক্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

রোগীর স্নান

অনেকেরই ধারণা এই যে, পীড়িত ব্যক্তির স্নান করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ইহা অতি বিষম ভুল, কারণ সুস্থ ব্যক্তির নিয়মিত স্নান করা অপেক্ষা, অসুস্থ ব্যক্তির নিয়মিত স্নান করা অধিকতর প্রয়োজন। শরীরের এক অঙ্গ ধৌত করিয়া খুব তাড়াতাড়ি সেই অঙ্গ মুছিয়া ফেলিলে, ঠাণ্ডা লাগিবার কোন আশঙ্কা থাকে না। প্রায় সকল ব্যাধিতেই স্নান যে কোন ঔষধের ন্যায় উপকারী।

কিরূপে তাপমাত্রা গ্রহণ করিতে হয়

কাহারও শরীরে জ্বর আছে কিনা, শুধু গায়ে হাত দিয়া সর্বদা তাহা অনুভব করা যায় না। তাই কাহারও জ্বর হইয়াছে কিনা সঠিক বুঝিবার জন্য, জ্বর দেখিবার থার্মোমিটার ব্যবহার করা আবশ্যক। থার্মোমিটারে ৯০° হইতে ১১০° ডিগ্রি (ফারেন্‌হাইট্) পর্যন্ত বিভিন্ন অঙ্ক ও দাগ থাকে। ৯৮॥০ ডিগ্রির স্থানে একটা তীরের মত দাগ দেখা যায়; সুস্থ ব্যক্তির ইহাই স্বাভাবিক উত্তাপ। থার্মোমিটারের পারা ১০০° ডিগ্রি বা তাহারও উপরে চলিয়া গেলে বুঝিতে হইবে, রোগীর জ্বর আছে। ১০৩° ডিগ্রি তাপে পরিমিত জ্বর বুঝায়। অধিক জ্বরে ১০৪° বা ১০৫° ডিগ্রি তাপ হইয়া থাকে।
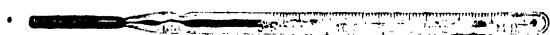
থার্মোমিটার ব্যবহার করিবার কালে উহার উপরের দিকে জোরে ধরিবেন, এবং যে দিকে পারা থাকে সেই দিকটা নিম্নে রাখিবেন, তারপর চাবুক মারিবার ধরণে তাড়াতাড়ি কয়েকবার উহা ঝাঁকুনি দিবেন। থার্মোমিটারে একেবারে নীচের দিকে পারদ নামাইয়া দিবার জন্য, ঐরূপ করিতে হইবে। তখন যে অংশে পারা জমা হইয়া রহিল সেই অংশ রোগীর জিহ্বার নীচে রাখিয়া দিবেন। এই সময়ে রোগীকে, দাঁতের পংক্তি বন্ধ না করিয়া জোরে ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ করিতে এবং নাসিকা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করিতে বলিবেন। তিন চারি মিনিট ঐরূপ রাখিবার পর থার্মোমিটার উঠাইয়া লইবেন।

বগলের তল ভালরূপে মুছিয়া লইয়া, সেখানে থার্মোমিটার দেওয়া যাইতে পারে। তখন বাহুখানি একেবারে শরীরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে।

ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে, ছোট শিশুদিগকে থার্মোমিটার মলদ্বারে দেওয়া যাইতে পারে, দুই ইঞ্চি আন্দাজ অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিলে জ্বরের তাপ বুঝিতে পারা যাইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে ইহা বগলেও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

থার্মোমিটার ব্যবহারের পূর্বে ও পরে ঠাণ্ডা জল ও সাবান দ্বারা উহা ধুইয়া লইবেন। জল ও সাবানে ধুইবার পরে পুনরায় উহা "এ্যাল্‌কোহল্"

অথবা "লাইসল" বা "কার্ব্বলিক্ এ্যাসিড সলিউশন্" দ্বারা ধুইয়া লইতে হইবে; এক গেলাস জলে উহাদের যে কোন একটীর ছোট এক চামচে মিশ্রিত করিয়া সলিউশন প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

নাড়ীর স্পন্দন

বিভিন্ন বয়সে নিম্নলিখিত মত নাড়ীর স্পন্দন হইয়া থাকে:—

জন্মকালে	প্রতি মিনিটে	১৩০—১৫০ বার
১ হইতে ২ বৎসর বয়সে	... ...	১১০—১২০ ...
২ ... ৪	... ...	৯০—১১০ ...
৬ ... ১০	... ...	৯০—১০০ ...
১০ ... ১৪	... ...	৮০— ৯০ ...
বয়স্কদিগের	... ...	৭২ ...

নাড়ীর স্পন্দন গণনা করিতে রোগীর কব্জির সম্মুখভাগে, প্রান্তভাগ হইতে অৰ্দ্ধ ইঞ্চি দূরে অঙ্গুষ্ঠের গোড়া হইতে এক ইঞ্চি নীচে, তিনটী অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্থাপন করিবেন।

শ্বাস প্রশ্বাস

বিভিন্ন বয়সে নিম্নলিখিত মত শ্বাস প্রশ্বাস হইয়া থাকে:—

জন্মকালে	প্রতি মিনিটে	৪০ বার
২ বৎসর বয়সে	... ...	২৮ বার
৪	... ...	২৫ ...
১০	... ...	২০ ...
বয়স্কদিগের	... ...	১৬—১৮ ...

শ্বাস প্রশ্বাস গণিতে হইলে, একটী পকেট ঘড়ি এক হাতে ধরিয়া, এবং অপর হাতখানি বুকের উপর রাখিয়া, মিনিটে কতবার বক্ষ প্রসারিত হইবে, গণিয়া লইবেন।

বিশোধন (Disinfection)

কলেরা ও টাইফয়েড জ্বরের অধ্যায়ে, রোগীর মলমূত্র বিশোধিত করিবার উপযুক্ত উপায় লিখিত হইয়াছে।

একেবারে পুড়াইয়া ফেলা, অথবা গরম জলে সিদ্ধ করা বিশোধিত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। রোগীর মলমূত্রাদি, কলুষিত কাগজ ও বস্ত্রখণ্ড, অবশ্যই পুড়াইয়া ফেলিবেন।

বিছানার বস্ত্রাদি ও অন্যান্য কাপড়-চোপড়ের অধিকাংশ, যাহা সিদ্ধ করিলে ক্ষতি হয় না, অপর কাহারও ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লইবেন।

তেলের টিনে রোগীর মলমূত্রাদি ঢালিয়া রাখিবেন, এবং ফেলিয়া দিবার পূর্ব্বে আগুনে ফুটাইয়া লইবেন। খড় বা আবর্জ্জনা ইহার সহিত মিশাইয়া পুড়াইয়া দেওয়া ভাল।

রোগজীবাণু অধিকক্ষণ রৌদ্রে থাকিলে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য রোগীর গৃহ যেন ভালরূপে আলোকিত হয়, এবং রোগীর বিছানা ও বস্ত্রাদি যেন প্রায় প্রতিদিনই কয়েক ঘণ্টা রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়।

"ফরম্যাল্‌ডিহাইড্‌" (Formaldehyde) "ফরম্যালিন্‌" (Formalin) যে গৃহ ভালরূপে রুদ্ধ করা যায় সেই গৃহের পক্ষে অতি চমৎকার বিশোধক। যে সমুদয় পোষাক ও জিনিষ পত্র ধৌত বা সিদ্ধ করা যায় না, সেই সমুদয় এইরূপ একটী বাক্সে রাখিয়া দিউন, যাহা ভালরূপে বন্ধ করা যাইতে পারে। বাক্সের নীচে এক ভাঁজ কাপড় রাখিয়া তদুপরি ছোট এক চাম্‌চে "ফরম্যালিন্‌" ছড়াইয়া দিউন; তারপর উহার উপরে আরও এক ভাঁজ রাখিয়া আর এক চাম্‌চে "ফরম্যালিন্‌" ছড়াইয়া দিবেন। অবশেষে বাক্সটী বেশ করিয়া আটকাইয়া দিবেন, এবং ২৪ ঘণ্টা একেবারে বন্ধ রাখিবেন।

"বাইক্লোরাইড অব্‌ মার্কারী" বিশোধক ঔষধরূপে যথেষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে। উহা অতি বিষাক্ত বলিয়া সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ উহা পিলের আকারে পাওয়া যায়। দুই গেলাস জলে উহার দুইটী পিল মিশাইলে, প্রতি হাজার ভাগ জলে, একভাগ "ক্লোরাইড্‌ অব্‌ মার্কারী" রহিল। রোগীকে স্পর্শ করিবার পরে, হস্তাদি ধৌত করিবার জন্য উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। রোগীর ব্যবহৃত তোয়ালে বা রুমাল প্রভৃতি অর্দ্ধ ঘণ্টা ইহাতে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ধুইয়া ফেলিবেন।

১০০ ভাগ জলে ২ হইতে ৫ ভাগ "কার্ব্বলিক্‌ এ্যাসিড" মিশাইয়া বিশোধক পদার্থরূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১০০ ভাগ জলে ১ ভাগ "লাইসল্‌" মিশাইয়া লইলে তদ্দ্বারা উত্তম বিশোধক ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। প্রতি গেলাস জলের সহিত, ছোট চায়ের চামচের এক চাম্‌চে "লাইসল্‌" মিশাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

চূণ অতি প্রয়োজনীয় বিশোধক পদার্থ। মাটিতে এবং গৃহের চতুর্দ্দিকে উহা ছড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। গর্ত্তের মধ্যে মলমূত্রাদি নিক্ষেপ করিয়া তাহা ঢাকিবার জন্য উহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

"সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ কপার্‌" আর একটী বিশোধক পদার্থ। চারি গেলাস জলে উহার এক চাম্‌চে মিশাইয়া লইয়া ব্যবহার করিবেন।

যে গৃহে রুগ্ন ব্যক্তি ছিল, সেই গৃহ বিশোধিত করিবার জন্য, গৃহের দেওয়াল ও অন্যান্য আসবাব জল ও সাবান দ্বারা ভালরূপে ধুইয়া ফেলিবেন, "কার্ব্বলিক এ্যাসিড্‌" ও "বাইক্লোরাইড্‌ অব্‌ মার্কারী" পাওয়া গেলে উল্লিখিত উপায়ে সলিউশন্‌ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা গৃহের প্রাচীর প্রভৃতি মার্জ্জিত করিয়া দিবেন।

টীকা—সন্ন্যাস রোগ:—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অনেক সময়ে মাতাপিতা হইতে সন্তান এই রোগ প্রাপ্ত হয়। সুরা, আত্মমত্ততা, মস্তিষ্কে আঘাত, দৃষ্টি-শক্তির অতি ব্যবহার, কৃমি, এ্যাডিনয়েড্‌স্‌ প্রভৃতি হইতে দুর্ব্বল স্নায়ু বিশিষ্ট ব্যক্তির এই রোগ হইতে পারে।

সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত হইলে রোগীকে আঘাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে; কাপড়-চোপড় ঢিলা করিয়া দিবেন, এবং জিহ্বা কাটিয়া না যায়, এই জন্য দাঁত দুই পাটীর মাঝে, এক টুক্‌রা কাঠ, বা একটী ছিপি দিতে হইবে। এই রোগের আক্রমণের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। নিয়মিত সময় অন্তর অন্তর অল্প পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে। মাংস, চা, কাফি, গুরুপাক পিষ্টকাদি খাদ্য কিছুতেই খাইবেন না। খাদ্যের সহিত যত কম সম্ভব লবণ খাইবেন। রোগী প্রধানতঃ ফল, শস্য, টোষ্ট রুটি, দুধ শাকসব্‌জি খাইবেন। ডিম, মটর শুঁটী, বাদাম, পনীর প্রভৃতি খাদ্য অল্প পরিমাণ গ্রহণ করিবেন।

সাধারণ খাদ্য দ্বারা বা বিরোচক ঔষধ খাইয়া, বা ডুস্‌ লইয়া, যেরূপেই হউক কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে হইবে। প্রতিক্রিয়া কারক প্রদাহ উৎপন্ন করে, এইরূপ সকল বিষয়ের প্রতীকার করিতে হইবে, যেমন—দৃষ্টি শক্তির এরূপ ব্যবহার যাহাতে চক্ষুতে যন্ত্রণা হয়, নাসারোগ, স্ফীততালুগ্রন্থি, শিশ্নের অগ্রত্বক্‌ লাগিয়া যাওয়া, কৃমি।

প্রায়ই গরম জলে স্নান করিয়া ত্বক্‌ সজীব রাখিতে হইবে। রোগী বাহিরের মুক্ত বায়ুতে প্রচুর ব্যায়াম করিবেন।

—প্রকাশক

৪৮শ অধ্যায়

মাছি নরহত্যা করে

মাছি অতিশয় ক্ষুদ্র প্রাণী; উহা আবার কিরূপে নরহত্যা করিতে পারে? একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতেছে। একদিন একটী ছোট বালক তাহার পিতার ঔষধের দোকানে খেলা করিতে করিতে হঠাৎ একটা সাদা ঔষধের পুরিয়া দেখিতে পাইল। বালকটী উহা লইয়া রাস্তায় গিয়া উহা একটা পাতকুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিল। ঐ সাদা ঔষধটী ভয়ানক উগ্র বিষ ছিল; উক্ত পাতকুয়ার জল পাড়ার বহু লোকে ব্যবহার করিত; ফলে ঐক্ষণে বিষাক্ত জল পান করিয়া বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ছোট বালকটী এইরূপে জলে বিষ মিশাইয়া দিয়া বহু লোকের প্রাণ সংহার করিল। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই দেখিতে পাওয়া গেল যে, পরোক্ষভাবে হইলেও কেবল ছোট একটী বালকদ্বারা বহু লোকের মৃত্যু সাধিত হইতে পারে, অথচ কেহ তাহাকে সন্দেহ করে না। মাছিও এইরূপে বিষ বহন করিয়া, মানুষের প্রাণ সংহার করে। যদিও প্রতি বৎসর ভারতের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এইরূপে মাছি দ্বারা নিহত হইতেছে, তথাপি কেহই মাছিকে নরঘাতক বলিয়া সন্দেহ করেন না। অনেকেই মাছিকে নিরীহ জীব বলিয়া মনে করেন, এবং শরীরের উপরে বসিয়া সুড়সুড়ি দেওয়া ব্যতীত আর কোন সাংঘাতিক কাজ যে ইহারা করিতে পারে এরূপ ধারণাই করেন না।

মাছির সাংঘাতিক কার্য্যাবলী বুঝিবার পূর্ব্বে, উহার জীবনের ইতিহাস ও ক্রিয়াকলাপ অবগত হওয়া আবশ্যক।

স্ত্রী-জাতীয় মাছি ডিম পাড়ে এবং ডিমগুলি শীঘ্রই ডিম্বকীটে পরিণত হয়। পরে ডিম্বকীটগুলি পূর্ণ মাছির আকারে রূপান্তরিত হয়। ডিম পাড়িবার পরে দশ হইতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে নূতন মাছিগুলি পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয়। একটী স্ত্রী জাতীয় মাছি একবারে অন্ততঃ ১২০টী ডিম্ব প্রসব করিবে, এবং দুই সপ্তাহ মধ্যে উহারা ১২০টী পূর্ণাবয়ব মাছি হইবে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, শুধু একটা মাছি দ্বারা কয়েক মাসের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মাছি উৎপন্ন হইতে পারে।

প্রধানতঃ ঘোড়ার মলের সারের মধ্যেই সাধারণ মাছিকুলের জন্মস্থান। এতদ্ব্যতীত মানুষের মলমূত্রে, পচা পদার্থে এবং সকল প্রকার আবর্জ্জনা-বহুল

স্থানে মাছি জন্মিয়া থাকে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যে স্থানে নোংরা জিনিষ সঞ্চিত হয়, সেই স্থানেই মাছি ডিম পাড়ে।

আবর্জ্জনায় মাছির জন্ম, আবর্জ্জনা খাইয়া মাছি জীবন ধারণ করে, এবং আবর্জ্জনাতে থাকিতেই মাছি ভালবাসে। মাছির দেহ ও পাগুলি ময়লা বহন করিবার বেশ উপযুক্ত, কারণ উহার দেহ ও ছয় খানি পা অসংখ্য লোমে আবৃত। মাছির ছয়খানি পায়ের প্রত্যেকটীর নিম্নভাগই গোলাকার ক্ষুদ্র গদির
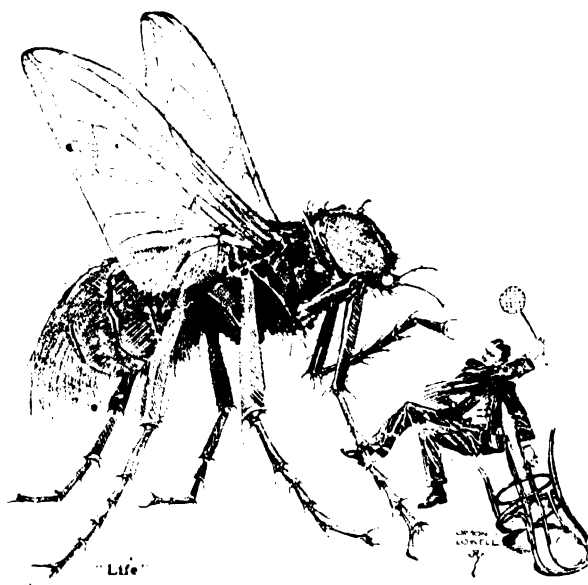
মাছি নরহত্যা করে

ন্যায়, উক্ত গদি আঠালো পদার্থ দ্বারা আবৃত। এই আঠালো পদার্থ না থাকিলে, মাছি কখনও ভিতরের দিকের ছাদে উল্টা হইয়া চলাফিরা করিতে পারিত না। মাছির শরীর ও পাগুলি লোমাবৃত এবং পদতল আঠালো পদার্থে সিক্ত বলিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, যেখানে উহা বসিবে সেখান হইতেই উহার শরীর ও পাগুলির সঙ্গে কিছু না কিছু আঁটিয়া যাইবে। তাই মানুষের বিষ্ঠার উপরে মাছি বসিলে বিষ্ঠার কিয়দংশ নিশ্চয়ই উহার শরীরে, পায়ের তলায়, ও পাগুলিতে লাগিয়া যাইবে। পরে যখন উহা আবার উড়িয়া গিয়া ফল শাকসব্জি বা অপর কোন খাদ্যদ্রব্যের উপরে বসিবে, তখন পূর্ব্বের আহরিত কিছু মল তদুপরি

রাখিয়া আসিবে। উদরাময়, কলেরা, বা আমাশয় রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তির মলের উপরে মাছি বসিয়া পরে পুনরায় অপরের খাদ্যদ্রব্যে বসিলে, মল মধ্যস্থ রোগ জীবাণু খাদ্যদ্রব্যে লাগিয়া যাইবে; সুতরাং যে ব্যক্তি উহা ভোজন করিবে তাহার শরীরে উল্লিখিত কোন রোগ হইবার খুবই সম্ভাবনা।
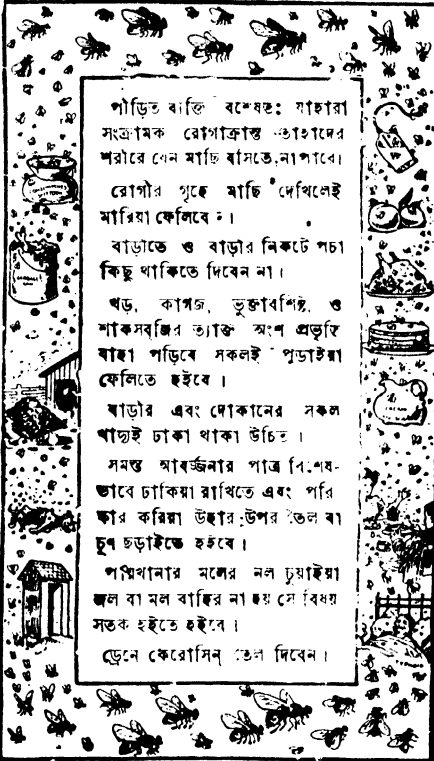
মাছির খাইবার প্রণালী। কেহ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে কোন শক্ত জিনিষ খাইতে হইলে, মাছি প্রথমে শক্ত খাদ্য তরল করিয়া লইবার জন্য, উহার পাকস্থলী হইতে কিছু তরল পদার্থ বাহির করিয়া লয়। মাছির পাকস্থলীতে নানাপ্রকার কলুষিত পদার্থ থাকে, এবং পাকস্থলী হইতে নির্গত তরল পদার্থের সঙ্গে তাহাই বাহির হয়। এইরূপে মাছির পক্ষে নানাপ্রকার ব্যাধি বিস্তার করা সম্ভব।

চক্ষু উঠিলে তাহাতে, অথবা পূঁজ নির্গত হইতেছে এইরূপ কোন ক্ষতের উপরে সর্ব্বদা মাছি বসিয়া থাকে। কতকটা পূঁজ খাইয়া, এবং কতকটা উহার পায়ে, পায়ের তলায় ও গায়ে মাখিয়া অন্যত্র উড়িয়া যায়, এবং অপর কোন সুস্থ ব্যক্তির বা বালকবালিকার চক্ষুর বা চামড়ার উপরে বসে। চক্ষু উঠা এবং নানাবিধ চক্ষুরোগ এইরূপে বিস্তৃত হইবার ইহা একটী সাধারণ কারণ।

মাছি দ্বারা নানাপ্রকার রোগ বিস্তৃত হয়, তন্মধ্যে কয়েকটীর নাম এই— টাইফয়েড জ্বর, কলেরা, উদরাময়, আমাশয়, কণ্ঠনালীতে ঘা, হাম, বসন্ত, চক্ষু উঠা, প্লেগ, ফোড়া ক্ষত ও ক্রমি রোগ।

মাছি দূর করিবার উপায়

মাছি দ্বারা যে অপকার হইয়া থাকে, তাহা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, যাহাতে মাছির সংখ্যা বাড়িতে না পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মাছির সংখ্যা বাড়িবার পর তাহা নষ্ট করা অপেক্ষা সংখ্যা বাড়িতে না দেওয়াই অনেক সহজ। ঘোড়ার মলের সার এবং আবর্জনাস্তূপ মাছি বৃদ্ধির স্থান, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সার প্রস্তুত করিবার জন্য ঘোড়ার মল কোন বাক্সের মধ্যে পূরিয়া এরূপে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে তদুপরি মাছি বসিতে না পারে। উক্ত সার সপ্তাহে দুইবার ক্ষেত্রে নিয়া ছড়াইয়া দিবেন। অল্প পরিমাণ সার জমা হইয়া থাকিলে, তদুপরি সপ্তাহে দুইবার কেরোসিন্ বা "ক্লোরাইড্ অব্ লাইম" ছড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

আবর্জনা রাখিবার নিমিত্ত ঢাক্‌নিদার পাত্র ব্যবহার করিবেন। কোন পথের উপরে, প্রাঙ্গণে বা বাড়ীর নিকটস্থ কোন রাস্তায় কখনও কোন আবর্জনা বা কোন প্রকার পচা জিনিষ ফেলিয়া রাখিবেন না।

মাছি হইতে সতর্ক হইবার নিমিত্ত যে কয়েকটি বিষয় উপরে লিখিত হইল, প্রত্যেক লোকের তাহা অবশ্যই পালন করিতে হইবে; এই মর্ম্মে সুশাসিত প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে আইন্ হওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ করা হইলে ব্যাধি ও মৃত্যু অনেকাংশে কমিয়া যাইবে।

ঘরের দরজা ও জানালায় তারের জালের ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যেক পরিবারই গৃহ হইতে মাছি তাড়াইবার এবং অধিকাংশ ব্যাধির হাত এড়াইবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। ঘরের সমুদয় দরজা এবং জানালায় এইরূপে তারের জাল দেওয়া সম্ভব না হইলে, অন্ততঃ রান্নাঘরে এবং খাইবার ঘরে ঐরূপ জালের ব্যবস্থা অবশ্যই করিবেন।

৪৯শ অধ্যায়

সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত পরিচিত হও

ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সমগ্র বিশ্বের একমাত্র অধিপতি; তিনি আত্মিক ব্যক্তি; কোন কোন লোক মৃত মনুষ্য ও মন্দাত্মাদিগকেও আত্মা বলিয়া মনে করে, এই কারণে ঈশ্বরকে সত্য আত্মা বলা হয়। স্বর্গ ও পৃথিবী জুড়িয়া একমাত্র তাঁহারই শাসন, তাই তিনি প্রভু ও রাজা। পার্থিব রাজা মহারাজাদের বহু উর্দ্ধে তাঁহার স্থান বলিয়া তাঁহাকে প্রভুদের প্রভু রাজাদের রাজা বলা হয়। তিনি সমুদয় জীবন্ত প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তাই তিনি সকলের পিতা; কিন্তু পৃথিবীর সম্পর্কে সকল মনুষ্যের পিতা আছে বলিয়া, সেই পিতা হইতে তাঁহাকে বৈশিষ্ট প্রদান করিবার জন্য, তাঁহাকে স্বর্গস্থ পিতা বলা হইয়া থাকে।

সত্য ঈশ্বর মাত্র এক জন। কোন দেশে দুইজন একচ্ছত্র সম্রাট থাকিতে পারে না। পার্থিব রাজ্যের একখানি সিংহাসনে যদি দুইজন নৃপতির স্থান না হয়, তবে এই বিরাট বিশ্বের মহাসিংহাসনে যে একাধিক জন সর্ব্বশক্তিমান সম্রাটের সম্ভব হইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য।

ঈশ্বর সনাতন, সয়ম্ভু। তিনি অনাদি, অনন্ত।

ঈশ্বর কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর এই যে, স্বর্গে তাঁহার সিংহাসন বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মা দ্বারা তিনি সর্ব্বব্যাপী। স্বর্গে তাঁহার সিংহাসন বলিয়া মানুষের কখনও সেই স্বর্গের উপাসনা করা উচিত নহে, কারণ উহা কেবল তাঁহার সিংহাসন থাকিবার স্থান।

ঈশ্বরের শক্তি অসীম। কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিতে হইলে মানুষের দ্রব্য ও যন্ত্রাদির প্রয়োজন; কিন্তু এত বড় অসীম জগৎ সৃষ্টি করিতে ঈশ্বরের কিছুই আবশ্যক হয় নাই। তাঁহার শব্দ উচ্চারণে আদেশ ও ইচ্ছা মাত্রই আকাশ ও পৃথিবী গড়িয়া উঠিল। বলবান লোকেরা কষ্টে-সৃষ্টে হয়তো দুই মণ ভারী কোন জিনিষ উত্তোলন করিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর জীব পরিপূর্ণ এই বিরাট পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি সঞ্চালন ও ধারণ করিতেছেন। সেই সৃষ্টি কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দিবারাত্র এই কার্য্য করিতেছেন।

ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তুগুলি দ্বারা তাঁহার প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বিচরণকারী চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, অসংখ্য প্রকারের বিচিত্র পত্র পরিপূর্ণ

বিভিন্ন উদ্ভিদরাজি, সুন্দর পুষ্প ও সুরসাল ফলসম্ভার—মানবজাতির খাদ্য ও পরিচ্ছদের নিমিত্ত উপযোগী বিভিন্ন বস্তুনিচয়, সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই গ্রন্থের ৩য়, ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে এবং অন্যান্য স্থলে, মানবদেহের অপূর্ব্ব গঠন প্রণালী এবং দেহের বিভিন্ন যন্ত্রাদির আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের প্রজ্ঞার আরও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঈশ্বর চক্ষু, কর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ তাঁহার নিজের যদি দর্শন ও শ্রবণ করিবার শক্তি না থাকে, তবে বড়ই আশ্চর্য্যের কথা হয়। তিনি আমাদের প্রত্যেক কার্য্য দেখেন এবং প্রত্যেক বাক্য শ্রবণ করেন। আমাদের অন্তরের নিগূঢ় চিন্তারাশিও তাঁহার নিকটে অজ্ঞাত নহে।

ঈশ্বর সমুদয় জীবন্ত প্রাণীকে শুধু প্রাণ দান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। কিন্তু বাতাস, খাদ্য ও পানীয় দান করিয়া তিনি সেই প্রাণ সঞ্জীবিত রাখিতেছেন। ইহা দ্বারা সমুদয় সৃষ্ট জীবের নিমিত্ত তাঁহার যত্নের পরিচয় পাওয়া যায়।

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং মানবের সুখের নিমিত্ত তিনি যেরূপ আয়োজন করিয়াছেন, সেই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, তাঁহার গুণরাশি সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার ধারণা জন্মিবে। মানুষ সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে তিনি প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয় বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ মানুষের উপকারে আইসে এবং তাঁহার সুখ শান্তি বৃদ্ধি করে, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল। মানুষ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মানুষকে "আমি আমার গৌরবার্থে সৃষ্টি করিয়াছি।" মানুষ তাঁহার স্বর্গীয় পিতার প্রেম ও সেবা করিবে, এবং কার্য্যে ব্যবহারে তাঁহারই গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবে, মানুষ সৃষ্টির ইহাই উদ্দেশ্য।

আদিতে ঈশ্বর দুইটী মানুষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—একজন, পুরুষ, একজন নারী। তিনি তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেহ, গভীর বুদ্ধি এবং সর্ব্বোত্তম মনোবৃত্তি দান করিয়াছিলেন। এদন উদ্যান নামক সকল রকমে উৎকৃষ্ট ও সুন্দর একটী স্থানে তাঁহাদের আবাস ছিল। পৃথিবীতে তখন কোন মন্দ বিষয়, কোন ব্যাধি এবং কোনই যাতনা ছিল না। তাঁহারা যেন চিরসুখ ও চিরশান্তিতে জীবন যাপন করেন, ইহাই সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায় ছিল। শুধু ৩০। ৪০ বা ৮০ ৯০ বৎসর জীবন ধারণ করিয়া পরে ব্যাধির দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, এইরূপ জীবন তিনি তাঁহাদিগকে দেন নাই. যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাঁহারা জীবিত থাকেন, অর্থাৎ অনন্ত জীবন লাভ করেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা-ছিল।

মানুষ যাহাতে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে ভুলিয়া না যায়, এই জন্য ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টি তত্ত্বের স্মরণার্থক চিহ্নস্বরূপ বিশ্রামবারের অঙ্গীকার করিয়াছেন, ঈশ্বরই মানু-

যের সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহার চিহ্নস্বরূপ সকলকেই তিনি সপ্তম দিনটীকে (শনিবার) পবিত্র বিশ্রামবাররূপে পালন করিবার আদেশ দিয়েছেন। যাঁহারা সত্য ঈশ্বরের ভজনা করিতেছেন, তাঁহারা অবশ্যই তাঁহার এই বিধি পালন করিয়া চলিবেন: "তুমি বিশ্রামদিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও। ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য্য করিও; কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন; সে দিন তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্যা, কি তোমার দাস কি দাসী, কি তোমার পশু, কি তোমার পুরদ্বারের মধ্যবর্ত্তী বিদেশী, কেহ কোন কার্য্য করিও না; কেননা সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্ম্মাণ করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন; এই জন্য সদাপ্রভু বিশ্রাম দিনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও পবিত্র করিলেন।" এই বিধান মোটেই পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা হয় নাই, এখনও অটল রহিয়াছে এবং মানবজাতিকে জানাইতেছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি মানুষের মহান্ কর্ত্তব্যসমূহের মধ্যে ইহা একটী বিশেষ কর্ত্তব্য।

সৃষ্টিকর্ত্তার স্থাপিত ব্যবস্থার দ্বারা সমগ্র বিশ্ব শাসিত হইতেছে। কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; ভূমণ্ডলের পরিভ্রমণ এরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, সমুদয় দিবসগুলিই চব্বিশ ঘণ্টা ব্যাপী, এবং ঋতুসমূহ একটীর পর একটী সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থিত হইতেছে; গগনমণ্ডলের গ্রহ ও উপগ্রহরাজি নির্দ্দিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং নির্দ্দিষ্ট কালে প্রকাশিত ও লুক্কায়িত হইতেছে। আমাদের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও নির্দ্দিষ্ট বিধানে চালিত। ঈশ্বর এক নৈতিক ব্যবস্থা স্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার এবং অপর সকল মানুষের প্রতি মানুষের যাহা কিছু কর্ত্তব্য সমুদয় নিহিত রহিয়াছে। মানুষ এই নৈতিক ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছে এবং মন্দাত্মা শয়তান দ্বারা এতদূর বিপথে চালিত হইতেছে, যে সত্য ঈশ্বরের সেবা ও ভজনা ত্যাগ করিয়া কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমার পূজা আরম্ভ করিয়াছে, এবং পশু ও পক্ষী, বৃক্ষ ও পর্ব্বতের সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়াছে; তাহার ফলে বর্ত্তমান জগৎ নানাপ্রকার ক্লেশ ও যাতনার আগার হইয়াছে। মানুষ যখন ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট পথ ত্যাগ করিয়া, নিজের জীবন ও কল্যাণের পরিপন্থী কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করিতে লাগিল, তখন হইতেই তাহার ব্যাধি, যন্ত্রণা ও মৃত্যু আরম্ভ হইল।

পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাধিই পাপের পরিণাম ফল মাত্র। ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিলে, পৃথিবীতে কোন প্রকার ব্যাধিই প্রবেশ করিতে পারিত না। এমন কি এখনও জগতে এতপ্রকার ব্যাধি থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আত্মিক ও

শারীরিক বিষয় সম্পর্কীয় ঈশ্বরের ব্যবস্থাসমূহ পালন করে, সে ব্যক্তি অন্যান্য নরনারীর যত ব্যাধি হয় তন্মধ্যে বহু ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে। যদিও মানুষ পাপে লিপ্ত রহিয়াছে, তথাপি যাহারা তাঁহার সেবা করে, তাহাদিগকে তিনি বলিয়াছেন "তোমরা কি জান না যে, তোমরা ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন?" আমরা আমাদের দেহের যত্ন লইব এবং উহা পরিচ্ছন্ন ও রোগমুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিব, কারণ ঈশ্বর বলিয়াছেন "যদি কেহ ঈশ্বরের মন্দির (অর্থাৎ দেহ) নষ্ট করে, তবে ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন, কেননা ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র, আর সেই মন্দির তোমরাই।"

মানবজাতির ত্রাণকর্ত্তারূপে ঈশ্বর তাঁহার একজাত পুত্র যীশুকে জগতে প্রেরণ করিয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ঈশ্বর, প্রভু যীশুর মধ্য দিয়া এরূপ এক ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, যাহা দ্বারা প্রভু যীশুকে যাহারা বিশ্বাস করিবে তাহারা সকলেই পাপের ক্ষমালাভ করিয়া, এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রীতিকর উপায়ে জীবন ধারণ করিতে পারিবে এবং সর্ব্বোপরি অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে; যীশুতে বিশ্বাস করিয়া লোক অনন্ত জীবন পাইবে,—ইহার অর্থ তাহারা মরিবে না,—ইহা নহে। অনন্ত জীবন লাভ করিবার অর্থ এই যে, তাঁহাদের মৃত্যু হইলেও, ঈশ্বর তাঁহাদের পুনরায় জীবন দান করিয়া চিরকালের নিমিত্ত সুখ ও শান্তিতে থাকিতে দিবেন। ঈশ্বর-পুত্র পৃথিবীতে প্রবাস কালে শুধু মঙ্গল করিয়া গিয়াছেন। তিনি লোকদিগকে পরিত্রাণের পথ দেখাইয়াছেন, এবং অন্ধ, খঞ্জ, ও পীড়িত লোকদিগকে আরোগ্য করিয়া তাহাদের শারীরিক মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি তিনি মানবজাতিকে এরূপ এক মনোরম দেশের সন্ধান দিয়াছেন,—যে দেশে দুঃখ, ব্যাধি ও যন্ত্রনা কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না; যে দেশে অন্ধ, বধির, ও খঞ্জ নাই, যে দেশে প্রবেশকারী সকলে নিষ্কলঙ্ক নিখুঁত দেহ লাভ করে, যে দেশের অধিবাসিগণের মৃত্যু ভয় নাই, কারণ সেই দেশে কখনও মৃত্যু হয় না।

প্রভু যীশু অঙ্গীকার করিয়াছেন যে তিনি শীঘ্রই এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবেন। তাঁহার আগমন কাল অতি সন্নিকট, কারণ যে সকল চিহ্ন তাঁহার আগমন সূচিত করিবে বলা আছে, তাহাদের প্রায় সমুদয় পূর্ণ হইয়াছে। জগতে রোগের বৃদ্ধি, মহা ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ, জাতিসমূহের নানাবিধ ক্লেশ, বিশেষতঃ জগদ্ব্যাপী মহাসমর—এই সমুদয় চিহ্ন দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই পৃথিবীর অন্তিমকাল এবং প্রভু যীশুর দ্বিতীয় আগমন অতি সন্নিকট।

প্রভু যীশু এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া মরিয়া গিয়াছে তাহাদের সকলকে জীবিত করিয়া কবর হইতে উঠাইবেন।

তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আর যাহারা জীবিত থাকিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস ও সেবা করিতেছে, তাহাদের সকলকে পাপক্লিষ্ট, দুঃখ পরিপূর্ণ এই পুরাতন জগৎ হইতে, ধার্ম্মিকদের নিমিত্ত নির্ম্মিত স্বর্গধামের একটী অপূর্ব্ব স্থানে তিনি লইয়া যাইবেন। যাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই, এবং তাঁহার করুণা পদদলিত করিয়াছে, তাঁহার আগমনে তাহারা সকলেই বিনষ্ট হইবে।

তাই আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, এই গ্রন্থখানির পাঠকপাঠিকাগণ, শুধু দেহের ব্যাধিসমূহ কিরূপে আরোগ্য করিতে হয়, এবং কিরূপে সুস্থ এবং সবল দেহ-লাভ করা যায়, ইহা জানিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না; পরন্তু আত্মার ব্যাধি (অর্থাৎ পাপ) দূর করিতে যাহা সমর্থ, সেই পরিত্রাণ-পন্থার জ্ঞান লাভ করিয়া, যে দেশে ব্যাধি বেদনা ও মৃত্যু নাই, সেই স্বর্গীয় দেশের অনন্ত স্থান ও অনন্ত জীবন-লাভ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিন্ত হইতে প্রাণপণ চেষ্টা করুন।

৩০শ অধ্যায়

গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লিখিত ব্যবস্থা-পত্রসমূহ

১নং। "বোরিক এ্যাসিড্ সলিউশন্" (Boric Acid Solution) আট আউন্স (আধগেলাস) বা তদধিক পরিমাণ জল ধরিতে পারে, এইরূপ একটী পরিষ্কার বোতল লউন। বোতলে বড় চামচের এক চাম্‌চে "বোরিক এ্যাসিডের" দানা রাখিয়া দিউন। ভালরূপে ফুটানো কিছু জল দ্বারা বোতলটী পূর্ণ করুন। ব্যবহারের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে বোতলটী স্থির করিয়া রাখিয়া দিউন। "বোরিক এ্যাসিড্" সম্পূর্ণরূপে গলিয়া যাইবে না। সুতরাং বোতল হইতে ঢালিবার সময়ে যেন কোন দানা না পড়ে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। উক্ত সলিউশন্ ব্যবহৃত হইবার পরে আরও জল মিশাইয়া লইতে পারেন এইরূপে যতক্ষণ দানাগুলি একেবারে নিঃশেষিত হইয়া না যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত জল মিশাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

২ নং। "টিংচার অব্ আইওডিন্" (Tincture of Iodine)। ঔষধের দোকানে তৈয়ারী অবস্থায় কিনিতে পাওয়া যায়। (১৬৩ পৃষ্ঠার অন্নমণ্ডের জন্য ২৫ নং ব্যবস্থা-পত্র দেখুন।)

৩ নং। "আর্‌জিরল্ সলিউশন্" (Argyrol Solution)। ঔষধের দোকানে কিনিতে পাওয়া যাইবে। শতকরা দশভাগ সলিউশন্ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

৪ নং। "বোরিক এ্যাসিড্ পাউডার" (Boric Acid Powder)। ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

মাথার রুক্ষা ও চুল উঠার জন্য

৫ নং। ২ ড্রাম (ছোট চায়ের চামচের দুই চাম্‌চে) "সালফার," এক আউন্স "ভ্যাসেলিন্" (বড় চামচের দুই চাম্‌চে) একত্র মিশ্রিত করিবেন।

মাথায় টাক্ পড়িলে

৬ নং। ২০ গ্রেণ "রিসরসিন্" (Resorcine), ৫ ড্রাম "এ্যাল্‌কোহল্ এবং ৫ ড্রাম জল একত্র মিশ্রিত করিবেন।

উদরাময় নিবারণ করিতে

৭ নং। বয়স্ক ব্যক্তির জন্য :—২ ড্রাম "সাব্ নাইট্রেট্ অব্ বিস্মাথ" (Subnitrate of Bismuth) ১ ড্রাম "স্যালল্, (Salol) ১।।০ আউন্স "চক্ মিক্শ্চার" (Chalk Mixture) একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক তিনবার চারি ঘণ্টা অন্তর এক চাম্‌চে (চায়ের) দিবেন।

শিশুর জন্য :—৩৬ গ্রেণ "সাব্ নাইট্রেট্ অব বিসমাথ" ১২ গ্রেণ "স্যালল্," ৪ ড্রাম্ "চক্ মিক্শ্চার" একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর ছোট চায়ের চাম্‌চের এক চাম্‌চে করিয়া দিবেন।

৮ নং। ফিট্‌কারী শোধন। চাম্‌চেতে এক টুক্‌রা ফিট্‌কারী লইয়া আগুনের উপরে ধরিয়া রাখুন, এবং যতক্ষণে উহা গলিয়া সাদা এবং শুষ্ক হইয়া না যায়, ততক্ষণ চাম্‌চেখানি আগুনের উপরে রাখিতে হইবে।

৯ নং। মুখ ধৌত এবং কুলকুচি করিবার জন্য।

১ ড্রাম "কার্ব্বলিক্ এ্যাসিড," ১ আউন্স "গ্লিসিরিন্," (Glycerine) ১০ আউন্স "স্যাচিউরেটেড্ বোরিক এ্যাসিড্ সলিউশন্" (Saturated Boric Acid Solution) একত্র মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে :—

আর একটী ভাল ঔষধের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল :—

১ ড্রাম "বোরিক এ্যাসিড" ২।।০ ড্রাম "পটাশিয়াম্ ক্লোরেট্" (Potassium Chlorate) এবং ১২ আউন্স "পেপার্‌মেণ্ট ওয়াটার্" (Peppermint water) একত্র করিয়া লউন।

মুখ ধৌত ও কুলকুচি করিবার জন্য অপর একটী ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। এক পাইট (এক গেলাস) জলে ছোট এক চাম্‌চে লবণ এবং ঐ পরিমাণ "সোডা বাই-কার্ব্বনেট্" (Soda Bicarbonate) মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবেন।

১০ নং। ১।।০ ড্রাম "কার্ব্বলিক্ এ্যাসিড" (Carbolic Acid) ২ আউন্স "এ্যাল্‌কোহল্" (Alcohol) ৫ আউন্স জলের সহিত একত্র মিশ্রিত করুন।

কুলকুচি ও মুখ ধৌত করিবার ইহাও একটী ভাল ঔষধ।

ফোড়ার মলম

১১ নং। ১ আউন্স "ভ্যাসেলিন্" (Vaseline) ও ১০ গ্রেণ "কার্ব্বলিক এ্যাসিড" (Carbolic Acid) একত্র মিশাইবেন।

বুক জ্বালা করিলে এবং অম্বল উঠিলে

১২ নং। একবারে ছোট চামচের এক চামচে "সোডা বাই-কার্বনেট" (Soda Bicarbonate) গ্রহণ করা যাইতে পারে।

অর্শের মলম

১৩ নং। "লেড্ এসিটেট" (Lead Acetate) ২ ভাগ, "ট্যানিক এ্যাসিড" (Tannic Acid) ১ ভাগ, "বেলেডোনা অয়েণ্টমেণ্ট" (Belladonna Ointment) ১৫ ভাগ, লইয়া একটী ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে।

১৪ নং। "টুথ্-পাউডার" বা দন্তমঞ্জন।

চক বা খড়ির গুঁড়া অর্দ্ধ পাউণ্ড, "ক্যাষ্টিল্ সোপের" গুঁড়া (Castile Soap) ১১ আউন্স, চিনি ১ আউন্স, এবং পুষ্কর মূলচূর্ণ (Orris root powder) ১ আউন্স একত্র মিশ্রিত করুন।

১৫ নং। হুক্ ওয়ার্মের ঔষধ, ২১৭ ও ২১৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

১৬ নং। "মেন্থল্" (Menthol) "ক্যাম্ফার" (Camphor) "ইউক্যালিপটাস্ অয়েল্" (Eucalyptus Oil) ও "অলিয়াম্ পাইনাই সিল্ভার্ট্রিস্" (Oleum Pini Silvertris) সমভাবে মিশাইয়া লইয়া নিশ্বাসের সহিত টানিয়া লইবেন।

১৭ নং। (বিনা ব্যয়ে উক্ত ঔষধ ব্যবহারের উপায়)। উক্ত ঔষধ ব্যবহার করিবার পদ্ধতি এই:—চারি ইঞ্চি আন্দাজ লম্বা এবং একটা আঙ্গুলের ন্যায় মোটা এক টুক্‌রা বাঁশ লউন। উক্ত বাঁশের এক প্রান্ত এক টুক্‌রা সচ্ছিদ্র সোলা বা কাঠ দ্বারা বন্ধ করিয়া দিউন। একটু তুলা বা একখণ্ড নেকড়া উক্ত ঔষধে ভিজাইয়া লইয়া বাঁশের টুক্‌রার মধ্যে রাখিয়া দিবেন। তারপর বাঁশের টুক্‌রার খোলা মুখটা নাকের একটী রন্ধ্রের মধ্যে ভরিয়া দিয়া শ্বাস টানিতে থাকিবেন। এইরূপে দিনে কয়েকবার ঔষধ টানিতে থাকিবেন। ঔষধ ব্যবহার করিয়া বাঁশের খোলা মুখটা একটা ছিপি দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবেন, যেন ঔষধটী উড়িয়া না যায়।

১৮ নং। শুষ্ক কাশির নিমিত্ত

মিশ্রিত করুন		
	"কোডিন্ সাল্‌ফেট" (Codein Sulphate)	৩ গ্রেণ।
	"য়্যামোনিয়াম্ ক্লোরাইড" (Ammonium Chloride)	৭৫ গ্রেণ।
	"সিরাপ অব্ সিট্রিক্" (Syrup of Citric Acid)	১ আউন্স।
	জল (Water)	১॥০ আউন্স।

বয়স্ক ব্যক্তিকে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক তিন কি চারি ঘণ্টা অন্তর ছোট চামচের এক চামচে ঔষধ জলের সহিত মিশাইয়া

খাইতে দিবেন। শিশুকে চায়ের চামচের এক তৃতীয়াংশ একবারে দেওয়া যাইতে পারে।

১৯ নং। ৩ গ্রেণ "সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ আয়রণ" (Sulphate of iron) তিন গ্রেণ "ওভারিণের" (Ovarin) সহিত মিশ্রিত করিয়া দৈনিক তিনবার "ক্যাপসুলে" (Capsule) ভরিয়া ব্যবহার করিবেন। ২০৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

হরিৎ-পীড়ার (Chlorosis) জন্য

২০ নং। "ব্লড্‌স্‌ পিল্‌স্‌" (Blaud's pills) প্রত্যেক পিলে ২ গ্রেণ করিয়া "সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ আয়রণ" (Sulphate of iron) থাকে।

২১ নং। ঔষধের দোকানে "ব্লু-অয়েণ্ট্‌মেণ্ট" (Blue ointment) তৈয়ারী কিনিতে পাওয়া যায়।

২২ নং। এক গেলাস জলে বড় এক চাম্‌চে "পটাশিয়াম্‌ পার্‌ম্যাঙ্গানেটের" (Potassium permanganate) দানা লইয়া ভালরূপে মিশ্রিত করুন। বার বার উহা নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে হইবে এবং ব্যবহারের পূর্ব্বে কয়েক ঘণ্টা স্থির রাখিয়া দিবেন। ক্ষত ধৌত বা ডুস্‌ দ্বারা যোনি ধৌত করিবার জন্য এই কড়া "সলিউশন্‌" ব্যবহার না করিয়া উহার ছোট দুই চাম্‌চে দুই গেলাস জলের সহিত মিশাইয়া ডুসের সঙ্গে ব্যবহার করিবেন।

২২ নং। "জিংক্‌ অয়েণ্ট্‌মেণ্ট" (Zinc ointment) ঔষধের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।

২৪ নং। গমের ময়দার মণ্ড প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই:—একটী পরিষ্কার রান্না করিবার পাত্রে গম রাখিয়া, আগুনের উপরে চাপাইয়া দিউন এবং উহা ক্রমশঃ নাড়িতে থাকুন,—যতক্ষণ না বাদামী রঙ্‌ হয়। তারপর এই বাদামী রঙ্গের ময়দা দ্বারা মণ্ড প্রস্তুত করুন। উহাতে একটু লবণ মিশাইবেন।

২৫ নং। অন্নমণ্ড (Rice Water)—দুই গেলাস জলে বড় দুই চাম্‌চে চাউল দিয়া ক্রমাগত তিন চারি ঘণ্টা সিদ্ধ করিতে থাকুন। মাঝে মাঝে একটু একটু জল মিশাইয়া দিবেন, যেন তিন চারি ঘণ্টা সিদ্ধ করিবার পর দুই গেলাস আন্দাজ অবশিষ্ট থাকে।

২৬ নং। নিম্নলিখিত উপায়ে চূণের জল প্রস্তুত করিতে হয়। একটী ছোট মুরগীর ডিমের অর্দ্ধেক পরিমাণ চূণ এক পাইণ্ট জলে ভিজাইতে হইবে; উহাতে জলটা দুধের মত সাদা দেখাইবে, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই থিতাইয়া যাইবে। থিতাইলে পর উপরের পরিষ্কার জলটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে। ঐ চূণে পুনরায় আর এক পাইণ্ট জল মিশাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া আবার থিতাইতে

দিতে হইবে, এবার পরিষ্কার হইলে উপরের জল ফেলিয়া দিতে হইবে। ইহাতে চুণের ময়লা কাটিয়া যায়। পরে চুণটুকু চারিভাগ করিয়া এক এক ভাগ এক একটী পাইট বোতলে পূরিতে হইবে। বোতলটী ফুটান জলে পূর্ণ করিয়া শক্ত করিয়া ছিপি আটকাইতে হইবে। বোতলের পরিষ্কার জলই চুণের জল।

২৭ নং। ডিম্বের জল ২৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৮ নং। শ্বেতসার দিয়া বস্তিক্রিয়া। ১৬৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

২৯ নং। এগ্‌নগ্‌ (Egg-nog)। ২৯৭ ও ২৯৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

৩০ নং। ডিম্বের জেলি। ২৯৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

৩১ নং। বাষ্প সেবন প্রণালী:—জল জ্বাল দেওয়া যাইতে পারে এরূপ একটী পাত্র লইয়া আগুনের উপরে বসাইতে হইবে। চুঙ্গীর মত একটী নল করিয়া মুখমণ্ডলের সহিত ঐ পাত্র যোগ করিয়া দিতে হইবে। একখানি কাগজ বা তোয়ালে দ্বারা একাজ চলিতে পারে। ঐ নলের এক দিক ফুটন্ত জলের পাত্রের মুখের উপরে রাখিয়া, অপর দিক মুখের কাছে লইয়া নিশ্বাস লইতে হইবে। একটু "ইউকালিপ্‌টাস্‌" তৈল (Oil of Eucalyptus) জলে মিশাইয়া দিতে হইবে, ১৬৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

৩২ নং। ঔষধ মিশ্রিত অস্থধৌত। ১৮৫ ও ১৮৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

৩৩ নং। কলেরায় "ট্যানিক্ এ্যাসিডের" (Tannic Acid) অস্থধৌত। ১৯৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

৩৪ নং। দাদের মলম। ২৫৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

৩৫ নং। ক্ষুদ্র কৃমির মলম। ২১৯ পৃষ্ঠা দেখুন।

পরিশিষ্ট

তন্তুপুষ্টি বা জীর্ণসংস্কার সংক্রান্ত রোগসমূহ

(Diseases of Metabolism)

এইচ্, সি, মেঙ্কেল, এম্, ডি, প্রণীত

পুষ্টির নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা হইতে পুষ্টি সংক্রান্ত ব্যাধি উৎপন্ন হয়। শ্বেতসার, শর্করা, চর্ব্বি, প্রোটিন্ (ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় পদার্থ) খনিজ লবণ, "ভিটামিন্" প্রভৃতি খাদ্যসারের যে কোন একটী বা একাধিক সম্পূর্ণরূপে শরীর দ্বারা গৃহীত না হইলে, দেহের সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি হয় না; ফলে যে প্রকার খাদ্যের অভাব, সেই অনুসারে বিভিন্ন লক্ষণের সহিত ক্ষীণতা উৎপন্ন হয়, ও দেহের মলত্যাগের নানাপ্রকার ব্যাঘাত জন্মায়। শর্করাযুক্ত বহুমূত্র, রসবাত, গ্রন্থিবাত, স্থূলতা, স্নায়বিক রোগ ও ক্ষারীয় রক্তের হ্রাস (Acidosis) প্রভৃতি এই জাতীয় রোগ।

বাতরোগ ও দেহে খনিজ লবণের অভাব

বর্ত্তমানে দৈনিক পুষ্টিসাধন সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে বাত ও ঐ জাতীয় ব্যাধিসমূহের কারণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা বিদূরিত হইয়াছে।

মানবদেহে দুইটী কার্য্য চলিতেছে, একটী গঠন এবং একটী ধ্বংস। স্বাভাবিক অঙ্গচালনার জন্যই দৈহিক তন্তুসমূহ ভগ্ন হইয়া যায়, সেই জন্যই বলা হইয়াছে, "মানুষ জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই মরিতে আরম্ভ করে।" এই প্রক্রিয়ার শেষ অবস্থায় দ্রাবক উৎপন্ন হয়, উহা দ্বারা জীবন্ত তন্তুর ক্ষতি হয়।

সজীব অঙ্গের কোষসমূহ অম্লদ্রাবক সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই দৈহিক তন্তুসমূহকে ক্ষারজাতীয় দ্রব্যে বেষ্টিত হইয়া কার্য্য করিতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে ক্ষার দ্রব্যের সাহায্যে পুষ্টিসাধন জন্য গঠন প্রণালীর কার্য্য সম্পন্ন হয়; এবং রক্তে ও দৈহিক কোষে প্রচুর ক্ষার পদার্থ সঞ্চয় করে।

আমরা শাকসব্জি জাতীয় খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ ১৬ প্রকার ক্ষার জাতীয় খনিজ লবণ পাই। এই সকল লবণ আঠার মত শাকসব্জির মধ্যে বর্ত্তমান; কাজেই আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় ক্ষার জাতীয় পদার্থের জন্য বেশ উপকারী।

সুস্থাবস্থায় দেহে অম্ল দ্রাবক ও ক্ষার সহজেই সমান পরিমাণে রাখা যায়। ইহাতে শরীর ভাল থাকে, সর্ব্ব বিষয়ে সুস্থ বোধ হয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ও তেজস্বী হয়।

আমাদের খাদ্যে ষোলটী ক্ষার জাতীয় খনিজ লবণের মধ্যে যদি একটী বা একাধিক লবণের অভাব হেতু দেহে একটুও ক্ষারের অভাব হয়, তাহা হইলে অসুস্থ হইতে হয়; চিকিৎসকেরা ইহাকে "এসিডোসিস্" (Acidosis) রোগ, অর্থাৎ দেহে ক্ষারের অভাবজনিত রোগ বলেন। যে জাতীয় ক্ষারের অভাব হয়, এই রোগে সেই জাতীয় ক্ষার অনুসারে দেহে ভিন্ন ভিন্ন লবণ প্রকাশ পায়।

"পোটাশিয়াম্", (Potassium), "সোডা" (Soda), "লাইম্" (Lime), চুণ, "ম্যাগনিসিয়া" (Magnesia), "সিলিকা" (Silica), "ফস্ফরাস্" (Phosphorus), "ক্লোরিণ" (Chlorine), "আয়রণ" (Iron), লৌহ, এবং "সাল্ফার্" (Sulphur) প্রভৃতি নির্জীব পদার্থ পরিমিত ভাবে সজীব পদার্থে মিশ্রিত হইয়া জীব দেহের বিভিন্ন প্রকার কোষ নির্ম্মাণ করে।

রসবাত, গেঁটেবাত, স্নায়ুপ্রদাহ জাতীয় রোগসমূহ রোধ করিবার ক্ষমতা বা উহা দ্বারা আক্রান্ত হইবার প্রবণতা, আমাদের ব্যক্তিগত দৈহিক কোষের পুষ্টির সামঞ্জস্য অনুসারে নির্দ্ধারিত হয়। বিশেষতঃ ১৬ প্রকার লবণ ও তিন প্রকার "ভিটামিন্" (Vitamin) দৈহিক কোষে থাকা না থাকার উপরে পুষ্টির সামঞ্জস্য বহু পরিমাণে নির্ভর করে। এই সমস্ত আমাদের ব্যবহারের জন্য উদ্ভিদ্ দেহে বিদ্যমান্।

দেখা যাইতেছে যে প্রধান লক্ষণ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার নাম বিশিষ্ট, বহু রোগকেই দেহে খনিজ পদার্থের অভাব বশতঃ যে সকল রোগ হয়, তাহার মধ্যে গণনা করা যায়। দেহের খনিজ পদার্থ নিঃশেষিত হওয়ায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে।

দেহে এই প্রকার খনিজ পদার্থ শূন্য হইবার কারণ নির্ণয় করা দুরূহ নহে। যে সকল শাকসব্জি ও ফল জাতীয় খাদ্যে, ক্ষার সরবরাহকারী পদার্থ বিদ্যমান তাহা যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়াই উহার প্রধান কারণ। প্রচুর পরিমাণে টাট্‌কা শাকসব্জি ও টাট্‌কা পাকা ফল খাওয়া উচিত। শাকসব্জি যে জলে সিদ্ধ করা হয়, উহা যেন ফেলিয়া দেওয়া না হয়। প্রত্যহই কাচা শাকসব্জি— কপির পাতা, গাজর ইত্যাদি খাওয়া উচিত। যাহাতে শরীর খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, উহা এরূপে ব্যবহার করিতে হইবে। কলের ময়দায় বা কলেছাটা চাউলের খনিজ পদার্থ বাহির হইয়া যায়। এই সকল দ্রব্যে খনিজ পদার্থ খুবই কম থাকে, কাজেই খাদ্যের পক্ষে যথেষ্ট নহে।

অধিক পরিমাণ রুটি খাইলে অম্বল হয়, কাজেই যাহাদের সহজেই বাত-রোগ আইসে, তাহাদের উহা খুব কম ব্যবহার করা উচিত। মাংসে খুবই বেশী অম্বল হয়, আর সেই অম্বল নষ্ট করিতে, দেহের সঞ্চিত খনিজ পদার্থ ব্যয়িত হইয়া যায়। রসবাতের রোগীর মাংসাহার হ্রাস করা প্রয়োজন। এখন আমরা বুঝিতে পারি এরূপ প্রয়োজন হয় কেন।

কোষ্ঠ-কাঠিন্য ও অন্ত্র হইতে অম্ল পদার্থের শোষণ খনিজ পদার্থের অভাব হইবার তৃতীয় কারণ। ইহা দূর করিতে হইবে।

উপরি-উক্ত বিষয় হইতে বুঝা যায় যে, অধিক খনিজ পদার্থের অপব্যয় এবং উহা যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ না করা, এই দুইটাই খনিজ পদার্থের অভাবের কারণ, অতএব যে সকল খাদ্যে অম্বল হয়, তাহা বন্ধ করিতে হইবে, ও ক্ষার বিশিষ্ট খাদ্য বৃদ্ধি করিতে হইবে। যাহাতে কোষ্ঠ-কাঠিন্য না হয়, তাহা করিতে হইবে। দেহের মল বাহির করিতে, প্রচুর জল পান করিতে হইবে। অম্লজানের কার্য্যের জন্য প্রচুর নির্ম্মল বায়ু গ্রহণ করা প্রয়োজন।

উপরি-উক্ত পথ্যের বন্দোবস্ত করিয়াও তন্তুসমূহ খনিজ পদার্থ সঞ্চিত রাখিবার জন্য কখন কখন খনিজ লবণ গ্রহণ করা আবশ্যক।

দেহের বিভিন্ন স্থানের মাংসগ্রন্থিসমূহ দ্বারা খনিজ তন্তুপুষ্টি বা জীর্ণসংস্কার কার্য্য বহু পরিমাণে সাধিত হয়। (Parathyroids), প্লীহা, কণ্ঠদেশের উপাস্থির গ্রন্থি এবং সম্ভবতঃ লৈঙ্গিক গ্রন্থিসমূহও এই সকল গ্রন্থির অন্তর্গত, কারণ দেহের সাধারণ পুষ্টিকার্য্যের সহিত ইহার খুব সম্বন্ধ। এই সকল গ্রন্থির কার্য্যের ব্যাঘাতেও দেহে খনিজ পদার্থের অভাব হয়। এই সকল গ্রন্থির দ্বারা কাজ কম হইলে, স্বল্প পরিমাণ ক্ষার পদার্থের অভাবে যাহা হয়, তাহাই হইয়া থাকে; কারণ এই অবস্থায় ভুক্ত খনিজ দ্রব্য যথাযথ ব্যবহৃত না হইয়াই বাহির হইয়া যায়, এই প্রকারে ক্ষারের অভাব সৃষ্টি হয়। এইরূপ অবস্থায় পশুর গ্রন্থির সারাংশ বড়ির আকারে প্রত্যহ কয়েক মাস ধরিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা হইতে লেখক বহু উপকার পাইয়াছেন।

খনিজ পদার্থ জীর্ণকারী গ্রন্থিসমূহের সূর্য্যকিরণের বেগুনিয়া আলোকাংশের (Ultra-violet rays) প্রভাবে আশ্চর্য্যরূপে ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় বলিয়া, সমস্ত শরীর বা শরীরের এক অংশ রৌদ্রে খুলিয়া ধরা খুব উপকারী। প্রথমে সামান্য কয়েক মিনিট হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে অধিকক্ষণ রৌদ্র ভোগ করা অভ্যাস করিতে হইবে। গৌরবর্ণ ব্যক্তি মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড রৌদ্রে রাখিবেন না।

এই রোগের গৃহ-চিকিৎসায়, প্রত্যহ গরম জলে স্নান, এবং যেখানে বেদনা সেই স্থানে গরম সেঁক ফলদায়ক। যাহাদের সম্ভব হইবে তাহারা কেবল এই

সকল রোগের চিকিৎসার জন্য, নির্দ্দিষ্ট কোন স্বাস্থ্য নিবাসে বিশেষ কোন চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবেন। বহুপ্রকার আলোকশক্তি ও বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে এই রোগের চিকিৎসা হইয়া থাকে, এই সকল চিকিৎসা অমোঘ ফলপ্রদ।

বহুমূত্র

বহুমূত্র-রোগ পুষ্টিসাধনের বিশৃঙ্খলা। ইহাতে দেহ দৈনিক খাদ্য হইতে শর্করা এবং শ্বেতসার পুষ্টিসাধনের জন্য গ্রহণ করিতে পারে না; ফলে রক্ত ও তন্তুসমূহ শর্করায় পরিপূর্ণ হয়।

এই অব্যবহৃত ও অব্যবহার্য্য অস্বাভাবিক শর্করা দ্বারা দেহের রক্ত এবং তন্তু ক্ষারশূন্য হইয়া যায়। ইহা হইতে ক্রমে অম্বল হয়, ও সাংঘাতিক অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি এই স্বাভাবিক শর্করা বৃক্কের সাহায্যে মূত্রের সহিত বাহির করিয়া দিতে চেষ্টা করে, মূত্রের এই শর্করাই বহুমূত্রের সুবিদিত প্রধান লক্ষণ।

বর্ত্তমানে গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে, সুস্থাবস্থায় দেহে জটিল রাসায়নিক বস্তুসমন্বিত কতকগুলি তন্তু থাকে, উহাতে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে, শর্করা ও শ্বেতসার, দৈহিক উত্তাপ, মাংসপেশী ও স্নায়বিক শক্তি উৎপন্ন করে।

পাকস্থলীর পশ্চাৎস্থিত, অগ্ন্যাশয় নামক একটী মাংসগ্রন্থি নির্ম্মিত সুদীর্ঘ যন্ত্র কর্ত্তৃক এই শর্করা জীর্ণকারী রাসায়নিক বস্তু বহুল পরিমাণে উৎপন্ন ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। অতএব অগ্ন্যাশয়ের কার্য্য এবং উহা হইতে যে রাসায়নিক পাচক-রস নির্গত হইয়া দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করে, তাহা বন্ধ হওয়ায় বিশেষরূপে বর্দ্ধিত অজীর্ণতাই বহুমূত্র।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে টরোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার বাণ্টিং এবং বেষ্ট প্রচার করিয়াছেন যে, তাঁহারা ক্লোম হইতে শর্করা পরিপাককারী এই রাসায়নিক বস্তু পৃথক্ করিয়া লইতে পারিয়াছেন। তাঁহারা উহার নাম দিয়াছেন "ইন্সুলিন্" (Insulin) তাহারা আরও প্রচার করিয়াছেন যে বহুমূত্র রোগীর রক্তে, এই "ইন্সুলিন্" "ইন্জেক্সান্" করিয়া মিশ্রিত করিয়া দিলে, রক্ত এবং মূত্র দুই-ই শর্করা-বিমুক্ত হইবে। রোগীর দেহের শর্করা এবং তজ্জনিত যন্ত্রণা দূর করিতে, দৈনিক এইরূপ একটী হইতে তিনটী "ইন্জেকসান্" প্রয়োজন হইতে পারে। যতদিন "ইন্জেক্সান্" দেওয়া হইতে থাকে ততদিন এই ফল থাকে, "ইন্জেক্সান্" দেওয়া বন্ধ হইলেই, শর্করাধিক্যের লক্ষণসমূহ পুনঃ প্রকাশিত হয়। বহুমূত্র চিকিৎসায় প্রধান আবিষ্কারের মধ্যে ইহাই প্রথম। এক্ষণে শুষ্কীকৃত ক্লোম জাত পদার্থ (desiccated pancreatic preparations) ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

পুষ্টিসাধনের বিশৃঙ্খলাই যেহেতু বহুমূত্র রোগের কারণ, স্বাভাবিক ও পরিমিত পুষ্টিসাধনের শক্তি পুনরায় লাভ করিতে পথ্য সম্বন্ধে বিচার খুবই প্রয়োজন। খাদ্য নির্ণয় করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বহুমূত্র রোগীর শ্বেতসার ও শর্করা জীর্ণ করিবার ক্ষমতা নাই, এবং এই দুই প্রকার খাদ্য সাধারণতঃ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুও শরীরের উপকারে লাগাইতে পারে না।

সুস্থাবস্থায় যে পরিমাণ খাদ্য খায়, রুগ্নাবস্থায় যদি রোগী সেই পরিমাণ খাদ্য খায় তাহা হইলে যে কেবল মূত্রের সাহায্যে ইহাই কতকাংশ বাহির হইয়া যায় তাহা নহে, পরন্তু ঐ খাদ্য অধিক দিন আর খাদ্যের কার্য্য করে না, বরণ বহুমূত্রের বহুলক্ষণ সৃষ্টি করিয়া বিষের কার্য্য করে।

পথ্য নির্ব্বাচন

নিম্নে সাধারণ ভাবে পথ্যের উল্লেখ করা গেল, উহা খুবই ফলদায়ক। রোগীর অবস্থার তারতম্য অনুসারে, ইহা কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

এই রোগের চিকিৎসায় প্রথম লক্ষ্য হইবে অম্বল হওয়া বন্ধ করা; দ্বিতীয়, রোগীর শর্করা ও শ্বেতসার হজম করিবার শক্তি নির্ণয় করিয়া তদনুসারে পথ্য নির্ব্বাচন করা, সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে হজম করিবার শক্তির উন্নতি হয় তাহা করা।

প্রথম তিন দিন রোগীকে কেবল, সিদ্ধ করা, রান্না বা কাঁচা সবুজ শাক দিতে হইবে। ইহার সহিত কেবল জল পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। তিন দিনের পরেও যদি মূত্র শর্করা-শূন্য না হয়, তাহা হইলে আরও কয়েক দিন অর্থাৎ যত দিন না রক্ত শর্করা-শূন্য হয় ততদিন ঐরূপ সবুজ শাক খাইয়া থাকিতে হইবে।

তৎপরে এই শাকের সহিত চাউল, আলু ও ময়দা প্রভৃতি শর্করা ও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য দিতে আরম্ভ করিতে হইবে। প্রথম দিন এই খাদ্য কেবল বড় চামচের এক চামচে দিতে হইবে এবং প্রত্যহ সম পরিমাণ মত ক্রমে ক্রমে বাড়াইতে হইবে।

মূত্রে শর্করা আছে কিনা প্রত্যহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। শর্করা ও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য বাড়াইতে বাড়াইতে যখন আবার মূত্রে চিনি দেখা দিবে, তখন বুঝা যাইবে যে রোগী যতটা পরিমাণ চিনি ও শর্করা জাতীয় খাদ্য হজম করিতে পারে ততটা দেওয়া হইতেছে।

যখন মূত্রে চিনি দেখা দেয়, তখন যে পরিমাণ চাউল ও আলু দেওয়া হইয়াছিল, তাহার এক তৃতীয়াংশ কমাইয়া দিতে হইবে, এবং রোগীও এক

সপ্তাহ বা ততোধিক কাল, যত দিন না শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় খাদ্য বাড়ান হয়, ততদিন এই পরিমাণ খাদ্য আহার করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন। সবুজ শাক জাতীয় খাদ্য যথা,—কপিপাতা, পালংশাক, ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে। উহাই রোগের প্রধান খাদ্য হইবে।

এইরূপে কিছুকাল প্রস্রাব শর্করা-মুক্ত করিয়া, পুনরায় শর্করা জাতীয় খাদ্য বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করা যাইতে পারে। পূর্ব্ববৎ যতদিন প্রস্রাবে শর্করা দেখা না যায় ততদিন বাড়াইয়া শেষে আবার একতৃতীয়াংশ কমাইয়া দিতে হইবে।

উল্লিখিত শর্করা ও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের উপরে ডিম, পনীর, সরতোলা দুধ, অল্প পরিমাণ মাখন, জলপাইয়ের তৈল, গ্লটেন্ ময়দার রুটি, মটরশুঁটী ও বাদাম ব্যবহার করা যাইতে পারে। শেষোক্ত দ্রব্য দুইটী সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। কোন প্রকার মিষ্ট বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। অম্বল হয় বলিয়া মাংস জাতীয় খাদ্য ব্যবহার করা উচিত নহে।

মদ্য এবং তাম্রকূট পরিপাক ক্রিয়ায় বাধা জন্মায়, কাজেই রোগী উহা ব্যবহার করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। পুরাণ বহুমূত্র রোগে সপ্তাহে একবার উপবাস বেশ উপকারী। প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার করিতে হইবে।

উপরে নির্ব্বাচিত পথ্যের সহিত এক বৎসর বা ততোধিক কাল উল্লিখিত নিয়ম ব্যবহার করিয়া রোগীর প্রয়োজনীয় শর্করা জীর্ণ করিতে হইবে, এই সময়ে তাহার নিজের অগ্ন্যাশয় সজীব থাকিলে পুনরায় কার্য্য করিতে আরম্ভ করিবে। পুরাণ রোগে এই প্রক্রিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ব্যাপিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

স্প্রু Sprue

এই রোগ উদরাময়ের ন্যায় আরম্ভ হয়। হরিদ্রা বর্ণ পাতলা ফেনিল মল নির্গত হয়। সাধারণতঃ প্রাতে কয়েকবার দাস্ত হয়। গালের ভিতরে এবং জিহ্বায় ঘা হয়। হজমে ব্যাঘাত হয় এবং ক্রমে ওজন কমিতে থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এই রোগকে আন্ত্রিক-প্রদাহ বলিয়া চিকিৎসা করা হইত। এক্ষণ ইহাকে জীর্ণ ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা বলিয়া গণনা করা হয়। খাদ্য মধ্যস্থ চূর্ণ জীর্ণ করিবার ক্ষমতা নষ্ট হওয়ায় এই রোগ হয়।

যে সকল যন্ত্র চূণের কাজ করে, তাহারা এই রোগের ফলে কাজ বন্ধ করে, কাজেই দেহে চূণের অভাব হয়। প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি গ্রন্থিযুক্ত অঙ্গসমূহ শরীরে চূণের কার্য্য করে।

এই আবিষ্কারের পর হইতে স্প্রু রোগ বেশ কৃতকার্য্যতার সহিত চিকিৎসিত হইতেছে। প্রায় সকল অবস্থায়ই এক সপ্তাহ হইতে পনের দিন পর্য্যন্ত রোগীকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতে হইবে, এবং কেবল দুধ খাইতে দিতে পারা যাইবে। পরে উপযুক্ত চূণ পায় এই জন্য রোগীকে ১০ গ্রেণ করিয়া "ক্যাল্‌সিয়াম্ ল্যাক্‌টেট্" (Calcium Lactate) দিনে তিনবার খাইতে দিতে হইবে।

শুষ্কীকৃত প্লীহা ও যকৃৎ বটিকাকারে উপযুক্ত পরিমাণে দিনে তিন বার গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাতে চূণের অভাব পূর্ণ হয়, এবং প্রায় সকল অবস্থায়ই রোগ আরোগ্য হইয়া জীবনক্রিয়া পরিমিতরূপে সাধিত করে।

এক সপ্তাহ বা ততোধিক কাল, কেবল দুধ খাওয়াইবার পর ক্রমে ক্রমে চূণ আছে এরূপ খাদ্যের পরিমাণ (শাকসব্জি দ্বারা) বাড়াইতে হইবে। রোগ সাধারণ হইলে ছয় সপ্তাহ পরেই, পূর্ণ খাদ্য গ্রহণ করিয়া স্বাভাবিক স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারা যায়।

ক্ষতযুক্ত অনেক পুরাণ এইরূপ রোগে, স্প্রু না হইলেও এই প্রকার চিকিৎসায়ই নীরোগ হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটী চিকিৎসা সম্বন্ধীয় উত্তম ফলদায়ক আবিষ্কার।

কালা-জ্বর

এ, ই, ক্লার্ক (এম্, ডি, কৃত)

"লাইস্‌ম্যান্-ডোনোভানি" (Leishman-Donovani) জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া কালা-জ্বর উৎপন্ন করে। অনিয়মিত জ্বর, ক্রমশঃ দৈহিক ওজন শক্তির হ্রাস, প্লীহা বৃদ্ধি এবং রক্তের পরিবর্ত্তন এই সকল কালা-জ্বরের বিশেষ লক্ষণ।

ম্যালেরিয়া বলিয়া ভ্রম

প্রায়ই এই রোগ ম্যালেরিয়া বলিয়া ভ্রম হয়, এমন কি ম্যালেরিয়ার ন্যায় চিকিৎসিত হয়। এই রোগের লক্ষণ কয়েকটী বিষয়ে এই রকম, কখন কখন বা সম্পূর্ণ একই রকম। কাজেই রোগ নির্ব্বাচনে ভুল হওয়াই সম্ভব: এই দুই রোগেই প্লীহা বর্দ্ধিত হয়, অল্পাধিক রক্তহীনতা দেখা যায়, এবং একই রোগীর একই সময়ে এই দুই রোগই হইতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার জীবাণু এই দুই রোগের কারণ। ম্যালেরিয়ার জীবাণু কি প্রকারে মানবদেহে প্রবেশ করে তাহা জানা গিয়াছে, কিন্তু কালা-জ্বরের জীবাণু কি প্রকারে মানবদেহে প্রবেশ করে তাহা এখনও জানা যায় নাই। অনেকে বলেন ছারপোকার কামড়ে ইহা মানবদেহে প্রবেশ করে, কিন্তু প্রায় সকল বিশেষজ্ঞগণ অপ্রমাণিত বলিয়া এ মত ত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে অনেকে মনে করেন, মশা প্রভৃতি রক্তপায়ী পতঙ্গের সাহায্যে ইহা মানবদেহে প্রবেশ লাভ করে।

লক্ষণ

কালা-জ্বরের সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ লক্ষণ প্লীহা বৃদ্ধি ইহাই রোগী প্রথমে দেখেন। ইহা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, প্রথম মাসের শেষে ইহা পাঁজরার নীচে দেখা যায়, তৃতীয় মাসের শেষে ইহা নাভি ও পাঁজরার মধ্যস্থল পর্য্যন্ত, এবং ষষ্ঠ মাসে ইহা নাভি পর্য্যন্ত নামিয়া আইসে। সাধারণ ক্ষেত্রে ইহা উল্লিখিতরূপে বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু রোগ সাংঘাতিক হইলে উহা দ্রুত বর্দ্ধিত হয়, এবং তৃতীয় মাসে নাভি পর্য্যন্ত বাড়িয়া আসে। প্লীহা সাধারণতঃ, সহজে রুগ্ন হয় না, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ঐরূপ হয়। প্লীহা নিম্ন দিকে বর্দ্ধিত না হইয়া পশ্চাদ্দিকে বর্দ্ধিত হইতে পারে, এ অবস্থায় রোগী ইহা অনুভব করিতে পারে না, চিকিৎসকের পরীক্ষায় উহা জানিতে পারা যায়।

প্লীহা বৃদ্ধির সহিত দৈহিক ওজন ও শক্তি হ্রাস হয়, এই রোগ দেহে প্রবেশ করিবার পরেই এই লক্ষণ দেখা যায়। এই হ্রাসের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং সাধারণতঃ রোগ বৃদ্ধির সহিত ইহা বর্দ্ধিত হয়।

জ্বর

ম্যালেরিয়া জ্বর ও টাইফয়েড্ জ্বরের যে এক প্রকার বিশেষত্ব আছে, কালা-জ্বরের সেরূপ কোন বিশেষত্ব নাই। কখন কখন উহা ম্যালেরিয়া, কখনও কখনও বা টাইফয়েড্ জ্বরের ন্যায় হইতে পারে। কখন কখন বা উহাদের কোনটীর ন্যায় হয় না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জ্বরের বেগ দুইবার আসে; কালা-জ্বরে কেবল এই একটী লক্ষণ রোগ নির্ণয়ে অনুকূল। প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করিলে বুঝা যাইবে যে উহা ২৪ ঘণ্টায় দুইবার উঠে। ইহাই কালা জ্বরের বিশেষ লক্ষণ।

রক্তের পরিবর্ত্তন

যদি কালা-জ্বর হইলে রক্তের পরিবর্ত্তন উত্তমরূপে লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ রক্তের শ্বেতাণুগুলির সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সুস্থ ব্যক্তির কোন এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রক্তে প্রায় ৭৫০০ সাড়ে সাত হাজার শ্বেতাণু দৃষ্ট হয়, কিন্তু কালা-জ্বর হইলে ইহার সংখ্যা খুবই কমিয়া যায়, এবং সাধারণ অবস্থায় প্রায় অনেক স্থলেই ঐ পরিমাণ রক্তে ইহার সংখ্যা কেবল চারি হাজার বা তদপেক্ষাও কম দৃষ্ট হয়। এইরূপে শ্বেতাণুর সংখ্যা হ্রাসের সহিত রক্তাল্পতাও হইয়া থাকে, অর্থাৎ লাল অণুর হ্রাস দৃষ্ট হয়, কালা-জ্বরে সেরূপ হয় না, কিন্তু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। কালা-জ্বরের রোগী অপেক্ষা পুরাণ ম্যালেরিয়ার রোগীকে অধিকতর মলিন দেখায়।

আরও কতকগুলি লক্ষণ আছে, উহারা তত সাধারণ নহে; কিন্তু উক্ত প্রধান লক্ষণগুলির সহিত দৃষ্ট হইলে এই লক্ষণগুলির উপরে বেশ নির্ভর করা যায়। সংক্ষেপে এগুলির উল্লেখ করাই ভাল। রক্তাল্পতার জন্য এবং রক্ত জমিবার ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায়, কালা-জ্বরের রোগীর মাড়ী, নাক প্রভৃতি স্থান হইতে রক্ত বাহির হইবার সম্ভাবনা অধিক। এই রোগীর আর একটী লক্ষণ প্রায়ই দেখা যায়, রোগীর চুলগুলি শুষ্ক ও ঔজ্জ্বল্য হীন হইয়া যায়। ইহার মধ্যে যে তৈল থাকে তাহা আর না থাকায়, চুলের সাধারণ চাকচিক্য নষ্ট হইয়া যায়। কালা-জ্বরে প্রায়ই প্রবল পুরাণ কাশি থাকে, এবং উহার সহিত কখন কখন ব্রঙ্কাইটিস্ও থাকে। এই রোগে কপাল ও রগের চামড়া কাল হয়।

রোগ নির্ণয়

উল্লিখিত প্রধান প্রধান লক্ষণ দেখিয়া, অনিয়মিত জ্বর ও দৈহিক ওজন শক্তির হ্রাস হইতে, এবং রক্তের পরিবর্ত্তন এবং রক্ত মধ্যে উপযুক্ত পরীক্ষা দ্বারা রোগ জীবাণু পাইলে কালা-জ্বর নির্ণয় করা যায়। রোগ নির্ণয়ের পক্ষে রক্তের জলীয়াংশ পরীক্ষা করাও খুব ভাল। এইরূপ পরীক্ষার নাম "এ্যাল্ডিহাইড টেষ্ট"

(Aldehyde test)। কোন কোন রোগীর সাধারণ রকম রক্ত পরীক্ষা করিয়া উহাতে কালা-জ্বরের জীবাণু দেখা যায় না। এই অবস্থায় প্লীহা ছিদ্র করিয়া তাহার রস পরীক্ষা করিলে রোগ বুঝা যাইবে। প্লীহার রস পরীক্ষা করা কালা-জ্বরের খুব বিশ্বাস যোগ্য পরীক্ষা, কিন্তু কয়েকটী বিপদের আশঙ্কা বশতঃ অন্য উপায়ে নির্ণীত হইলে, আর এ উপায় অবলম্বন না করাই ভাল।

রোগের অবস্থার পরিবর্ত্তন

যে সকল রোগীর চিকিৎসা হয় না, সে সকল রোগীর এই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা দুরূহ। রোগ ক্রমেই খারাপ হইয়া অবশেষে মৃত্যু ঘটায়। অথবা জীবনীশক্তি কমিয়া যাওয়ায় অপর কোন রোগাক্রান্ত হইয়া রোগী তাহাতেই অভিভূত হইয়া পড়ে। যে সকল রোগীর চিকিৎসা হয়, তাহাদের সকলকেই বাহিরে দেখিতে ভাল। যেরূপ সময়ে অর্থাৎ যতশীঘ্র চিকিৎসা আরম্ভ হয়, তাহার উপর আরোগ্য হওয়া নির্ভর করে। যে একেবারে রোগ প্রবল হইলে চিকিৎসা আরম্ভ করে, তাহার অপেক্ষা যে প্রথম অবস্থাই চিকিৎসা আরম্ভ করে, তাহার আরোগ্যের সম্ভাবনা বেশী।

চিকিৎসা

রোগ নির্ণীত হইলেই চিকিৎসা আরম্ভ করিতে হইবে! "টার্‌টার ইমেটীক সলিউশন্‌" (Solution of tartar emetic) বা "এ্যান্টিমনি" (Antimony) হইতে প্রস্তুত কোন প্রকার ঔষধ শিরার মধ্যে "ইন্‌জেক্‌সান্‌" করিয়া দিতে হইবে। সাধারণতঃ কণুইয়ের নিকটস্থ শিরায় এইরূপ "ইন্‌জেক্‌সান্‌" করিলে হয়। কোন চিকিৎসক বা এই কার্য্যে কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া এই চিকিৎসা করান কখনই উচিত নহে, কাজেই এ বিষয় আর বিস্তারিত বিবৃত হইল না।

সস্তায় যে এ্যান্টিমনি ঔষধ পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা চিকিৎসিত হইলে আরোগ্য হইতে বহু সময় প্রয়োজন হয়, অতএব যাহারা বেশী দাম দিয়া ঔষধ কিনিতে পারেন, তাহাদের তদ্দ্বারা চিকিৎসা করাই ভাল।

জটিলতা

কালা-জ্বর রোগীর রোগ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা হ্রাস পায়, কাজেই কালা-জ্বর রোগীর টাইফয়েড, আমাশয়, ক্ষয়রোগ, নিউমোনিয়া প্রভৃতি অন্যান্য রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। অনেক সময়ে কালা-জ্বরের রোগীর ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হয়, উহাতে বহু লোকের মৃত্যু হয়। উদরাময়, আমাশয়, মুখের ধ্বসা রোগ, মাড়ী, নাক প্রভৃতি হইতে রক্তস্রাব এই সকল রোগ হইবারও সম্ভাবনা।

কালা-জ্বরের বিস্তৃত বিবরণের জন্য ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মে মাসে অক্সফোর্ড ইউনির্ভার্সিটি প্রেস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, নেপিয়ার এবং মিওর কৃত (By Napire and Muir) "হ্যাণ্ডবুক্ অব্ কালা-জ্বর" (Hand-book of Kala-azar) পুস্তক দ্রষ্টব্য।

ঘুংড়ি কাশি ও তাহার চিকিৎসা

যাহারা ঘুংড়ি কাশিতে ভুগিতেছেন তরল পদার্থ তাঁহাদের জন্য উপযুক্ত খাদ্য (৩৩০ পৃষ্ঠা দেখুন)। এই ব্যাধির নিশ্চিত ফলদায়ক কোন ঔষধ নাই। পিতামাতা বিশেষরূপে সতর্ক হইবেন যেন রোগী অতিরিক্ত মাত্রায় কোন ঔষধ ব্যবহার না করেন। এই কাশির উপশমের নিমিত্ত অবসাদ ঔষধ (Narcotic drugs) সেবন করিলে নিদ্রাচ্ছন্ন অথবা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতে হয়। "বেলেডোনা" (Belladonna) ব্যবহারে প্রলাপ বকিতে হয়। এই ঔষধে শিশুদিগের চক্ষের তারার প্রসারণ হয় বলিয়া অধিক দিন ইহা ব্যবহারে চক্ষে দৃষ্টি শক্তির প্রখরতা হ্রাস পাইতে থাকে। কুইনান্ ব্যবহারে পাকস্থলীর ক্রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটে এবং অন্যান্য অপকার সাধিত হয়। পেটেণ্ট ঔষধ আদৌ ব্যবহার করা উচিত নহে। চিকিৎসক যে ঔষধ যতবার ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিবেন তদপেক্ষা অধিক বার কোন ঔষধ সেবন করা অনুচিত, অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত ঐ ঔষধ অন্য কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেওয়া বিধেয় নহে।

রোগ যাহাতে কঠিন আকার ধারণ না করে তজ্জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়ম মান্য করিয়া চলাই অধিক উপযোগী যদি আবহাওয়া ভাল থাকে তবে বালকবালিকাদের বাহিরে খোলা যায়গায় বেড়াইতে দেওয়া ভাল, কারণ সূর্য্যরশ্মি এবং বিশুদ্ধ বায়ু শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী। অধিক সিক্ততা, ধূলা কিংবা ঝাপ্টা বায়ু শরীরের পক্ষে অপকারী বিছানা রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া উত্তম। বিছানাটী উত্তপ্ত হইলে শিশুকে সেই বিছানায় শোয়ান উচিত। সমস্ত উত্তেজনা ত্যাগ করা বিধেয়। আহার্য্য লঘু হইলেও পুষ্টিকর হওয়া প্রয়োজন। ছোট ছোট বালকবালিকার যখন পুনঃ পুনঃ বমির উদ্রেক হয় তখন তাঁহাদিগকে দুগ্ধ ব্যতীত অন্য পানীয় দেওয়া বিহিত।

ঔষধের বাষ্প গ্রহণ করা উপকারী। "ক্রোশট্" (Creosote) "ইউক্লিপ্টাস্" (Eucalyptus) এবং "কম্পাউণ্ড টিংচার অব্ বেঞ্জাইন্" (Compound Tincture of Benzoin) এইরূপে গ্রহণ করা যায়। উল্লিখিত ঔষধের যে কোন একটীর

এক চাম্‌চে (চায়ের চামচের) ঔষধ লইয়া ১২ আউন্স পরিমিত গরম জলে মিশাইয়া তাহার বাষ্প লইতে হয়। লেখক সচরাচর এক আউন্স পরিমিত "বেঞ্জাইনের (Benzoin) সহিত চায়ের চামচের এক চাম্‌চে "ইউক্লিপ্‌টাস্" মিশ্রিত করিয়া উক্ত নিয়মানুসারে এক এক চাম্‌চে (চায়ের) ব্যবহার করিয়া থাকেন। দিনের বেলা কয়েক বার উহা ব্যবহার করা যায়, কিন্তু রাত্রিতে কাশি প্রবল হইলে শুধু সেই সময়েই উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। (৩১নং ব্যবস্থা-পত্র ৩১৬ পৃষ্ঠা দেখুন)

ঘর বন্ধ করিয়া গলায় এবং বুকে সেঁক প্রদান করিলে ব্রঙ্কাইটিস্ রোগের যন্ত্রণার উপশম হয়। রাত্রিতে সেঁক প্রদান করিবার পরে বুকে কর্পূর মিশ্রিত তৈল মালিশ করা যাইতে পারে।

এই রোগের জীবাণু হইতে একপ্রকার টীকা প্রস্তুত হইয়াছে। নিয়মিত-ভাবে কিছু সময় অন্তর পুনঃ পুনঃ এই টীকা ব্যবহারেও অনেক সময়ে উপকার পাওয়া যায় এবং ইহার আক্রমণ কাল বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। এই টীকা তিন মাসের শিশুকেও দেওয়া যাইতে পারে। সর্দ্দি হওয়া মাত্র এইরূপ চিকিৎসা করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। যে পরিবারে অনেক বালকবালিকা আছে, সেই পরিবারে রোগ আক্রমণের এক সপ্তাহের মধ্যে রোগ নির্ণয় করা যাইতে পারে; আর এইরূপে চিকিৎসার জন্য অনেক সময়ও থাকে।

সদ্যঃ সংক্রামক পীড়ার পথ্য

রোগীর শরীরে জ্বর থাকিলে অল্পকালব্যাপী সদ্যঃ সংক্রামক রোগে সচরাচর তরল পথ্য দেওয়াই বিধেয়।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা—প্রবল জ্বরে রোগীকে তরল পথ্য ব্যবহার করিতে দিবেন; এবং জ্বর কমিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিৎ নরম খাদ্য, যেমন, গরম দুধের সর, উত্তম পক্ক শস্য (cereal) ও দুগ্ধ অথবা দুধের সর, অল্প সিদ্ধ ডিম্ব, বরফ ও সর, প্রভৃতি দিতে থাকিবেন। পীড়োপশমান্তে রোগীকে পুষ্টিকর ও যাহা সহজে পরিপাক হয় এমন খাদ্য দিতে হইবে যেন যত সত্বর সম্ভব রোগী পুনঃ শক্তিলাভ করিতে পারে।

হাম—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে পথ্য সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, হাম রোগেও সেই ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে হইবে।

নিউমোনিয়া—প্রচুর ঠাণ্ডা তরল পদার্থ ব্যবহারে শরীরের উত্তাপ হ্রাস পাইয়া মাংসতন্তুতে দূষিত পদার্থের বৃদ্ধি হয়। কার্ব্বলিক এ্যাসিড্ মিশ্রিত পানীয় কিংবা ফুটন্ত জল পান করা উচিত নহে। পীড়োপশমের সময় পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে।

কর্ণমূল স্ফীতি—তরল অথবা নরম খাদ্য-দ্রব্যের অর্দ্ধ তরল পথ্য। অম্লজাতীয় খাদ্য একেবারে পরিত্যাজ্য। কারণ ইহাতে এনেমিয়া (Anaemia) বিদ্যমান্ হইবার খুবই সম্ভাবনা, তজ্জন্য যে যে খাদ্যে লৌহ অধিক পরিমাণে যত সত্বর সম্ভব রোগীকে সেইরূপ খাদ্য খাইতে দিবেন।

ঘুংড়ি কাশি—এই রোগে সর্ব্বদাই রোগীর শরীরের ওজন অত্যধিক হ্রাস পাইতে থাকে। সচরাচর বমির নিমিত্তই এইরূপ হয়। ভক্ষণ করিবামাত্র যে খাদ্য বমনের সঙ্গে পড়িয়া যায়, তাহার স্থান পূর্ণ রাখিবার জন্য নিয়তই খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে। অর্দ্ধতরল খাদ্য তালিকার মধ্যে যে সকল পথ্যের উল্লেখ আছে, সেই সকল পুষ্টিকর ও যাহা সহজে পরিপাক হয়, এমন খাদ্য ভোজন করা বিধেয়।

টাইফয়েড্ বা আন্ত্রিক জ্বর—টাইফয়েডের জীবাণু আন্ত্রিক দ্বার দিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হয় বলিয়া টাইফয়েড্ জ্বর উৎপন্ন হয়। ময়লা, মাছি, খাদ্য ও অঙ্গুলির সাহায্যে এই রোগ ছড়াইয়া পড়ে। এই রোগ বিস্তারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ঐ রোগ যাহাতে সংক্রমিত না হইতে

পারে তৎপ্রতি বিশেষ সতর্ক হইতে ও রোগীকে পৃথক্ স্থানে রাখিতে হইবে। রোগী যে পথ্য ভক্ষণ করিয়াছে তাহার অবশিষ্টাংশ হয় পোড়াইয়া নতুবা মৃত্তিকায় পুতিয়া দিবেন। রোগীর পাত্রাদি পৃথক্ রাখিতে ও প্রতিবার খাইবার পরে পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত জলে ফুটাইতে হইবে।

রোগীর এই অবস্থাতেই আন্ত্রিক দ্বারে ব্যাক্টেরিয়া বর্ত্তমান থাকে বলিয়া শক্তি অত্যধিক হ্রাস পায়। এই কারণে টাইফয়েডের রোগীকে এমন খাদ্য দিতে হইবে যাহাতে পরিমিত ভাবে মাংসপেশীর মধ্যে কার্য্য চলিতে পারে। পূর্ব্বে অনাহারে রাখিবার যে ব্যবস্থা ছিল, বর্ত্তমানে আর তাহা নাই। বর্ত্তমানে বিশেষজ্ঞগণ এই বলেন যে, রোগীকে এই পরিমাণ খাদ্য দিতে হইবে যাহা সে অতি সহজেই পরিপাক করিয়া শরীরে রক্তে পরিণত করিতে পারে। সুতরাং রোগীর অবস্থানুযায়ী তাহার পথ্যের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

মুখের রুচি বৃদ্ধি করিতে পারিলে অনেক উপকার হইবে। সুতরাং এই রুচির নিমিত্ত খাদ্যের পরিবর্ত্তন, এবং বিভিন্নরূপে প্রস্তুত করন, এতদ্ব্যতীত দন্ত ও মুখ পরিষ্কৃত অবস্থায় রাখার প্রতি বিশেষ যত্ন লওয়া প্রয়োজন। অতি-ভোজন নিষিদ্ধ, কারণ ইহাতে অজীর্ণতা উৎপন্ন হইয়া ভক্ষণের উপকারিতা নষ্ট হইয়া যাইবে। অন্য ব্যবস্থা না দেওয়া পর্য্যন্ত দিনে প্রতি দুই কি তিন ঘণ্টা এবং রাত্রে প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবেন; নিম্নে খাদ্যের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল।

তরল পথ্য

জল—সকল জ্বরেই দিনে আট হইতে বার গেলাস জল পান ব্যবস্থেয়।

দুগ্ধ—পাঁচ হইতে দশ মিনিট যাবৎ গরম করিয়া পরে গরম কি ঠাণ্ডা অবস্থায় খাওয়া যাইতে পারে। অথবা লেবুর রস, সর নরম খাদ্য, ফেটান ডিম, শস্যও (cereal) উহার সহিত দেওয়া যায়।

ফলের রস—কমলালেবু, লেবু; আনারস, বেল।

মণ্ড—চাউল, আটা, সুজী অথবা গম হইতে উত্তমরূপে চোয়াইয়া মাড় অথবা ফেন বাহির করুন, পরে গুড় কি রেডিওমণ্ট দ্বারা সুস্বাদু করুন।

সুপ—চাউল ধোয়া জল ও মারমাইট দিয়া গোল আলু, পেঁয়াজ, গাজর, মটর, বাঁধা কপি, স্পিন্যাক শাক ও পাট শাকের সুপ তৈয়ার করিতে হইবে। উহাতে যব এবং ট্যাপিওকাও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

জমাট পানীয় (Concentrated food drink)—মল্টেড্ মিল্ক (malted milk), কোকোমল্ট (cocomalt) ওভালটাইন্ (ovaltine), ওভোফারিন (ovoferrin) প্রভৃতি, আর যদি পাওয়া যায় তবে পানীয় সুস্বাদু করিবার নিমিত্ত আইস্ ক্রিম (অল্প চিনি দ্বারা) ফ্রুট আইস্ (fruit ices), মল্টেড্ নাট্স্ (malted nuts), মেল্টোস্ (meltose), ল্যাক্টোস্ (lactose) ব্যবহার করা যাইতে পারে।

লঘুপাক, অল্প গুরুপাক অথবা অল্প তরল খাদ্য

শস্য—চাউল, মুড়ী, সুজী, ট্যাপিওকা উত্তমরূপে পাক করিয়া এবং রুটী অথবা বিস্কুট দুধে ভিজাইয়া নরম করিয়া খাইতে দিবেন।

ডিম্ব—অল্প সিদ্ধ অথবা ফেটান ডিম্ব, দুগ্ধ ও দুধের সরে মিশ্রিত খাদ্য, দধি দুগ্ধ অল্প চিনি মিশ্রিত সুমিষ্ট, পায়স।

সুপ—গোল আলু পাক করিবার পর ছাকিয়া সুপ বাহির করিতে হইবে।

কলা (অতি পক্ক অথবা পাক করা) পেয়ারার চাটনি, পেঁপে, আতাফলের চাটনি, কুলের পুরি জেলেটিন (gelatin) আর যদি পাওয়া যায়, তবে মিঠাইও ভক্ষণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তৈলাক্ত খাদ্য, ইক্ষু, শাদাচিনি দ্বারা প্রস্তুত মিঠাই ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

বর্ণানুক্রমে সূচীপত্র

সমাপ্ত